প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৭

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

নিবেদন

পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধধর্মের পঠন-পাঠনে বাঙলাদেশ একদিন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল এবং জৈন সাহিত্যের চর্চাতেও বাঙালী গবেষক কম আগ্রহী ছিলেন না। আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠক্রমে, বিশেষ করে বাঙ্লা ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃত এবং পালির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে, পালি এবং প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্থান থাকলেও, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণের মধ্যে এই দুই সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা যায় না। আমরা একথা বোধহয় তাঁদের বোঝাতে পারিনি যে এই দুই সাহিত্য-ভাণ্ডার মন্থন না করলে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হয় না।

শিক্ষার উচ্চতম সোপান পর্যন্ত মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্য আজকাল সকলেই আগ্রহী এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ক্রমে ক্রমে সেই রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করছেন। ইংরাজী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় পালি সাহিত্যের এবং জৈন-প্রাকৃত সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বাঙ্লা ভাষায় পালি বা জৈন-শাস্ত্র সহ সমগ্র প্রাকৃত সাহিত্যের বিশেষ চর্চা হয়নি।

বর্তমান গ্রন্থটিতে পালি সাহিত্য এবং জৈন শাস্ত্র সহ সমগ্র প্রাকৃত সাহিত্যের মোটামুটি একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ পাঠকের আগ্রহ সঞ্চারে এবং জিজ্ঞাসু মনের তৃপ্তি সাধনে এই গ্রন্থ কিছুটা সক্ষম হলেও পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

এইরূপ একটি গ্রন্থ রচনার জন্য পরামর্শ ও তাগিদ দেন অকৃত্রিম সুহৃদ্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের রীডর্ ডঃ শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়। অনুজোপম সহকর্মী ডঃ অশোক ভট্টাচার্য সকল ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। সারস্বত লাইব্রেরীর শ্রীবিভাস ভট্টাচার্য বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে ছাপা ও

প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। আমার স্ত্রী শ্রীমতী গীতা দেবী এবং কন্যা কুমারী সুস্মিতা আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিনীত

গ্রন্থকার

বিষয়-সূচী

মুখবন্ধ

ভাষার ইতিবৃত্ত এবং শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে পালি এবং প্রাকৃত ভাষাসমূহ মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার (Middle Indo-Aryan) অন্তর্গত। মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষা ভারতীয়-আর্যভাষার একটি স্তর।

ভারতীয়-আর্যভাষার ইতিহাসে আমরা মোটামুটি তিনটি স্তর পাই[১] :

(ক) প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা (Old Indo-Aryan) :—সাধারণভাবে এই স্তর খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। বৈদিক এবং সংস্কৃত ভাষা এই স্তরের অন্তর্গত।

(খ) মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষা (Middle Indo-Aryan) :—অশোকের অনুশাসন এবং অন্যান্য প্রত্নলেখের (Inscription) ভাষা, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি এই স্তরের অন্তর্গত। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে খৃষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত এই স্তরের আনুমানিক কাল।

(গ) নব্য ভারতীয়-আর্যভাষা (New Indo-Aryan)—হিন্দী, বাঙ্‌লা, মারাঠী প্রভৃতি ভাষাকে এই স্তরে ধরা হয়। খৃষ্টীয় দশম শতক থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

ভারতীয়-আর্যভাষার বিবর্তন বিশ্লেষণ করলে আমরা মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষাগুলির ক্রমবিবর্তন ও পরিণতির ক্ষেত্রে চারটি স্তর লক্ষ্য করি[২] :

(i) প্রাচীন স্তর—খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত। অশোকের অনুশাসনের ভাষা ও পালিকে এই স্তরে ধরা যায়।

(ii) পরিবৃত্তি স্তর (Transitional stage) – খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত। খরোষ্ঠী, ব্রাহ্মী প্রভৃতি লিপিতে রচিত প্রত্নলেখগুলির ভাষা এই স্তরভুক্ত।

(iii) দ্বিতীয় স্তর—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত এই স্তরের

মধ্যে শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী, মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাগুলিকে ধরা যায়।

(iv) তৃতীয় স্তর—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত এই স্তরে আমরা অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ধরতে পারি।

পালি ও প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা আমাদের কাছে সাধারণভাবে অনাদৃত। এই দুই ভাষায় রচিত বিপুল সাহিত্যের রসাস্বাদন করবার চেষ্টাও আমরা করি না। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব আয়ত্ত করতে হ'লে পালি-প্রাকৃতের জ্ঞান অপরিহার্য। পালি-প্রাকৃতের বিশেষ চর্চা না করে বাঙ্লা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি আর্য-ভাষামূলক আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না। পালি-প্রাকৃতের সঙ্গে এই ভাষাগুলির সম্বন্ধ সংস্কৃতের সঙ্গে এদের সম্পর্ক অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ।

জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করবার প্রয়াসে ভগবান্ বুদ্ধ যে 'সত্য' প্রচার করেছিলেন, যে 'ধর্ম' জগৎকে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল, যে ধর্মের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য, ও দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে নানা উন্নতি হয়েছিল, সেই বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানলাভ করতে হ'লে পালি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করা কর্তব্য। বৌদ্ধধর্মের মতই জৈনধর্মও ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আজও এদেশে বহুলোক এই ধর্ম অবলম্বন করে জীবন যাপন করেন। জৈনধর্মকে জানতে হ'লে আমাদের প্রাকৃতভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা না করে উপায় নেই!

বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যই যে কেবল পালি এবং প্রাকৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রয়োজনীয়, তা নয়। এই দুই ভাষার সাহিত্য ভাণ্ডারে বহু উপাদেয় সম্পদ্ আছে, সাহিত্যরসিকের উপভোগ্য বহুবিধ গ্রন্থের রসাস্বাদন করবার সুযোগ আমরা পাই এই দুই সাহিত্যের চর্চা করলে। বৌদ্ধ-জৈনযুগের ভারতবর্ষকে জানতে হ'লে এবং ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক মতগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে এই দুই সাহিত্য আমাদের জানতেই হ'বে। বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিজয়াভিযান শুরু হয়েছিল বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করেই। এই

ধর্মের মূল বাহনরূপে পালি ভাষাও দিকে দিকে প্রসার লাভ করে। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে পালি ও বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রভাব আজও লক্ষ্য করা যায়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি সুস্পষ্ট রূপ পেতে হ'লে আমাদের পালি-প্রাকৃত ভাষায় সংরক্ষিত উপাদানগুলির সাহায্য নিতেই হ'বে।

পালি শব্দের মূল অর্থ

'পালি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং পালিভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে বিশেষ মতভেদ আছে। পঙ্‌ক্তি, বীথি, শ্রেণী প্রভৃতি অর্থে 'পালি' শব্দের প্রয়োগ আছে। 'পালি' শব্দ প্রথমতঃ বৌদ্ধশাস্ত্রের মূলশাস্ত্রকে এবং পরে মূলশাস্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যে কোনও গ্রন্থকে বোঝাতে ব্যবহৃত হোত। এমন কথাও অনেকে বলেন যে মূলশাস্ত্র 'পালি' বলে, যে ভাষায় ঐ মূল বা 'পালি' লেখা হয়েছিল তাকেই কালক্রমে পালিভাষা বলা হ'ল। 'পালি' শব্দটির প্রথম প্রয়োগ আমরা বুদ্ধঘোষের অট্‌ঠকথার মধ্যে পাই। এই শব্দটির বহুপ্রকার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করার চেষ্টা হয়েছে এবং ৺বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'পালিপ্রকাশ' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছেন৩।

পালি ভাষার উৎপত্তি

পালি ভাষার উৎপত্তি কী করে হ'ল এবং এটি কোন্ অঞ্চলের ভাষা এ নিয়েও পণ্ডিতমহলে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়৪। পালি একটি মিশ্র ভাষা এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্যধর্ম লক্ষ্য করে পণ্ডিতরা বিভিন্ন মত দিয়েছেন। উজ্জয়িনীকেই পালির উৎপত্তিস্থল বলে মনে করেছেন Westergaard, Kuhn প্রমুখ পণ্ডিতগণ; পৈশাচীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন Sten Konow; Oldenberg প্রমুখরা পালিকে কলিঙ্গের ভাষা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন; Lüders বলেন অর্ধমাগধীর মূল প্রাচীন রূপ থেকে অনুবাদ করেই পালি সাহিত্যের সৃষ্টি; Geiger, Windisch প্রমুখ সিংহলী ঐতিহ্যকে স্বীকার করে মনে করেন বৌদ্ধধর্মের

পীঠভূমি মগধই হ'ল পালির উৎপত্তিস্থল এবং মাগধীই হ'ল মূলভাষা[৫], আবার সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মনে করেন পালি হ'ল পশ্চিমা ভাষা এবং শৌরসেনী প্রাকৃতেরই প্রাচীনতর রূপ। এই মতগুলির মধ্যে কোনটিই পণ্ডিতমহলে সন্তোষজনকভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। মাগধীর পক্ষে মতামতের পাল্লা ভারী হ'লেও ব্যাকরণ, প্রত্নলেখ বা নাটকের মধ্যে আমরা যে মাগধী প্রাকৃতের পরিচয় পাই তা'র সঙ্গে পালির বিশেষ মিল দেখা যায় না[৬]।

'প্রাকৃত' শব্দের মূল অর্থ

'পালি'র মত 'প্রাকৃত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়েও নানা পণ্ডিতের নানা মত[৭]! 'প্রকৃতিতে যাহা জাত' বা 'প্রকৃতি হইতে যাহা আগত' তার নামই 'প্রাকৃত'। অনেকে বলেন এই 'প্রকৃতি' হ'ল সংস্কৃত ভাষা এবং 'প্রাকৃত' ভাষা হ'ল সংস্কৃতের বিকৃতি। কারও মতে আবার 'প্রকৃতি' অর্থাৎ স্বভাব থেকে যে ভাষা এসেছে তারই নাম 'প্রাকৃত'। যে ভাষার 'সংস্কার' বা গুণাধান করা হয়েছে তা' হ'ল 'সংস্কৃত' এবং যে ভাষা নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে এবং যার কোন 'সংস্কার' করা হয়নি তা-ই হ'ল 'প্রাকৃত'। আর এক মতে সাধারণ 'প্রাকৃত' লোকের ব্যবহৃত ভাষাই 'প্রাকৃত' ভাষা। ৺বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পালি প্রকাশ গ্রন্থে এ বিষয়েও বিশদ আলোচনা করেছেন[৮]।

প্রাকৃত ভাষার বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন

'প্রাকৃত' ভাষার নানা বিভাগ আছে। ব্যাপক অর্থে পালিও অন্যতম প্রাকৃত ভাষা, এবং প্রাকৃত ভাষা বলতে আমরা যে ভাষাগুলিকে গ্রহণ করি ভাষাতত্ত্বের বিচারে পালিভাষা সেই প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন। ধর্মীয় প্রাকৃত, সাহিত্যিক প্রাকৃত, নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত, ব্যাকরণে উল্লিখিত প্রাকৃত, বহির্ভারতীয় প্রাকৃত, প্রত্নলেখ-প্রাকৃত, অশোক-প্রাকৃত, প্রভৃতি নানা বিভাগে প্রাকৃত-ভাষাকে ভাগ করা যায়। পালির ন্যায় প্রাকৃতও আমাদের কাছে অনাদৃত একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাকৃত কাব্যের সমৃদ্ধি এবং

প্রাচীনেরা প্রাকৃত কাব্যের কত প্রশংসা করেছেন তার কোন খবরই আমরা রাখি না। বিষয় বৈচিত্র্যেও প্রাকৃত ভাষা অন্য কোন ভাষার চেয়ে হীন নয়। মনে রাখা দরকার দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণ ভারতে প্রাকৃত ভাষার বিপুল প্রভাব ছিল এবং খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত সাতবাহন ও পরবর্তী রাজাদের প্রশাসন কার্য প্রাকৃত ভাষাতেই সম্পন্ন হোত। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত আমরা যে যে প্রধান প্রত্নলেখ, মুদ্রালিপি ইত্যাদি পাই তা' প্রধানতঃ প্রাকৃতেই রচিত। এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় রচনার প্রথম পাঠযোগ্য লিখিত প্রমাণ আমরা প্রাকৃত ভাষাতেই পাই১। এখানে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে পালি ভাষায় যা কিছু রচিত সবই মুখ্যতঃ বৌদ্ধ ধর্মকে ভিত্তি করে, কিন্তু প্রাকৃত সাহিত্য সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। জৈন প্রাকৃত বা অর্ধ মাগধীতে যেমন রচিত হয়েছে বিপুল জৈনশাস্ত্র, তেমনই অন্যান্য প্রাকৃতে রচিত হয়েছে দশমুহবহো, গউড়বহো প্রভৃতির মত উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ। সিদ্ধাচার্যরা তাঁদের জ্ঞান ও সাধনার কথা প্রকাশ করেছেন অপভ্রংশে, আর অশ্বঘোষ, ভাস, শূদ্রক, কালিদাস প্রমুখ সংস্কৃত নাট্যকারেরা বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন তাঁদের সংস্কৃত নাটকে এবং রাজশেখর প্রাকৃতে কর্পূরমঞ্জরীর মত নাটক (সট্টক) রচনা করেছেন। এ ছাড়া রয়েছে পূর্বোল্লিখিত প্রত্নলেখগুলি, যাদের সংখ্যা হ'বে প্রায় দেড় হাজার। ভাষাতত্ত্ব ছাড়া ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এই প্রত্নলেখগুলির বিশেষ মূল্য আছে।

বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের এবং পালিভাষার আলোচনায় অল্পবিস্তর আগ্রহ দেখা গেলেও জৈন ধর্ম ও সাহিত্যের এবং প্রাকৃত ভাষার চর্চা বাঙলা দেশে একরকম নেই বললেই হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই অবস্থার পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য।

---

১. S. K. Chatterjee, Origin and Development of the Bengali Language, Pp. 16 ff.

সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৮৬

২. S. K. Chatterjee, ঐ

৩. বিধুশেখর শাস্ত্রী, পালি প্রকাশ, প্রবেশক, পৃঃ ১-১০

৪. Geiger (Tr. B. K. Ghosh), Pali Language and Literature, p. 1-7
বিধুশেখর শাস্ত্রী, ঐ পৃঃ ১১-১৩ ; Winternitz, History of Indian Lit. II, p. 18
S. K. Chatterjee, ঐ ; B. C. Law, A History of Pali Lit. I, Introduction.

৫. "সা মাগধী মূলভাসা নরা যা' আদিকপ্পিকা…।" পয়োগসিদ্ধি, মহারূপসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণে এই শ্লোকটি উল্লিখিত।

৬. বিধুশেখর শাস্ত্রী, ঐ, পৃঃ ১৩-১৭

৭. Woolner, Introduction to Prakrit, p. 3
বিধুশেখর শাস্ত্রী, ঐ, পৃঃ ১৮-২০

৮. বিধুশেখর শাস্ত্রা, ঐ, পৃঃ ১৮-৩৫

৯. সুকুমার সেন, ঐ, পৃঃ ৮৯-৯২ ; পরেশচন্দ্র মজুমদার, সংস্কৃ॰ ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, পৃঃ ২৫০

প্রথম খণ্ড : পালি সাহিত্য

অবতরণিকা

বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধধর্মের বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূচনা

বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন সাহিত্য নানা ভাষায় পাওয়া গেছে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে পালি ভাষায়, নেপালে সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়, তুর্কীস্তানের মরুভূমিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায়। এ ছাড়া তিব্বতী, চীনা, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি ভাষাতে বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ পাওয়া যায়। পালি বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের দেখা কর্তব্য কীভাবে এই বিপুল বৌদ্ধ সাহিত্যের সূচনা হ'য়েছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত Eugène Burnouf-ই প্রথম নানা ভাষায় ও অনুবাদে প্রাপ্ত এই বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রন্থ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা শুরু করেন। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা, বিশেষ করে জার্মানী ও রাশিয়ার গবেষকরা, বুঝেছিলেন যে কোন একটি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনা করলে তা' অসম্পূর্ণ হ'বে এবং সেইজন্যই তাঁরা এই তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হ'লেন। অপরদিকে Rhys Davids প্রমুখ ইংরাজ পণ্ডিতেরা সিংহলে পাওয়া পালি পুঁথি অবলম্বন করে বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনা আরম্ভ করলেন। সিংহলী ঐতিহ্য অনুসরণ করে তাঁরা বললেন যে বৌদ্ধশাস্ত্র প্রথম লেখা হয় পালি ভাষায় আর সমগ্র পালি বৌদ্ধশাস্ত্র বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময় থেকে অশোকের সময় পর্যন্ত এই তিনশ' বছরের মধ্যেই রচিত হয়েছিল।

প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের রূপ

সিংহলী ঐতিহ্য বা ঐ মতাবলম্বী পণ্ডিতরা যাই বলুন না কেন, যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল বলে মনে করতে পারি না

যে পালিভাষাতেই বৌদ্ধশাস্ত্র (canon) প্রথম লেখা হয় বা বিপুল এই ধর্মশাস্ত্র বুদ্ধের জীবদ্দশায় বা তাঁর মহাপরিনির্বাণের তিনশ' বছরের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। বৌদ্ধসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যায় বহু শতাব্দী ধরে এই সাহিত্যের বা শাস্ত্রের রচনা চলেছিল এবং অশোকের আগে বা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের পূর্বে খুব বেশী বৌদ্ধশাস্ত্র বিধিবদ্ধভাবে রচিত হয়নি, সম্ভবতঃ একটি পিটকেরও অস্তিত্ব ছিল না। কেউ কেউ১ অবশ্য এমন মত পোষণ করেছেন যে অশোকের মত বৌদ্ধধর্মসেবীর নাম শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ না থাকায় মনে হয় তাঁর সময় এই শাস্ত্র রচনা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অশোকের একশ' বছর পরেও আমরা 'ত্রিপিটক' শব্দের কোন উল্লেখ পাই না, পাই শুধু 'পিটক' শব্দটি। আরও মনে রাখা দরকার যে স্বকীয় অনুশাসনে২ সম্রাট অশোক ভিক্ষু সংঘকে মুনিগাথা, অনাগতভয়, রাহুলোবাদ ইত্যাদি সাতটি সূত্র অধ্যয়ন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু কোন 'পিটক' বা 'ত্রিপিটকে'র উল্লেখ সেখানে নেই! যে রূপে এই সূত্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে ঠিক সেইভাবেই পালি ত্রিপিটকে এদের আমরা পাইনা৩। এখন প্রশ্ন, অশোকের পূর্বে প্রচলিত বৌদ্ধশাস্ত্র কোন্ ভাষায় ও কী রূপে ছিল।

শিক্ষক রূপে বুদ্ধ তাঁর ধর্মমত কোশল ও মগধের মধ্যেই প্রচার করেন এবং অশোকের সময় পর্যন্ত এই ধর্মমত সাধারণভাবে এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানতঃ অশোকের চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। বুদ্ধ স্বয়ং এবং অশোকের সময় পর্যন্ত বুদ্ধশিষ্যরা কোশল-মগধের ভাষাতেই ধর্মের আলোচনা করতেন বলে মনে হয় এবং ঐ সময় প্রচলিত বৌদ্ধশাস্ত্র সম্ভবতঃ ঐ স্থানের ভাষাতেই প্রচলিত ছিল। অশোক তাঁর অনুশাসনে যে সূত্রগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি মগধের ভাষাতেই রচিত ছিল বলে মনে হয়। ভাষাতত্ত্বের বিচারে পালিভাষা কোশল-মগধের প্রচলিত প্রাকৃত নয়, সম্ভবতঃ পশ্চিম ভারতের বা অবন্তির কোন কথিত ভাষার সাহিত্যিক রূপ। বর্তমানে প্রচলিত পালি ত্রিপিটক অশোকের পরবর্তী কালেরই বলে মনে হয়, তবে এই শাস্ত্ররচনার কাজ হয়ত অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন শাস্ত্র যে ভাষাতেই প্রচলিত থাকুক না কেন, তা আকারে খুব বড়

ছিল না এবং ঐ শাস্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করার কোন প্রয়োজন হয়নি। বৌদ্ধধর্ম যখন ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করল তখনই সম্ভবতঃ সঙ্ঘনায়করা প্রাচীন শাস্ত্রকে বিভিন্ন স্থানীয় প্রাকৃত ভাষায় এবং সংস্কৃতে রূপান্তরিত বা অনুবাদ করলেন। এইসব অনুবাদের মধ্যে এখনও আমরা প্রাচীন মাগধী ও অর্ধ মাগধী শব্দের সন্ধান পাই। বৌদ্ধাচার্যরা কেবল তাঁদের শাস্ত্র অনুবাদই করলেন না, প্রাচীন শাস্ত্রের কাঠামো বজায় রেখে তাঁদের নিজস্ব সাম্প্রদায়িক মত স্থাপন করতে উদ্যোগী হ'লেন। এর ফলেই এই শাস্ত্র বিপুল আকার ধারণ করল এবং তখনই ঐ শাস্ত্রকে 'পিটক'ভাবে ভাগ করার প্রয়োজন দেখা দিল।

সুত্ত ও বিনয়ের সূচনা

বৌদ্ধসাহিত্য এবং সিংহলী ঐতিহ্য অনুসারে আমরা জানি যে ভগবান্ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই রাজগৃহে (বর্তমান রাজগীর) বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী নামক গুহায় পাঁচশত বৌদ্ধ অর্হতের এক সঙ্গীতি (Council) আহ্বান করা হয়। এই সঙ্গীতি আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল "বুদ্ধবচন" সংকলন ও অবিকৃতভাবে রক্ষা করা। বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় বহু উপদেশ ও শিক্ষা দেন কিন্তু কখনও তা' সংগ্রহ বা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তিনি যতদিন বর্তমান ছিলেন ততদিন তাঁর উপদেশের কোন ভ্রান্ত ব্যাখ্যার বা তাঁর 'বচনে'র পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তাঁর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ রকম আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় প্রধান বুদ্ধশিষ্যগণ এই রকম একটি সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। থের (স্থবির) মহাকস্সপের (মহাকাশ্যপ) আহ্বানে এবং তাঁরই সভাপতিত্বে এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হ'ল। প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি নামে পরিচিত এই সঙ্গীতিতে আনন্দ আবৃত্তি করে শোনালেন ভগবান্ কোথায়, কী প্রসঙ্গে, ধর্মব্যাখ্যান করেছিলেন, আর, উপালি বিবৃত করলেন বুদ্ধের 'বিনয়' সম্বন্ধীয় উপদেশ। 'ধর্ম'-সম্বন্ধীয় আনন্দের আবৃত্তি দিয়েই সূচনা হ'ল সুত্তপিটকের আর উপালি 'বিনয়'-সম্বন্ধে যা বললেন তাই নিয়ে সূত্রপাত হ'ল বিনয়পিটকের। সুত্ত এবং বিনয়ের ঠিক্ কোন্ কোন্ অংশ ঐ সম্মেলনে

বিবৃত হয়েছিল তা' আজ আমরা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না। তবে, এ কথা মনে করা অসঙ্গত হ'বে না যে, পালি ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় প্রাপ্ত এই দুই পিটকে যে অংশগুলি সাধারণ (common) সেইগুলিই সম্ভবতঃ এই দুই পিটকের প্রাচীনতম অংশ। অভিধর্ম্মের অস্তিত্বের কোন ইঙ্গিত এই সঙ্গীতির বিবরণে আমরা পাই না।

প্রথম সঙ্ঘভেদ

এর একশ' বছর পরে বৈশালীর প্রায় দশহাজার বজ্জিপুত্ত (বৃজিপুত্র) ভিক্ষু 'বিনয়ে'র দশটি নিয়ম নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ঐ দশটি নিয়ম বৌদ্ধসাহিত্যে 'দসবত্থু'[৪] (দশবস্তু) নামে পরিচিত। আচার-ব্যবহারের ব্যতিক্রম করে এই ভিক্ষুরাই সঙ্ঘে প্রথম ভেদ আনেন এবং এঁদের এই অবিনয়ানুগ আচরণে সাধারণ ভিক্ষুরা খুবই ক্ষুব্ধ হ'লেন। যশঃ নামক অন্যতম স্থবির এই আচরণের প্রতিবাদ করলেন এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য তৎপর হলেন। তৎকালীন সঙ্ঘ প্রধান রেবতের (রৈবত) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি সমস্ত বিষয় আলোচনা করেন এবং বজ্জিপুত্তদের অবিনয়ানুগ আচরণের আলোচনার জন্য বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সঙ্গীতির অধিবেশন বসে। মগধরাজ কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বালুকারাম (বা মহাবন) বিহারে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে 'দসবত্থু' বিনয়বিরুদ্ধ বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। এই সঙ্গীতিতে সাতশ' ভিক্ষু অংশ নেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাবিষয়ক বিনয়গুলি আলোচনা করেন। এই সঙ্গীতির বিবরণেও অভিধর্ম্মের অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

অভিধর্ম্মের সূচনা

দ্বিতীয় সঙ্গীতির প্রায় একশ' বছর পর অশোকের সময় পাটলিপুত্রে মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের (মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্য) অধিনায়কতায় তৃতীয় বৌদ্ধ-সঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়। প্রায় এক হাজার ভিক্ষু এই অধিবেশনে যোগ দেন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে আলোচিত ও সংগৃহীত ধর্ম ও বিনয় আবার আলোচিত ও গৃহীত হয়। তৃতীয় পিটক অভিধর্ম্মের (অভিধর্ম)

অস্তিত্ব এই সম্মেলনেই প্রথম প্রচারিত হয়। অনেকের মতে[৫] এই সম্মেলন আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য ছিল থেরবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশিষ্ট অ-থেরবাদী শাখাগুলির মতাদর্শ বিশ্লেষণ করে তা' খণ্ডন করা। সম্ভবতঃ এই জন্যই মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স এই সম্মেলনেই অভিধম্ম পিটকের অন্যতম গ্রন্থ 'কথাবত্থু' সঙ্কলন করেন। সিংহলী ঐতিহ্য অনুসারে এই সময় থেকেই 'বুদ্ধবচন' তিন ভাগে ভাগ হয়। অনেকেই এই সঙ্গীতিগুলির ঐতিহাসিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন[৬] কিন্তু সে সমস্ত আলোচনার ক্ষেত্র এই গ্রন্থ নয়। সম্রাট কণিষ্কের সময় কাশ্মীরে চতুর্থ সঙ্গীতি ও পরে আরও কয়েকটি সঙ্গীতি হয়েছে বলে বৌদ্ধ ঐতিহ্যে উল্লেখ করা হয়।

ত্রিপিটক—প্রথম লিপিবদ্ধ বুদ্ধবচন

তৃতীয় সঙ্গীতির পরই মহিন্দ (মহেন্দ্র) সম্রাট্ অশোকের নির্দেশে সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম এই তিন 'পিটক' নিয়ে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে যান বলে সিংহলী সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি। কালক্রমে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হ'লে খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে সিংহলের রাজা বট্টগামনীর নির্দেশে 'ত্রিপিটক' বা 'তিপিটক' প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়। সিংহলী ঐতিহ্যানুসারে মহিন্দ পালি ত্রিপিটক নিয়েই সিংহলে যান এবং বট্টগামনীর সময় ঐ ত্রিপিটকই লিপিবদ্ধ করা হয়। বর্তমানে আমরা যে পালি ত্রিপিটক পাই তা' সিংহলে লিপিবদ্ধ ঐ ত্রিপিটক। থেরবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে ঐ ত্রিপিটকেই বুদ্ধের 'বচন' সংরক্ষিত আছে। তাঁরা একে 'বুদ্ধবচন' বলে স্বীকার করেন। এই 'বুদ্ধবচন' ছাড়া পরবর্তীকালে পালি ভাষায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরও গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

হীনযান ও মহাযান—বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায় ও তাদের শাস্ত্রের উদ্ভব :
থেরবাদী শাস্ত্রই পালি 'ত্রিপিটক'

প্রাচীন বৌদ্ধাচার্যরা তাঁদের মত, আদর্শ এবং দর্শনের ক্রমোন্নতির পর্যায় অনুসারে তাঁদের ধর্মমতকে দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করেন,—হীনযান ও মহাযান। হীনযানীদের প্রাচীন রক্ষণশীল এবং মহাযানীদের উচ্চ-

আদর্শবাদী ও উদার মতাবলম্বী বলে মনে করা হয়। এই তথাকথিত হীনযানী সম্প্রদায় সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে আর মহাযানী মতবাদ তিব্বত, নেপাল, চীন প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে। হীনযানীরা অবশ্য নিজেদের কখনও হীনযানী বলেন না[৭]। এই সম্প্রদায় দুটি আবার স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে যায় এবং অশোকের পূর্বেই সঙ্ঘের মধ্যে আঠারোটি হীনযানী শাখার উদ্ভব হয়[৮]। এদের মধ্যে দশটি শাখা প্রভাবশালী ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেরই বিপুল সাহিত্যভাণ্ডার ছিল। এই দশটি শাখা হ'ল, স্থবিরবাদ বা থেরবাদ, হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদ, মূল সর্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয় মহাসাংঘিক ও লোকোত্তরবাদ। এদের মধ্যে মহাসাংঘিক ও লোকোত্তরবাদ খুব প্রাচীন কালেই অন্য শাখাগুলি থেকে বেশ দূরে সরে গিয়েছিল এবং মতাদর্শ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় 'মহাযান' এদের থেকেই উদ্ভূত হ'য়েছিল। এই দশটি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিরই পৃথক্ পৃথক্ 'ত্রিপিটক' ছিল। স্থবিরবাদ বা থেরবাদের ত্রিপিটক লেখা হয় পালি ভাষায়, হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক ও কাশ্যপীয়দের শাস্ত্র কোন ভাষায় ছিল তা' আমরা এখনও ঠিক জানি না। এদের শাস্ত্র এখন পর্যন্ত কেবল চীনা অনুবাদেই পাওয়া গেছে। চীনা অনুবাদের প্রকৃতি ও মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত প্রাকৃত ধম্মপদের ভাষা বিশ্লেষণ করে দেখলে মনে হয় ধর্মগুপ্তদের শাস্ত্র উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রচলিত কোন প্রাচীন প্রাকৃতে ছিল। নেপালে প্রাপ্ত সূত্র থেকে জানা যায় যে সর্বাস্তিবাদী ও মূল সর্বাস্তিবাদী শাস্ত্র সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল। মহাসাংঘিক ও সম্মিতীয় শাখার শাস্ত্র সম্ভবতঃ ছিল প্রাকৃতবহুল সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃত ভাষায়। শাখাগুলির মধ্যে একমাত্র থেরবাদীরাই পালিভাষায় তাঁদের ধর্মগ্রন্থ প্রচার করলেন এবং বর্তমানে একমাত্র এই থেরবাদী শাস্ত্রই (Canon) আমরা সম্পূর্ণ আকারে পাই। পালি 'ত্রিপিটক' বা পালি বৌদ্ধ শাস্ত্র বলতে আমরা এই থেরবাদী শাস্ত্রকেই বুঝি। তিন ভাগে বিভক্ত এই শাস্ত্রের সুত্তপিটকে বুদ্ধ তাঁর মূল উপদেশগুলি ব্যাখ্যা করেছেন, বিনয়পিটকে সঙ্ঘের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ভিক্ষুদের সৎ জীবন যাপনের ব্যবস্থাকল্পে

বিনয়' শিখিয়েছেন আর অভিধর্ম্মপিটকে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা আছে।

প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে পালির চর্চা

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের প্রাণশক্তি আবিষ্কারে ভারতীয়দের চেয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই বেশী তৎপর ছিলেন। পালি সাহিত্য চর্চায় প্রতীচ্যের পণ্ডিতদের অবদান উল্লেখযোগ্য এবং এ বিষয়ে তাঁরাই হলেন পথপ্রদর্শক। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে Burnouf যখন তাঁর বৌদ্ধধর্মবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেন তখন তিনি কোন মুদ্রিত গ্রন্থেরই সাহায্য পাননি[১]। পালি সাহিত্য তথা বৌদ্ধধর্মের চর্চায় Burnouf ছাড়া Trenckner, Spiegel, Westergaard, Childers, Fausböll, Anderson, Turnour, Pischel, Minayeff. E. Hardy, Oldenberg, Kern, T. W. Rhys Davids, Mrs. C. Rhys Davids, Geiger, Walleser, Windisch, Carpenter, Chalmers. La Vallee Poussin, Thomas, Otto Schrader, Winternitz, Sten Konow, Mabel Bode, Stede, Helmer Smith, Otto Franke, Sylvain Levi, Lamotte, Alsdorf Tucci প্রমুখ পণ্ডিতদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যায়। এঁদের নিরলস প্রয়াসের ফলে পালি সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা অবহিত হয়েছি। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ভাষা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পকলা, এবং ধর্ম সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ তথ্য এই সাহিত্যে নিহিত আছে। ভারততত্ত্বের আলোচনার পক্ষে পালি সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই চর্চায় London এর Pali Text Society এবং Copenhagen এর Royal Danish Academy বহু সাহায্য করেছেন। প্রাচ্যের পণ্ডিতদের মধ্যে পালি সাহিত্য তথা বৌদ্ধধর্মের চর্চায় অগ্রণীদের মধ্যে আমরা Takakusu, Anesaki, Kimura, Nagai, Watanabe, Suzuki, Buddhadatta, Narada, Malalasekera, Suriyagoḍa Sumaṅgala, Siddhartha, Anāgārika Dhammapāla, Shwe Zan Aung, Ledi Sadaw, P. Maung Tin, Haraprasad

Shastri, S. C. Vidyabhusan, Vidhushekhar Shastri D. Kosambi P. C. Bagchi, B. M. Barua, B. C. Law, Sukumar Dutt, Nalinaksha Dutt, P. L. Vaidya, P. V. Bapat, Anukul Chandra Banerjee প্রমুখ পণ্ডিতদের নাম উল্লেখ করতে পারি। প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে শ্যাম, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ পালির চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে স্বর্গতঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম পালি ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব অনুভব করে এর পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেন। কেবলমাত্র পালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার জন্য বিহার সরকার ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নালন্দায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এই কেন্দ্র থেকে বহু মূল্যবান মূল ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

১. Geiger (Tr. B. K. Ghosh), Pali Language and Literature P 11

২. Bhābrū-Bairat Edict.

৩. Winternitz, A History of Indian Literature, II. pp. 16, 607

৪. যে দশটি বিষয় নিয়ে সংঘে প্রথম ভেদ দেখা দিল, সেগুলি হ'ল :

সিঙ্গিলোণকপ্প—খাদ্যবস্তু সঞ্চয় করে রাখা ;

দ্বঙ্গুল কপ্প—মধ্যাহ্নের পর আহার করা ;

গামন্তরকপ্প—একই দিনে দুবার আহার করা ;

আবাসকপ্প—এক সীমায় অবস্থিত ভিক্ষুদের বিভিন্ন জায়গায় 'উপোসথ' পালন ;

অনুমতিকপ্প—পরে ভিক্ষুদের সম্মতি পাওয়া যাবে মনে করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া বা কাজ করা ;

আচিন্নকপ্প—পূর্বে অনুষ্ঠিত কোন কাজের নজির দেখিয়ে কাজ করা ;

অমথিতকপ্প—অমথিত দই অর্থাৎ ঘোল না করে দই খাওয়া ;

জলোগিপাতু—তাড়ি হওয়ার আগে উত্তেজক রস পানীয় বলে গ্রহণ করা ;

অদসকনিসীদন—ঝালরহীন আসনে বসা ;

জাতরূপরজত—সোণারূপো গ্রহণ করা ;—এর প্রত্যেকটি বিনয় —বিরুদ্ধ বলে মনে করা হয়।

৫. N. Dutt, Early Monastic Buddhism, II, p. 266

৬. ঐ

৭. হীনযান নাম সম্পর্কে মহাযানী দার্শনিক অসঙ্গ তাঁর 'সূত্রালঙ্কার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

আশয়স্যোপদেশস্য প্রয়োগস্য বিরোধতঃ।
উপস্তম্ভস্য কালস্য যৎ হীনং হীনমেব তৎ ॥

এই দুই সম্প্রদায়ের প্রভেদ সম্বন্ধে ড: নলিনাক্ষ দত্ত তাঁর 'Aspects of Mahāyāna & its relation to Hīnayāna (pp. 46 ff) গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

৮. N. Dutt, EMB II, p. 47 ; N. Dutt, Buddhist Sects in India ; প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, পৃঃ ৩-৫

৯. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ঐ, পৃঃ ১

প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্রিপিটক

'পিটক' শব্দের অর্থ১

তিনটি 'পিটকের' সমষ্টি হ'ল বৌদ্ধদের ধর্মশাস্ত্র (canon) 'ত্রিপিটক' (তিপিটক)। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই ত্রিপিটকে 'বুদ্ধবচন' বিধৃত আছে। সাধারণভাবে 'পিটক' শব্দের অর্থ 'ঝুড়ি' বা 'পাত্র'। 'পিটক' শব্দের বিকল্প রূপ হ'ল 'পেটক'। 'ঐতিহ্য' বা *tradition* অর্থেও 'পিটক' শব্দের ব্যবহার আছে। প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রমর্ম গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত ছিল। খনন কার্যের সময় মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করতে শ্রেণীবদ্ধ শ্রমিকেরা যেমন 'ঝুড়ি' ব্যবহার করে, শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব তেমনই গুরুর কাছ থেকে শিষ্যের কাছ চলে এসেছে। কারও মতে 'পিটক' শব্দের তাৎপর্য 'ঝুড়িতে রক্ষিত পুঁথি'। কেউ 'পিটক' শব্দের অর্থ করেছেন 'পর্যাপ্তি' অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভাবে প্রাপ্তি বা পাঠ, আবার কেউ এর অর্থ করেছেন 'ভাজন' বা 'আধার'—যে আধারে বংশানুক্রমে পারিবারিক সম্পদ্ সমূহ রক্ষিত থাকে। গ্রন্থের আধার ও আধেয় এই পারিভাষিক অর্থে 'পিটক' শব্দ বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

ত্রিপিটকের শিক্ষা ও লক্ষ্য

'ত্রিপিটকে' প্রধানতঃ তিনটি বিষয় সংগৃহীত হয়েছে। শীলবিষয়ক শিক্ষা বিনয়পিটকে, চিত্তবিষয়ক শিক্ষা অর্থাৎ ধ্যান-ধারণা-ভাবনার সাহায্যে কী ভাবে চঞ্চল চিত্তকে সংস্কৃত করা যায় সেই বিষয়ে শিক্ষা সূত্রপিটকে, এবং প্রজ্ঞা বিষয়ক শিক্ষা অভিধর্মপিটকে আছে। যথাপরাধ উপদেশ দেওয়া হয়েছে বিনয়পিটকে, সূত্রপিটকে আছে যথানুরূপ উপদেশ, আর

অভিধম্মপিটকে আছে যথাধর্ম বা যথাযথ উপদেশ[২]। এই ত্রিবিধ উপদেশই হ'ল 'ত্রিপিটকের' শিক্ষা ও লক্ষ্য।

ত্রিপিটকের রচনা কাল

'ত্রিপিটক' একদিনে রচিত হয়নি, বহুদিন ধরে চলেছিল এর রচনা ও গ্রন্থনা। বারাণসীতে সারনাথের মৃগদাবে যেদিন বুদ্ধ তাঁর বাণী প্রথম মানুষের কাছে প্রকাশ করলেন, বলতে গেলে সেদিনই সূচনা হ'য়েছিল ত্রিপিটকের বা বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের। আমরা আগেই বলেছি যে বুদ্ধের 'মহাপরিনির্বাণে'র পরই তাঁর 'বচন' সংগ্রহ ও সংকলন করার উদ্যোগ হয় এবং সিংহলের রাজা বট্টগামনির সময় এই 'বুদ্ধবচন' প্রথম লিপিবদ্ধ করে এর একটা স্থায়ী ও সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা হয়। সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ত্রিপিটকের রচনাকালকে একটা সময়সীমার মধ্যে ধরতে হ'লে বলা যায় যে খৃ: পূ: পঞ্চম শতক থেকে খৃঃ পূঃ প্রথম শতকের মধ্যেই এই শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়। এই চারশ' বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে তিনটি এবং সিংহলে তিনটি সঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়েছে বলে পালি সূত্র থেকে জানা যায়[৩]। এই সঙ্গীতিগুলির প্রধান কার্যসূচী ছিল ত্রিপিটকের আবৃত্তি এবং গ্রন্থগুলির প্রতিষ্ঠাপন। পালি সাহিত্যের সামগ্রিক রূপ দেবার ব্যাপারে এই সঙ্গীতিগুলিকে যদি *landmark* হিসেবে ধরা হয়, তবে বলতে হবে যে এই চারশ' বছরের মধ্যে পালি সাহিত্যের অন্ততঃ ছ'বার সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়েছে। কোন্ ক্রমে ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলির সৃষ্টি হয়েছিল তা' এখন আমাদের দেখতে হ'বে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে Dr. B. C. Law[৪] এই পালি ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলির রচনার একটি ক্রম (chronology) নির্দেশ করেছেন :

ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলির রচনা-ক্রম (Chronology)

১। বৌদ্ধশাস্ত্রের সাধারণ তত্ত্ব, যা' সব শাস্ত্রীয় গ্রন্থেই পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে।

২। যে সমস্ত কাহিনী দুই বা ততোধিক গ্রন্থে পাওয়া যায়।
৩। শীলসমূহ, মুখবন্ধ (prologue) সহ পারায়ণবগ্‌গ এবং অট্‌ঠক বগ্‌গের কবিতাগুলি, শিক্ষাপদসমূহ।
৪। দীঘনিকায়ের প্রথম খণ্ড, মজ্‌ঝিম, সংযুত্ত ও অঙ্গুত্তর নিকায়, এবং পাতিমোক্‌খের প্রাচীন ১৫২টি সূত্র।
৫। দীঘনিকায়ের অবশিষ্ট সুত্তগুলি, থের-থেরীগাথা, জাতক, সুত্তবিভঙ্গ, পটিসম্ভিদামগ্‌গ, পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি, বিভঙ্গ।
৬। মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ, ২২৭ সূত্রবিশিষ্ট সম্পূর্ণ পাতিমোক্‌খ, বিমান-বত্থু, পেতবত্থু, ধম্মপদ, কথাবত্থু।
৭। চুল্লনিদ্দেস, মহানিদ্দেস, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, ধাতুকথা, যমক, পট্‌ঠাণ।
৮। বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক, অপদান।
৯। পরিবারপাঠ
১০। খুদ্দকপাঠ

ত্রিপিটকের নয়টি অঙ্গ

ত্রিপিটকের মধ্যেই অনেক জায়গায়[৫] আমরা বৌদ্ধশাস্ত্রের নয়টি 'অঙ্গ' বা ত্রিপিটকের নয়টি বিভাগের উল্লেখ পাই। এই নয়টি 'অঙ্গ' হল,—সুত্ত অর্থাৎ গদ্যে উপদেশ; গেয়্য অর্থাৎ গদ্যে ও পদ্যে মিশ্রিত উপদেশ; বেয়্যাকরণ (ব্যাকরণ) অর্থাৎ ব্যাখ্যা, টীকা; গাথা অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ রচনা; উদান অর্থাৎ সারগর্ভ উক্তি; ইতিবুত্তক অর্থাৎ "বুদ্ধ এইরূপ বলিয়াছিলেন" এইরূপে নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ভাষণ; জাতক অর্থাৎ গোতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী; অব্‌ভুতধম্ম (অদ্ভুতধর্ম) অর্থাৎ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ; এবং বেদল্ল অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরে ধর্মোপদেশ; ত্রিপিটকের এই নয়টি বিভাগকে 'নবঙ্গ সত্থুসাসন' বলা হয়। এই বিভাগ কিন্তু সম্পূর্ণ ত্রিপিটককে বা কোন বিশেষ বিশেষ গ্রন্থকে বোঝায় না। এই বিভাগের দ্বারা বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থগুলির রূপ (form) এবং বিষয়বস্তু (contents) অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে।

এই নয়টি অঙ্গ যে নয় প্রকার রচনার নিদর্শন, সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নয়, তা শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। থের-থেরীগাথা, জাতক ও ইতিবুত্তকে আমরা এই কারণেই গাথা, ইতিবুত্তক ও জাতকজাতীয় রচনার লক্ষণ পাই। অঙ্গুত্তর নিকায়ে আবার একই আধারে নয়টি 'অঙ্গে'র লক্ষণই বর্তমান। নয়প্রকার 'অঙ্গের' উল্লেখ থেকে মনে হয় বর্তমান আকারে ত্রিপিটক যখন সংকলিত হয় তখন বৌদ্ধ সাহিত্যে এই বিভিন্ন প্রকার রচনার অস্তিত্ব ছিল। এগুলি ছাড়া 'বুদ্ধবচন' হিসেবে ভিক্ষুরা আয়ত্ত করতেন এমন বহু সূত্র, নিয়ম, পুস্তিকার উল্লেখ আমরা পালি-শাস্ত্রে পাই। ভিক্ষুদের মধ্যে 'সুত্তন্তিক' অর্থাৎ সুত্তের আবৃত্তিকারী, 'ধম্মকথিক' অর্থাৎ ধম্মের ব্যাখ্যানকারী, 'বিনয়ধর' অর্থাৎ বিনয়বিশারদ বহু ভিক্ষু ছিলেন বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ধম্ম এবং বিনয় যাতে ঠিকভাবে প্রচলিত ও অনুসৃত হয় তার জন্য শাস্ত্রগ্রন্থগুলি কণ্ঠস্থ ও বার বার আবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা করা বিশেষ আবশ্যক ছিল। বর্ষাকালের সময় যখন বহু পণ্ডিত ভিক্ষু একত্র সমবেত হ'তেন তখন অন্য ভিক্ষুরা শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নগুলি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করার সুযোগ পেতেন। কোন পণ্ডিত ভিক্ষু বা কোন সঙ্ঘ কোন কিছুকে ধম্ম বা বিনয়ের অঙ্গীভূত বলে প্রচার করার আগে অনুসন্ধান করে দেখা হোত যে ঐ বিষয় বা বিষয়গুলি "সত্থু-সাসনের" অনুরূপ কিনা। এই পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপার থেকে মনে হয় যে সে সময় এমন কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল যা' ভিক্ষুরা এই সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারতেন। অনেক ভিক্ষুকে 'মাতিকাধর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মাতিকা' আর কিছুই নয়, ধম্ম এবং সঙ্ঘের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উপদেশের সংক্ষিপ্ত রূপের (abridged) তালিকামাত্র। পরবর্তীকালে আমরা 'মাতিকা'গুলিকে অভিধম্মপিটকে স্থান করে নিতে দেখি।

'ত্রিপিটকে'র ও 'নিকায়ের' প্রাচীনতম উল্লেখ আমরা 'মিলিন্দপঞ্‌হো' নামক খৃষ্টীয় প্রথম শতকের গ্রন্থে পাই। অনেক ভাষাতেই 'ত্রিপিটক' রচিত হয়েছিল একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর মধ্যে পালি ত্রিপিটক নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। মধ্য এশিয়ায় মূলসর্বাস্তিবাদীদের সংস্কৃত ত্রিপিটকের যে খণ্ডিত অংশ (Fragments) পাওয়া গেছে তার সঙ্গে পালি ত্রিপিটকের তুলনা করে দেখলে শেষোক্ত গ্রন্থ যে বিশ্বস্তভাবে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছে তাতে আর সন্দেহ থাকে না। একটি অপরটির অনুবাদমাত্র নয় তবে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় মনে হয় কোন সাধারণ ঐতিহ্য বা ধারাকে অবলম্বন করে এই সংকলন দুটি গড়ে উঠেছিল।

বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ উপাদান ছাড়াও পালি ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলি সাহিত্যের মানদণ্ডেও যে বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে উন্নত ধরণের তা' আমরা পরবর্তী আলোচনায় বুঝতে পারব।

---

১. Winternitz—History of Indian Lit. II, P. 8. f. n. 3

২. Buddhaghoṣa, Sumaṅgalavilāsinī (P. T. S.) P. 19

৩. B. C. Law—A History of Pali Lit. I, P. 12

৪. B. C. Law—ঐ, Chapter I

৫. Winternitz—ঐ, p. 9 ; Buddhaghoṣa, Sumaṅgalavilāsinī (P. T. S) P. 23

৬. Trenckner, Milinda Pañho, P 22

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিনয়পিটক

বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তিনটি পিটকের মধ্যে প্রথম উল্লেখ করা হয় বিনয়পিটকের, তার পর সুত্তপিটকের এবং সব শেষে অভিধম্মপিটকের। রচনাকাল নিরপেক্ষ এই ক্রম অনুসরণ করেই আমরা ত্রিপিটকের অংশগুলির আলোচনা করব।

বিনয়পিটকের বিষয়বস্তু

বিনয়পিটক অর্থাৎ যে 'পিটকে' বা ঝুড়িতে 'বিনয়ের' অর্থাৎ সন্ন্যাসজীবনের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নিয়মবিধিগুলি (rules of Discipline) রক্ষিত আছে। এই বিধিনিষেধগুলি বিবিধ ও বিশেষ নিয়মে কায় ও বাক্যকে বিনীত করে বলে এর নাম 'বিনয়'। এই পিটকে সঙ্ঘসংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের অবশ্য পালনীয় বিধিনিষেধাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পিটকের শিক্ষা হ'ল শীল বিষয়ক এবং এতে সংযম-অসংযমের কথা আছে। বিনয়পিটকে সুশিক্ষিত হ'লে চারিত্রিক গুণ এবং জাতিস্মরতা, দিব্যদৃষ্টি, ও তৃষ্ণার ক্ষয় সম্পর্কে জ্ঞান এই ত্রিবিদ্যা আয়ত্ত করা যায়:

গুরুত্ব

বৌদ্ধ সঙ্ঘের ইতিহাস ও তৎকালীন ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় লাভের পক্ষে বিনয়পিটক একটি মূল্যবান গ্রন্থ। সঙ্ঘ পরিচালনার সমুদয় বিধিনিয়ম এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দৈনিক জীবনযাত্রা ও আচরণের যাবতীয় বিধি-নিষেধ বিনয়পিটকেই সংগৃহীত আছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে

বিনয়কেই বুদ্ধ শাসনের ও শিক্ষার আয়ুঃ বলা হয়েছে ; বিনয়ের সম্যক্ পালনই নির্বাণলাভের প্রধান সোপান।

বোধিলাভের পর নিজের উপলব্ধ সত্য ও জ্ঞান বুদ্ধ যখন সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করলেন তখন থেকে ধীরে ধীরে কী ভাবে বৌদ্ধ সঙ্ঘ গড়ে উঠলো তার একটি ইতিহাস আমরা বিনয়পিটকে পাই। সে দিক থেকে বুদ্ধের জীবনী রচনার উপাদানও এর মধ্যে নিহিত। বিনয়পিটকে উল্লিখিত বিভিন্ন বিধি-নিয়ম-নিষেধ বুদ্ধ প্রবর্তন করেছিলেন বিভিন্ন ঘটনা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই। এই কারণে স্বাভাবিক ভাবেই বিনয়পিটকে বহু গল্প ও কাহিনীর সমাবেশ হয়েছে। এই সব গল্প ও কাহিনীর মধ্যে আমরা একদিকে যেমন বুদ্ধের প্রচারক জীবনের একটি অংশ দেখতে পাই, অপর দিকে প্রাচীন ভারতের দৈনন্দিন জীবনের একটা ছবিও ফুটে ওঠে। সংক্ষেপে বলা যায় যে বিনয়পিটক হ'ল বৌদ্ধ সঙ্ঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস। Winternitz[১] বিনয়পিটকের সঙ্গে বৈদিক 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন।

বিনয়ের সূচনা—বিনয়পিটকের উদ্ভব
ত্রিশরণ

ধর্মপ্রচারের প্রথম দিকে ধীরে ধীরে যখন বুদ্ধের শিষ্য সংখ্যা বাড়তে লাগল তখন তিনি তাঁর প্রধান শিষ্যদেরও অনুমতি ও নির্দেশ দিলেন 'বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য' ভিক্ষুরা যেন ভ্রমণ করেন। তাঁর নির্দেশে তাঁর শিষ্যরাও দিকে দিকে বুদ্ধের উপদেশ প্রচার করতে বেরোলেন এবং দলে দলে লোক তাঁর কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার জন্য আসতে লাগল। প্রথম দিকে বুদ্ধ নিজেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দিতেন, কিন্তু ক্রমে তাঁর একার পক্ষে এই কাজ দুরূহ হয়ে উঠ্‌লো এবং দূরতর স্থান থেকে লোকেদের আসার পক্ষেও নানা বিঘ্ন দেখা দিতে লাগল। তখন বুদ্ধ ভিক্ষুদেরও প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দেবার অধিকার দিলেন এবং ভিক্ষুদের অন্যের শিক্ষার ভারও নিতে হ'ল। এতদিন নবাগতেরা বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হ'তেন, এখন থেকে তাদের

সঙ্ঘেরও শরণ নিয়ে দীক্ষিত হ'তে হল। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ[২] বা আশ্রয় নিয়ে বহু লোক সঙ্ঘে যোগ দিতে লাগলো। যোগ্য-অযোগ্য, উত্তম-অধম, নানা লোক যখন সঙ্ঘে প্রবেশ করলো তখন স্বাভাবিক নিয়মেই ভিক্ষুদের মধ্যে নানা দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'ল। প্রথম প্রথম নবাগতদের কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য, কার্য-অকার্য ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং কর্ত্তব্য স্থির না জানার জন্য অনেকে অনেক সময় অকার্য করে ফেলতেন। সাধারণ লোক ভিক্ষুদের এই সমস্ত অকার্য দেখে খুবই বিরক্ত হ'লে বুদ্ধকে এর ব্যবস্থা করার জন্য উপায় চিন্তা করতে হ'ল। তিনি এই সময় নবাগতদের জন্য উপাধ্যায়ের ব্যবস্থা করলেন, "ভিক্ষুগণ আমি উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি[৩]।" বলা যেতে পারে যে এই 'অনুজ্ঞা'র সময় থেকেই বিনয়ের সূত্রপাত হ'ল।

বিধি-নিয়ম প্রবর্তন

দেশ-দেশান্তরে ধর্মপ্রচারের ফলে যখন ভিক্ষু বা শিষ্যের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকল তখন আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার প্রভৃতি নানা ব্যাপারে সঙ্ঘমধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দিল। যথোচিত নিয়মের মধ্যে এনে সঙ্ঘকে সংযত ও সৎপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ ভিক্ষুগণের শীলবিষয়ক শিক্ষার বিধান করলেন। তিনি নানা প্রকার 'আজ্ঞা' (আণাদেসনা—আজ্ঞাদেশনা) প্রচার ও নানারূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর কাছে কোন অসদাচরণের সংবাদ এলে তিনি তখনই একটি নিয়ম প্রচার করতেন যাতে ভবিষ্যতে আর অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। আবার ভিক্ষুদের কোন অভাব-অভিযোগ, অসুখ-অসুবিধা দেখা দিলে তিনি তার প্রতীকারের জন্য নতুন নিয়ম প্রবর্তন ও ক্ষেত্রবিশেষে পুরাতন নিয়মের সংশোধন করতেন। এই ভাবে নতুন নতুন নিয়মের ও ঘটনার সংযোজনে বিনয়ের আকার বেড়ে উঠলো এবং শীল সম্পর্কিত সঙ্ঘের সমস্ত নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ পরবর্তীকালে বিনয়পিটকের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। প্রথম সঙ্গীতির সময় উপালি এইগুলি আবৃত্তি করার সময়ই প্রকৃতপক্ষে বিনয়পিটকের সংকলনের কাজ শুরু

হ'ল বলা যায়। বিধিনিষেধের আধিক্য ও নানাপ্রকার সাংগঠনিক আলোচনার জন্য বিনয়পিটকের অনেক অংশ পাঠকের কাছে নীরস ও আকর্ষণহীন মনে হ'তে পারে।

বিনয়পিটকের বিভিন্ন ভাগ

বিনয়পিটক প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত, যথা—(i) সুত্তবিভঙ্গ, (ii) খন্ধক, এবং (iii) পরিবার বা পরিবারপাঠ। সুত্তবিভঙ্গ আবার (ক) মহাবিভঙ্গ ও (খ) ভিক্খুনীবিভঙ্গ এই দুই অংশে, এবং খন্ধক (ক) মহাবগ্‌গ ও (খ) চুল্লবগ্‌গ এই দুই অংশে বিভক্ত। এখন আমরা বিনয়পিটকের অন্তর্গত প্রত্যেকটি গ্রন্থের পর্যালোচনা করব।

সুত্তবিভঙ্গ

(i) সুত্তবিভঙ্গ হ'ল বিনয়পিটকের প্রথম বিভাগ। সঙ্ঘের ও ভিক্ষুদের সম্বন্ধে যাবতীয় নিয়ম এই বিভাগের অন্তর্গত হওয়ার জন্য একে বিনয়পিটকের প্রধান বিভাগও বলা যেতে পারে।

সুত্ত (সূত্র) শব্দটি বৌদ্ধরা 'বক্তৃতা' বা 'অধ্যায়' এই অর্থে ব্যবহার করতেন। 'বিভঙ্গ' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণমূলক বিশদ ব্যাখ্যা। প্রথম অংশ মহাবিভঙ্গে ভিক্ষুদের আচার-ব্যবহারের আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে ভিক্ষুদের আট প্রকার 'আপত্তি'র বা অপরাধের অনুরূপ আটটি বিভাগ আছে। একে বিভঙ্গও বলা হয়। দ্বিতীয় অংশ ভিক্খুনীবিভঙ্গ মহাবিভঙ্গের আদর্শে সংকলিত ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ। এতে সাতটি বিভাগ আছে—'অনিয়ত' নামে অভিহিত আপত্তির নিয়মগুলি এতে অনুপস্থিত। ভিক্খু-বিভঙ্গের বহু নিয়ম ভিক্খুনীবিভঙ্গেও স্থান পেয়েছে এবং ভিক্খুবিভঙ্গেই এদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সুত্তবিভঙ্গে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে কবে, কোথায় এবং কী প্রসঙ্গে বুদ্ধ কোন্ বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন। এই ঐতিহাসিক ভূমিকার পর দেওয়া হয় সেই বিশেষ বিধিনিষেধটি। তার পর ঐ সূত্রটির প্রতিটি শব্দ ব্যাখ্যা করা হয়। এই রকম ভেঙ্গে-চুরে বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করাই

হ'ল 'বিভঙ্গ'। এই ব্যাখ্যা বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয় এবং আনুমানিক খৃ: পূ: চতুর্থ শতকে সুত্তবিভঙ্গ সম্পাদিত হয়ে থাকতে পারে। ব্যাখ্যাটি এতই মূল্যবান্ বিবেচিত হয়েছিল যে একে শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রাচীন ব্যাখ্যার পর প্রয়োজনীয় স্থলে আরও টীকা-টিপ্পনী আছে। এইভাবে সুত্তবিভঙ্গে আমরা তিনটি অংশ দেখতে পাই। প্রথম হ'ল ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ, যার প্রয়োজনে সূত্রটির প্রবর্তন আবশ্যক হয়েছিল, এবং বুদ্ধবচন বলে অভিহিত সূত্রটি। পরবর্তী পর্যায়ে সূত্রটির প্রাচীন বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং তারপর সূত্রটির প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে টিপ্পনী।

সুত্তবিভঙ্গে আলোচিত অপরাধগুলির প্রধান দুই ভাগ অনুসারে সুত্তবিভঙ্গের অংশ দুইটিকে যথাক্রমে 'পারাজিক' ও 'পাচিত্তিয়' এই দুই নামে ভাগ করা হয়েছে। সুত্তবিভঙ্গকে আবার 'উভতো বিভঙ্গ' এই আখ্যাও দেওয়া হয়।

পাতিমোকখ

সুত্তবিভঙ্গের প্রধান বা মূল অঙ্গ হ'ল পাতিমোক্খ (প্রাতিমোক্ষ)। পাতিমোক্খকে বিনয়পিটকের সারবস্তু বা ভিত্তি বলে মনে করা হয়। বর্তমান বিনয়পিটকে আমরা পাতিমোক্খের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখি না, এটি সুত্তবিভঙ্গের অঙ্গীভূত। পাতিমোক্খের অনুশাসনগুলির বিশদ ব্যাখ্যার জন্যই সম্ভবতঃ সুত্তবিভঙ্গ সংকলিত হয় এবং পাতিমোক্খের সূত্রগুলির প্রতিটি শব্দকে এতে ভেঙ্গে-চুরে বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলেই সুত্তবিভঙ্গের এরূপ নামকরণ হয়। সুত্তবিভঙ্গে পাতিমোক্খেরই সমস্ত নিয়মের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পাতিমোক্খের গুরুত্ব

পাতিমোক্খ বৌদ্ধসঙ্ঘের দণ্ডবিধি বা Penal code স্বরূপ। বৌদ্ধ সঙ্ঘে পাতিমোক্খের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। সকল দেশের সকল বৌদ্ধ সমাজই পাতিমোক্খের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

এবং এর অনুশাসনগুলিই ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে আদর্শ ভিক্ষুকে বলা হয়েছে 'পাতিমোক্‌খ সংবর সংবুতো'[৪] অর্থাৎ তাঁর জীবন পাতিমোক্‌খের বিধি-নিষেধের দ্বারা সুসংযত।

পাতিমোক্‌খের আবৃত্তি

প্রতিমাসে দু'বার, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়, ভিক্ষুসঙ্ঘের 'উপোসথ'-দিনে[৫] পাতিমোক্‌খ আবৃত্তি করা হয়। এক একটি অধ্যায়ের আবৃত্তির শেষে সভাপতি প্রশ্ন করেন উপস্থিত কোন ভিক্ষু পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানের পর এই অনুশাসনগুলির বিরুদ্ধ কোন কাজ করেছেন কিনা। যদি কোন ভিক্ষু কোনও অপরাধে অপরাধী হ'ন, তবে তাঁকে বিধি-অনুসারে শাস্তিগ্রহণ করে পাপমুক্ত হ'তে হয়। নির্দোষ ভিক্ষু মৌন থেকে জানিয়ে দেন তিনি কোন বিধি-বিরুদ্ধ কাজ করেন নি। ভিক্ষুরা যাতে বিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হ'তে পারেন তার জন্যই পাতিমোক্‌খের উৎপত্তি।

আটটি বিভাগ (Section)

পালি ভাষায় সংকলিত পাতিমোক্‌খে আমরা আটটি বিভাগে (section) বিভক্ত মোট ২২৭টি সূত্র পাই। এটি হ'ল থেরবাদী শাখার পাতিমোক্‌খ। এই আটটি বিভাগ যথাক্রমে,—১। পারাজিক ২। সঙ্ঘাদিসেস ৩। অনিয়ত ৪। নিস্‌সগ্‌গিয় পাচিত্তিয় ৫। পাচিত্তিয় ৬। পাটিদেসনিয় ৭। সেখিয় ৮। অধিকরণসমথ। পাতিমোক্‌খের সূত্র সংখ্যা প্রথমে ১৫২টি[৬] ছিল বলে উল্লেখ করা আছে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

পাতিমোক্‌খ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নানাভাবে করা হয়েছে[৭]

(১) পাতিমোক্‌খন্তি আদিমেতং মুখমেতং পামুখমেতং কুসলানং ধম্মানং তেন বুচ্চতি পাতিমোক্‌খন্তি।[৮]

পাতিমোক্‌খ প্রথম, ইহা মুখ, ইহা সকল কুশল ধর্মের প্রধান।

(২) যো তং পাতি রক্খতি তং মোক্খেতি মোচেতি অপায়কাদি দুক্খেহি তস্মা পাতিমোক্খন্তি বুচ্চতি ।৯

যে কেহ (পাতিমোক্খের) নিয়মগুলি পালন করে, তাহাকে (নিয়মগুলি) মুক্ত করে, দুঃখ হইতে ত্রাণ করে, এইজন্য ইহাকে পাতিমোক্খ বলে ।

(৩) পাতিমোক্খন্তি অতিমোক্খং পাতিপ্পামোক্খং অতিসেট্ঠং অতি উত্তমং ।১০

যাহা সর্বোচ্চ, অসাধারণভাবে উচ্চ, অতি উত্তম এবং অতিশয় শ্রেষ্ঠ, তাহাই পাতিমোক্খ ।

এখানে যে অর্থগুলি দেওয়া হ'ল তা' ছাড়া আরো অনেকভাবে পাতিমোক্খ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে । এদের মধ্যে বিনয়ের যে অর্থ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাই প্রাচীনতম । বিনয়ের ব্যুৎপত্তি অনুসরণ করলে পাতিমোক্খ শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হওয়া উচিৎ 'প্রাতিমুখ্য' কিন্তু বৌদ্ধরা 'প্রাতিমোক্ষ' শব্দটিকেই এর সংস্কৃত প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করে থাকেন । 'যার দ্বারা পাপ মুক্ত, পরিত্যক্ত বা অপনীত হয়' এই যদি শব্দটির অর্থ ধরা হয় তা' হ'লে প্রতি+$\sqrt{}$মুচ্ থেকে শব্দটি নিষ্পন্ন করা যায় না ।

সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে মনে হয় 'পাতিমোক্খ' শব্দটিকে দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হোত,—মুচ্ বা মোক্ষ্ থেকে নিষ্পন্ন করে শব্দটিকে 'মুক্তি' (deliverance) অর্থে এবং 'মুখ' থেকে 'প্রধান' (chief) অর্থে ।

বিভিন্ন পাতিমোক্খের মধ্যে তারতম্য ও প্রভেদ

'পাতিমোক্খের' বিশেষ গুরুত্বের জন্যই বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে যে সমস্ত শাখার (sect) উদ্ভব হয়েছিল তাঁরা সকলেই নিজ নিজ 'পাতিমোক্খ' সংকলন করেন । বিভিন্ন শাখার সংকলন তুলনা করলে আমরা দেখি স্থান-কাল-পরিবেশ ভেদে এর বিধিনিষেধগুলির সংখ্যা কম-বেশী হয়েছে । বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে এই সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তুলনামূলক আলোচনা১১ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই আলোচনার

সাহায্যে বিভিন্ন শাখার প্রসারের ধারা ও পাতিমোক্‌খের প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করা যায়।

নিচের তালিকা থেকে বিভিন্ন প্রভাবশালী বৌদ্ধশাখার পাতিমোক্‌খের বিভাগ (Section) অনুসারে নিয়মগুলির সংখ্যার তারতম্য বোঝা যায় :—

শাখা	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	৪র্থ বিভাগ	৫ম বিভাগ	৬ষ্ঠ বিভাগ	৭ম বিভাগ	৮ম বিভাগ	মোট সংখ্যা
সর্বাস্তিবাদ	৪	১৩	২	৩০	৯০	৪	১১৩	৭	=২৬৩
মূলসর্বাস্তিবাদ	৪	১৩	২	৩০	৯০	৪	১০৮	৭	=২৫৮
থেরবাদ	৪	১৩	২	৩০	৯২	৪	৭৫	৭	=২২৭
ধর্মগুপ্ত	৪	১৩	২	৩০	৯০	৪	১০০	৭	=২৫০
মহাসাংঘিক	৪	১৩	২	৩০	৯২	৪	৬৬	৭	=২১৮

সর্বাস্তিবাদীদের ২৬৩টি বিধিনিষেধই হল সর্বোচ্চ সংখ্যা এবং মহা-সাংঘিকদের ২১৮টি হ'ল সর্বনিম্ন সংখ্যা। সংখ্যার তারতম্য আবার কেবল পঞ্চম এবং সপ্তম বিভাগ দুটিতেই লক্ষ্য করা যায় এবং সপ্তম বিভাগেই আবার বিশেষ প্রভেদ আছে। সর্বাস্তিবাদ এবং মূলসর্বাস্তিবাদের 'পাতিমোক্‌খ' সংস্কৃতে, থেরবাদের সংকলন পালিতে এবং ধর্মগুপ্ত ও মহাসাংঘিকদের বিধিগুলি আমরা চীনা অনুবাদে পাই। কেবল যে সংখ্যাতেই তারতম্য আছে এমন নয়, সূত্রগুলির ক্রমবিন্যাস (arrangement) এবং শব্দের ব্যবহারেও এই সংকলনগলির মধ্যে প্রভেদ আছে। সংস্কৃত 'প্রাতিমোক্ষ' গ্রন্থের প্রারম্ভে ও শেষে কতকগুলি শ্লোক আছে, কিন্তু পালি সংকলনে তা' অনুপস্থিত।

সর্বাস্তিবাদী, মূলসর্বাস্তিবাদী ও থেরবাদী শাখার, যাদের মূল গ্রন্থ আমরা পেয়েছি, সংকলনগুলির 'বিভাগ' অনুসারে সূত্রগুলির ক্রমের তারতম্য নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে,—

	সর্বাস্তিবাদী	মূলসর্বাস্তিবাদী	থেরবাদী
প্রথম বিভাগ	১-৪	১-৪	১-৪
দ্বিতীয় বিভাগ	১-১১	১-১১	১-১১

	সর্বাস্তিবাদী	মূলসর্বাস্তিবাদী	থেরবাদী
	১২	১৩	১২
	১৩	১২	১৩
তৃতীয় বিভাগ	১-২	১-২	১-২
চতুর্থ বিভাগ	১-২২	১-২২	১-২২
	২৩	২৩	২৬
	২৪	২৪	২৭
	২৫	২৫	২৫
	২৬	২৬	২৮
	২৭	২৭	২৯
	২৮	২৮	২৪
	২৯	২৯	৩০
	৩০	৩০	২৩
পঞ্চম বিভাগ	১-৩	১-৩	১-৩
	৪	৪	৬৭
	৫	৫	৭
	৬	৬	৬
	৭	৮	৮
	৮	৭	৯
	৯	৯	৮১
	১০	১০	৭২
	১১-১৫	১১-১৫	১১-১৫
ষষ্ঠ বিভাগ	১-৪	১-৪	১-৪

সপ্তম বিভাগ : সর্বাস্তিবাদীদের প্রথম এগারোটি নিয়ম থেরবাদী সংকলনে পাওয়া যায় না এবং ১২ নিয়মটি পালির প্রথম নিয়ম দুটির সঙ্গে এক। মূলসর্বাস্তিবাদীদের প্রথম সাতটির সঙ্গে পালি সূত্রের প্রথমটি অভিন্ন। এই ভাবে অন্যান্য সূত্রগুলিতেও প্রভেদ আছে।

	সর্বাস্তিবাদী	মূলসর্বাস্তিবাদী	থেরবাদী
অষ্টম বিভাগ :	১-৩	১-৩	১-৩
	৪	•৭	৪
	৫	৪	৫
	৬	৫	৬
	৭	৬	৭

সংখ্যা ও ক্রমের বিভেদ ছাড়াও সূত্রগুলির ভাষাতেও যে ভেদ ছিল তা' পূর্বেই বলা হয়েছে। •এখানে কয়েকটি ভেদ উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হ'ল,—

মূলসর্বাস্তিবাদী সঙ্ঘাবশেষ বিভাগের দ্বিতীয় সূত্রের 'অবদলবিপরিণতেন' শব্দের স্থানে সর্বাস্তিবাদীরা গ্রহণ করেছেন 'উদীর্ণবিপরিণতেন' এবং পালিতে আছে 'ওতিণ্ণো বিপরিণতেন'। মূলসর্বাস্তিবাদী এয়োদশ পাতয়ন্তিকায় আছে 'আজ্ঞাবিহেঠনাৎ,' কিন্তু সর্বাস্তিবাদী সংকলনে আছে 'অন্যবাদবিহেঠনাৎ' এবং পালিতে পাচিত্তিয় ১২ সূত্রে ঐ জায়গায় 'অঞ্ঞ্ঞবাদকে' পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 'পাতিমোক্‌খ' নামে উল্লিখিত কোন অংশ আমরা বিনয়পিটকে পাই না, কিন্তু পাতিমোক্‌খের প্রতিটি সূত্র এবং তার ব্যাখ্যা সুত্তবিভঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে সুত্তবিভঙ্গকে পাতিমোক্‌খের একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ বলে মনে করা যায়। পাতিমোক্‌খের শিক্ষাপদ বা অনুশাসনগুলির বিশদ ব্যাখ্যার জন্যই সুত্তবিভঙ্গের সৃষ্টি।

কোন্‌টি প্রাচীনতর—সুত্তবিভঙ্গ বা পাতিমোক্‌খ

এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে[১২], যে পাতিমোক্‌খের সূত্র এবং ব্যাখ্যা সহ সুত্তবিভঙ্গ প্রথম রচিত হয়েছিল এবং পরে সঙ্ঘকর্মের সুবিধার জন্য তা থেকে পাতিমোক্‌খের সংকলন করা হয়, না, পাতিমোক্‌খকে ভিত্তি করেই সুত্তবিভঙ্গের উদ্ভব।

সুত্তবিভঙ্গ এবং পাতিমোক্‌খের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে মনে হয় পাতিমোক্‌খই বিনয়পিটকের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং সুত্তবিভঙ্গ পরবর্তীকালের রচনা। পাতিমোক্‌খের বিধিগুলির ক্রমবিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে

অনেক জায়গায় পরের সূত্র আগের সূত্রটির সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধ যে দুটিকে একসঙ্গে গ্রহণ না করলে অর্থবোধে অসুবিধা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থে সূত্র দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে কোন টীকা বা ব্যাখ্যা না থাকাই বিধেয়। সুত্তবিভঙ্গের টীকা অনেক সময় বিধিগুলির ব্যবহারের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে, আবার কোন স্থলে প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। টীকাতে এমন ব্যবস্থাও করা হয়েছে যাতে বিধিনিষেধগুলি কেউ এড়িয়ে যেতে না পারে, আবার কখনও টীকার মাধ্যমে মূলসূত্রের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ একটি নতুন বিধির সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি সবই প্রমাণ করে যে সুত্তবিভঙ্গ একটি মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং ঐ মূলগ্রন্থটি নিশ্চয়ই পাতিমোক্‌খ। পাতিমোক্‌খে পারাজিক প্রভৃতি সাতটি 'আপত্তি-স্কন্ধ'র কথা বলা আছে কিন্তু খন্ধকে দুক্কট, থুল্লচ্চয়, দুব্ভাসিত নামে আরো তিনটি 'আপত্তি'র উল্লেখ আছে। পাতিমোক্‌খে এইগুলির উল্লেখ না থাকলেও সুত্তবিভঙ্গের মধ্যে আছে। এই 'আপত্তি'গুলি নিশ্চয়ই পাতিমোক্‌খের পরবর্তীযুগে বিহিত এবং সেই কারণে সুত্তবিভঙ্গে উল্লিখিত হ'লেও মূল দণ্ডবিধিতে এদের উল্লেখ নেই। পাতিমোক্‌খে আমরা যে সমাজের ছবি পাই খন্ধকে তার থেকে উন্নত সমাজের প্রতিচ্ছবি আছে। বিষয়বস্তু, টীকা এবং বিধিনিষেধগুলির প্রকৃতি ও ফলাফল বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে সুত্তবিভঙ্গের টীকা টিপ্পনী পরবর্তীকালের সংযোজন। পাতিমোক্‌খই বিনয়ের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং সুত্তবিভঙ্গে সমগ্র পাতিমোক্‌খ অন্তর্ভুক্ত থাকায় প্রাচীন আচার্যগণ এই সংকলনটিকে বিনয়পিটকের একটি পৃথক অংশরূপে নির্দিষ্ট করেন নি।

এখন আমরা পাতিমোক্‌খের বিভিন্ন বিভাগ (section) সম্বন্ধে আলোচনা করব। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, থেরবাদী শাখার পালি পাতিমোক্‌খে আমরা এখন ২২৭টি সূত্র পাই, যদিও প্রথমে এই সূত্র সংখ্যা ১৫২ ছিল বলে উল্লিখিত আছে।

প্রথম বিভাগ—পারাজিক

পাতিমোক্‌খের প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হ'ল পারাজিক (পারাজিকা ধম্মা) অর্থাৎ পারাজিক নামক দোষ বা 'আপত্তি'গুলি। এই

অপরাধে অপরাধী ভিক্ষু সঙ্ঘ মধ্যে বাস করার অধিকার হারায়। এই বিভাগে চারটি বিধি বা সূত্র আছে এবং এর যে কোন একটি ভঙ্গ করলেই অপরাধী ভিক্ষুকে সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই চারটি বিধি হ'ল, যথাক্রমে, অব্রহ্মচর্য অর্থাৎ মৈথুন আচরণ করলে ভিক্ষু পরাজিত হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্ঘমধ্যে কেউ বাস করে না; চৌর্য অর্থাৎ গ্রাম বা অরণ্য থেকে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করলে ভিক্ষু পরাজিত হয়; প্রাণিবধ অর্থাৎ মনুষ্য শরীরকে প্রাণ থেকে বিচ্যুত করলে বা প্রাণ হরণে কোন প্রকার উৎসাহ বা সাহায্য দিলে ভিক্ষু পরাজিত হয়; এবং নিজের উপর অলৌকিক ধর্মের আরোপ অর্থাৎ লোকোত্তর কোন গুণ (উত্তরিমনুস্‌স ধম্ম) অর্জন না করেই ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী বলে নিজেকে প্রচার করলে ভিক্ষু পরাজিত ও সঙ্ঘমধ্যে বাস করার অযোগ্য হয়।

বিধিগুলির সার্থকতা

পারাজিক-বিধির প্রথম তিনটি সূত্র যে কোন সভ্য সমাজেই নৈতিক অপরাধ বলে স্বীকৃত। চতুর্থ সূত্রটিকে কেবলমাত্র মিথ্যা বাগাড়ম্বর বা দম্ভের নিন্দা বলে মনে করা ঠিক নয়। মিথ্যাভাষণের এই প্রবণতাই ভিক্ষুর পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

'পারাজিক' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ

'পারাজিক শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে[১৩]। বুদ্ধঘোষ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'পরাজয়প্রাপ্ত' অর্থাৎ শীলাদি রক্ষার সাহায্যে যে ফল অর্জন করা যায় তা থেকে বঞ্চিত—'পরাজিতো হোতি পরাজয়মাপন্নো'। মূলসর্বাস্তিবাদীরাও এই মত পোষণ করেন। এই অর্থে শব্দটি পরা √জি থেকে নিষ্পন্ন; আর একদলের মতে শব্দটি পরা- √অজ্‌ থেকে নিষ্পন্ন। এই মতে শব্দটির অর্থ 'যে পাপে পরাক্ষেপ বা বহিষ্কার হয়'। শব্দটি √জি ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হওয়া ব্যাকরণসম্মত নয়, আবার বৈদিক ধাতু অজ্‌ (ক্ষেপণ)-এর প্রয়োগ পালিভাষায় দেখা যায় না।

শব্দটির ব্যুৎপত্তি যাই হোক না কেন এর উদ্দিষ্ট অর্থ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকা সম্ভব নয়। প্রতিটি সূত্রে 'পারাজিকো হোতি অসংবাসো' এই উক্তি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কোন ভিক্ষু সঙ্ঘমধ্যে বাস করার ও সঙ্ঘের ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করার অযোগ্য বিবেচিত হ'লে যেমন তাকে বহিষ্কার করা কর্তব্য তেমনই কোন ভিক্ষু যদি দেখেন যে সঙ্ঘমধ্যে তিনি কোন সাহচর্য পান না বা যে উচ্চ ফললাভের উদ্দেশ্য নিয়ে সঙ্ঘকে আশ্রয় করেছিলেন তা' সিদ্ধ হওয়ার কোন আশা নেই, তবে তিনি সঙ্ঘের সদস্যপদ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বঞ্চিত হ'বেন।

সঙ্ঘাদিসেস

দ্বিতীয় বিভাগ হ'ল সঙ্ঘাদিসেস (সঙ্ঘাদিশেষ) এবং তেরোটি বিধি (তেরস সঙ্ঘাদিসেসা ধম্মা) এই বিভাগের অন্তর্গত। যে অপরাধ থেকে মুক্তিলাভের জন্য 'আদি'তে ও 'শেষে' সঙ্ঘের উপর নির্ভর করতে হয় তাকেই 'সঙ্ঘাদিসেস' বলে—'সঙ্ঘো আদিম্হি চেব সেসে চ ইচ্ছিতব্বো অস্স তং সঙ্ঘাদিসেসো।' 'সঙ্ঘের উপর নির্ভর করার' অর্থ হ'ল সঙ্ঘের কয়েকটি বিশেষ ক্রিয়াকর্মের (সঙ্ঘকম্ম) অনুষ্ঠানসাপেক্ষে এই অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

পরিবাস-মানত্ত ও অব্ভান

এই অপরাধে অপরাধী ভিক্ষুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘ কীরকম ব্যবস্থা নেবে তার নির্দেশ সুত্তবিভঙ্গে পাওয়া যায়। অপরাধী ভিক্ষুকে প্রথমেই 'পরিবাস' দণ্ড দেওয়া হয় অর্থাৎ ঐ ভিক্ষু কতকগুলি সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়,—যেমন, ঐ সময়ের মধ্যে সেই ভিক্ষু উপসম্পদা দিতে পারে না, কোন অন্তেবাসীকে আশ্রয় দিতে পারে না, ইত্যাদি। ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে 'পরিবাস' এক থেকে বহু দিন পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে; দোষী ভিক্ষু যতদিন তার দোষ সঙ্ঘের কাছ থেকে গোপন করে রাখে এই দণ্ডভোগের কাল ততদিন পর্যন্ত চলে। 'পরিবাসে'র পর ঐ ভিক্ষুকে ছ'দিনের জন্য 'মানত্ত' দণ্ড ভোগ করতে হয়। এই সময়েও

ভিক্ষু পূর্বোক্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। সংযত ও নিয়মানুগ হ'য়ে এই দণ্ড দুটি ভোগ করার পর অপরাধী ভিক্ষু আবার সঙ্ঘমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার নাম 'অব্ভান'। অন্ততঃ ২০জন ভিক্ষু নিয়ে গঠিত সঙ্ঘই অব্ভান-দানের অধিকারী। দণ্ডভোগের সময়ে ভিক্ষুকে সঙ্ঘ থেকে আলাদা বাস করতে হয়।

ব্যভিচার, কুটিরনির্মাণ, অমূলক অভিযোগ, সঙ্ঘভেদ, একগুঁয়েমি প্রভৃতি নানা বিষয় সঙ্ঘাদিসেস বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম পাঁচটি বিধি ব্যভিচার বা যৌনবিষয় সংক্রান্ত কিন্তু প্রথম পারাজিক অপেক্ষা এই অপরাধ লঘু হওয়ার জন্য ভিক্ষুকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করা হয় না।

অনিয়ত

অনিয়ত নামক তৃতীয় বিভাগটি ২টি বিধি নিয়ে গঠিত। ভিক্ষুণীর সঙ্গে ভিক্ষু কোন অসদৃশ বা গর্হিত আচরণ করলে এই বিধি অনুযায়ী ঐ ভিক্ষুর শাস্তিবিধান করা হয়। ঘটনা বা অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে ঠিক করা হয় ভিক্ষুকে পারাজিক, সঙ্ঘাদিসেস বা পাচিত্তিয়, কোন্ বিধি ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হ'বে। বিধির প্রয়োগ নিয়ত বা স্থির না থাকার জন্যই এই নিয়মের নাম অনিয়ত।

নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়

চতুর্থ বিভাগ নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়-তে (নৈসর্গিক প্রায়শ্চিত্তিক) মোট ত্রিশটি সূত্র আছে। এই ত্রিশটি বিধির অধিকাংশ হ'ল চীবরসংক্রান্ত এবং অন্যগুলি ভিক্ষাপাত্র, কম্বল, সোনারূপা সম্বন্ধে। কোন ভিক্ষু 'অন্যায়' ভাবে বা নিয়মবিগর্হিত ভাবে চীবর ইত্যাদি কোন দ্রব্য রাখলে তাকে এই দণ্ডবিধির নির্দেশ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে হয়। যে যে বস্তুর জন্য ভিক্ষু অপরাধী হয়েছে সঙ্ঘ, গণ বা বিশেষ কোন ব্যক্তির নিকট সেই সেই বস্তু ত্যাগ করে অপরাধ স্বীকারপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যা 'নিসর্গ' বা ত্যাগের যোগ্য এই অর্থে এখানে নিস্সগ্গিয় শব্দের প্রয়োগ।

এই বিভাগের বিধিগুলি চীবরবর্গ, মেষলোমবর্গ (এড়কলোম-) এবং পাত্রবর্গ (পত্তবগ্গো) এই তিন বর্গে বিভক্ত। সাধারণভাবে ভিক্ষুরা যাতে নির্লোভ ও অল্পে সন্তুষ্ট থাকে সেইজন্যই এই নিয়মগুলি বিহিত হয়েছিল।

পাচিত্তিয়

মোট বিরানব্বইটি সূত্র নিয়ে পঞ্চম বিভাগ পাচিত্তিয় (প্রায়শ্চিত্তিক) গঠিত। ন'টি বর্গে সূত্রগুলিকে ভাগ করা হয়েছে। বর্গগুলির বিন্যাসে যেমন কোন সামঞ্জস্য নেই তেমনই বিধিগুলির সৃষ্টিতেও কোন বিশেষ পদ্ধতি বা নীতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। যখন যেমন ঘটনা ঘটেছে বা অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তখন সেই অবস্থার প্রতিবিধানে বিধিগুলি করা হয়েছে। এই বিভাগে আমরা দেখি ভিক্ষুকে কতকগুলি কাজ করতে বারণ করা হয়েছে, যেমন, মিথ্যা ভাষণ, অবজ্ঞা সূচক বাক্য প্রয়োগ, খল ব্যবহার, গাছপালা কেটে কিছু ভোগ করা, অসতর্কভাবে জলপান করে প্রাণীহত্যা, বুদ্ধশাসনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ, সঙ্ঘের নির্দেশ অমান্য প্রভৃতি। আবার, শয্যা, আসন, চীবর, ভিক্ষুর দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু সাধারণ বিধিও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। 'পাচিত্তিয়'-অপরাধগুলিকে খুব গুরুতর ধরনের মনে করা হয় না, এবং অপরাধী ভিক্ষুকে কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে অপরাধ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়-র মতো গৃহীত বস্তু ত্যাগ করার কোন নির্দেশ এতে নেই।

পাটিদেসানিয়

ষষ্ঠ বিভাগ পাটিদেসনিয় (প্রতিদেশনীয়)-তে চারটি বিধি আছে। এই বিভাগের বিধিগুলি খাদ্য বা ভোজ্যবিষয় সম্বন্ধে বিহিত এবং সাধারণভাবে দোষ স্বীকার করলেই ভিক্ষু দোষমুক্ত হয়।

সেখিয়—বিভাগটির সার্থকতা

শিক্ষণীয় সদাচারবিষয়ক ৭৫টি সূত্র নিয়ে সপ্তম বিভাগ সেখিয় (শৈক্ষ্য) গঠিত। সাধারণভাবে সদাচার বিষয়ক এই নির্দেশগুলি (সেখিয়া ধম্মা) পালন না করলে কোন ভিক্ষুকে দোষী সাব্যস্ত বা কোনরূপ দণ্ডবিধান করা হয় না। তবে, নির্দেশমত ব্যবহার না করলে অন্য ভিক্ষুদের কাছে সম্মানহানি ঘটে। কোনরূপ শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা না থাকায় এবং বিধিগুলি কেবলমাত্র আচার-ব্যবহার মূলক হওয়ার জন্য বিভাগটিকে পাতিমোক্‌খের অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ সম্বন্ধে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যেমন অনেক ধীর-স্থির ও বিদগ্ধ ব্যক্তি সঙ্ঘের আশ্রয় নিয়েছিলেন তেমনই এর মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বহু অধীর, চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ। এই বিভাগে যে নির্দেশগুলি স্থান পেয়েছে সব সভ্যসমাজেই শৃঙ্খলাপরায়ণ লোকেরা তা' নিজের থেকেই পালন করে থাকেন; কিন্তু যারা অন্যপ্রকৃতির মানুষ তারা যাতে একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলাবোধের মধ্যে থাকে সেইজন্যই এই 'শিক্ষণীয়' নিয়মগুলি কালক্রমে পাতিমোক্‌খের অন্তর্ভুক্ত হয়। লোকচক্ষে ভিক্ষুরা তাদের আচার-ব্যবহারের জন্য যাতে ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র না হ'ন সেদিকে দৃষ্টি রেখেই হয়ত এগুলি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। স্থান-কাল-পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের আচার-ব্যবহার পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং সেইজন্যই বোধহয় বিভিন্ন পাতিমোক্‌খ সংকলনে এই বিভাগের বিধিগুলির সংখ্যায় এত প্রভেদ ঘটেছে।

আদর্শ ভিক্ষুর যেমন জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপরায়ণ হওয়া উচিত তেমনই তাঁকে হ'তে হ'বে আচারে-ব্যবহারে মার্জিত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। সে দিক থেকে এই সদাচারগুলির যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

অধিকরণসমথ

সঙ্ঘে বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হ'লে কী ভাবে তার মীমাংসা করতে হ'বে তার নির্দেশ আছে অধিকরণসমথ (অধিকরণশমথ) নামক অষ্টম

বিভাগের সাতটি নিয়মে। এই নিয়মগুলি হ'ল আসলে অশান্তি নিবারণের সাতটি পদ্ধতি[১৪] এবং গণতন্ত্রের আদর্শে গঠিত সঙ্ঘে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই এই পদ্ধতিগুলির উদ্ভব হয়। 'অধিকরণ' অর্থাৎ 'বিবাদ' 'শমথে'র অর্থাৎ 'প্রশমনে'র জন্য এই বিধি বা পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হয় বলে এর নাম 'অধিকরণসমথ'।

ভিক্খুনী-পাতিমোকখ

ভিক্খু পাতিমোক্খের আদর্শেই ভিক্খুনী পাতিমোক্খ রচিত হয় এবং অধিকাংশ নিয়মই ভিক্খু পাতিমোক্খের পুনরাবৃত্তি। বিভাগ অনুসারে ভিক্খুনী পাতিমোক্খের সূত্রসংখ্যা হ'ল,—পারাজিক ৮; সঙ্ঘাদিসেস ১৭; নিঃ পাচিত্তিয় ৩০; পাচিত্তিয় ১৬৬; পাটিদেসনিয় ৮; সেখিয় ৭৫; অধিকরণসমথ ৭, মোট=৩১১

খন্ধক

(ii) খন্ধক বিনয়পিটকের দ্বিতীয় বিভাগ। সাধারণভাবে সঙ্ঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং ভিক্খু-ভিক্খুনীদের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী ও আচার ব্যবহার এর দুই অংশ (ক) মহাবগ্গ ও (খ) চুল্লবগ্গে সংগৃহীত আছে। বুদ্ধের প্রচারক জীবনের ও তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান এই বিভাগে আছে। খন্ধককে সুত্তবিভঙ্গের পরিপূরক বলে মনে করা যায়।

মহাবগ্গ

(ক) মহাবগ্গ বিনয়পিটকের অন্যতম মূল্যবান অংশ। এতে দশটি স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদ আছে এবং পরিচ্ছেদগুলির আকার বড় হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ সংকলনটির নাম মহাবগ্গ হয়েছে। বুদ্ধ-জীবনীর একটি প্রাচীনতম বিবরণ মহাবগ্গের প্রথম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। বোধিপ্রাপ্তির পর সারনাথে 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন' বা প্রথম উপদেশদান করতে যাওয়ার সময় থেকে বুদ্ধ-কাহিনীর অংশ এই খণ্ডে বিবৃত হয়েছে। তাঁর প্রচারক

জীবনের আনুপূর্বিক বিবরণের মধ্যে আমরা দেখি কী ভাবে সঙ্ঘ ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো। বিনয়ের বিধানগুলির প্রবর্তনের ইতিহাসও আমরা এখানে পাই। আমরা দেখেছি যে পাতিমোক্‌খকে ভিত্তি করে সুত্তবিভঙ্গ তৈরী হয়েছে, আবার মহাবগ্‌গে আমরা একটি প্রাচীনতর টীকার অস্তিত্ব দেখতে পাই এবং মনে হয় সুত্তবিভঙ্গের অন্তর্গত পাতিমোক্‌খের ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনী এই প্রাচীনতর টীকার ভিত্তিতেই লেখা হয়েছিল।

গ্রন্থের প্রারম্ভে দেখি বোধিবৃক্ষের নীচে সদ্য বোধিপ্রাপ্ত সম্যক্‌ সম্বুদ্ধ বসে আছেন। বোধিবৃক্ষ, অজপাল, মুচলিন্দ ও রাজায়তন বৃক্ষের নীচে ঐ সময় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণের পর আমরা দেখি ব্রহ্মার অনুরোধে বুদ্ধ চলেছেন তাঁর অমূল্য উপদেশ প্রচার করতে। সারনাথে প্রথম উপদেশ দেওয়ার পর যখন তিনি সাধারণের কাছে তাঁর উপলব্ধ সত্য প্রচার করতে বেরোলেন তখন তাঁর উপদেশ ও শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকল। প্রথম প্রথম তিনি নিজেই সকলকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দিতেন, কিন্তু দেশ-দেশান্তর থেকে যখন ধর্মার্থী লোকেরা আসতে লাগল তখন নানা সমস্যা দেখা দিল[১৫]। তিনি বুঝলেন সাধারণের কষ্ট লাঘব করার জন্য যোগ্য শিষ্যের উপর এই দীক্ষাদান প্রভৃতির ভার দেওয়া আবশ্যক। বুদ্ধের নির্দেশে এই সময় থেকেই 'ত্রিশরণে'র প্রচলন হয় এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মহাবগ্‌গে ধর্মপ্রচারের বিবরণের মধ্যে আমরা দুই প্রধান বুদ্ধ-শিষ্য সারিপুত্ত (শারিপুত্র) ও মোগ্‌গল্লান (মৌদ্‌গল্যায়ন) এবং বুদ্ধের আত্মজ রাহুলের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণের বিবরণও পাই।

সঙ্ঘে প্রবেশের নিয়ম, উপোসথ, বস্‌সবাস[১৬] (বর্ষাবাস) ও পবারণা[১৭] অনুষ্ঠানের বিধি, অধিকরণ-সমথ বা বিবাদ-শান্তির আইন কানুন এবং সঙ্ঘভেদ ঘটলে বিচার ব্যবস্থা, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, যান, বাসস্থান প্রভৃতির বিধি, সকল প্রকার 'সঙ্ঘকর্ম', এবং ভিক্ষুদের কর্তব্য ইত্যাদি যাবতীয় নির্দেশ মহাবগ্‌গে সংগৃহীত আছে। বহু নীতিমূলক আখ্যানও এতে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে ভেষজশাস্ত্র সম্বন্ধে এবং বিশেষরূপে কয়েকটি রোগ-প্রশমনের জন্য এই গ্রন্থে যে বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা

হয়েছে তাতে খৃঃ পূঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গাঙ্গেয় ভারতবর্ষে প্রচলিত ভেষজশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যায়। আমাদের আধুনিক ভেষজশাস্ত্রবিদ্ ও আইনবিদ্গণ বৌদ্ধশাস্ত্রে সংগৃহীত ঔষধ ও আইন সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্যগুলিকে কাজে না লাগিয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন বলে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ T. Rhys Davids দুঃখ প্রকাশ করেছেন।[১৮]

চুল্লবগ্গ

(খ) খন্ধকের দ্বিতীয় অংশ চুল্লবগ্গ বারোটি স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। মহাবগ্গের তুলনায় পরিচ্ছেদগুলি ছোট হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ এই অংশের নাম চুল্ল বা ছোট দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কিত কয়েকটি নীতিমূলক কাহিনী, সঙ্ঘের সাংগঠনিক ইতিহাস এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচার-ব্যবহারবিধি ও প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম এই অংশে সংগৃহীত আছে। রাজগৃহ এবং বৈশালীতে অনুষ্ঠিত প্রথম দুই বৌদ্ধ সঙ্গীতির অনুষ্ঠানের বিবরণ চুল্লবগ্গের শেষ দুই পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। অনেকের মতে গ্রন্থের এই অংশ পরবর্তীকালের সংযোজন।

চুল্লবগ্গে উল্লিখিত একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল স্ত্রীলোকের সঙ্ঘে প্রবেশে বুদ্ধের সম্মতি ও ভিক্খুনীদের জন্য আচারবিধি প্রণয়ন। মহাপ্রজাপতি গোতমী স্ত্রীজাতিকেও প্রব্রজ্যা দেবার জন্য প্রার্থনা জানালে বুদ্ধ প্রথমে তা' প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁকে বিশেষ বেদনা ও দুঃখ অনুভব করতে দেখে আনন্দ অনুমতির জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ জানালেন। আনন্দের বার বার অনুরোধে বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গেই বুদ্ধ স্ত্রীজাতির প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনুমতি দিলেন; ভিক্খুনীদের জন্য কিন্তু তিনি বিশেষ আটটি নিয়মের প্রবর্তন করলেন। বুদ্ধ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পেরেছিলেন যে সঙ্ঘে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার দেওয়া ভাল হয়নি। তিনি আনন্দকে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে নারীর প্রবেশ না ঘটলে সদ্ধর্ম হাজার বছর স্থায়ী হোত কিন্তু এখন এর স্থায়িত্ব মাত্র পাঁচশ' বছর। প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধের আশঙ্কা সত্য বলেই প্রমাণিত হয়। ভিক্খুনী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ভিক্খুনী সঙ্ঘেরও উদ্ভব হ'ল এবং সঙ্ঘমধ্যে নানা দুর্নীতি ও অনাচার দেখা দিল[১৯]।

বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্ত কীভাবে বুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করেন ও সঙ্ঘমধ্যে প্রথম ভেদ আনেন তার বিবরণও এই অংশে আছে।

বুদ্ধের জীবনী ও সঙ্ঘ সম্পর্কিত বহু মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ চুল্লবগ্‌গের সাহায্যে দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা রচনা করতে পারি।

বিভিন্ন প্রক্ষিপ্ত ছোট ছোট অংশ নিয়ে গ্রন্থটি গঠিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন এবং সেইজন্যই হয়ত গ্রন্থটির নাম চুল্ল (চূর্ণ) বগ্‌গ হয়েছে।

পরিবার

(iii) বিনয়পিটকের তৃতীয় ও শেষ বিভাগ হ'ল পরিবার বা পরিবারপাঠ। খন্ধক এবং সুত্তবিভঙ্গের অনেক পরে সিংহল দেশের কোন ভিক্ষু এটি রচনা করেন বলে মনে হয়। এই গ্রন্থে সঙ্ঘের সৃষ্টি কিংবা ক্রমবিকাশ অথবা বিনয়ের নিয়ম ও আচারবিধি সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে, প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে এই গ্রন্থে বিনয়ের দুরূহ বিষয়গুলির সুন্দর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রন্থটিকে বিনয়পিটকের অন্যান্য অংশের একটি *digest* অথবা বিনয়ের অন্তর্গত উপদেশসমূহের একটি *manual* বলা যায়। একুশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত পরিবারপাঠকে বেদ ও বেদাঙ্গের অনুক্রমণী ও পরিশিষ্টের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এর প্রথম অধ্যায়ে বিনয়ধর আচার্যদের একটি তালিকা আছে। ভারতবর্ষ এবং সিংহলের বৌদ্ধ সঙ্ঘের ইতিহাসের পক্ষে তালিকাটি বিশেষ মূল্যবান্।

১। Winternitz, HIL, II. p. 33

২। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের 'শরণ' নিয়ে বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করতে হয়। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ 'ত্রিরত্ন' নামে বৌদ্ধসাহিত্যে প্রসিদ্ধ এবং এই 'শরণ' বা আশ্রয় 'ত্রিশরণ' নামে পরিচিত।

৩। Vinaya Piṭaka, I. 25, 6

৪। DN. III. 77, 267 : cf. Dhp. 185,-375…পাতিমোক্‌খে চ সংবরো'

৫। সংস্কৃত 'উপবসথ' থেকে পালিতে উপোসথ ও পোসথ এই দুই শব্দই হয়। বৌদ্ধসঙ্ঘের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হ'ল উপোসথ। প্রতিমাসে দু'বার, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সঙ্ঘের এই অনুষ্ঠানে পাতিমোক্‌খ আবৃত্তি করা হয়। চুল্লবগ্‌গে উপোসথ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। দ্রষ্টব্য : Hardy, A Manual of Buddhism, pp. 216 ff ; বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ভিক্‌খু-পাতিমোক্‌খ, পৃ: ৬৩-৭০

৬। দ্রষ্টব্য, Winternitz, HIL, II, p. 23, f. n. 5.

৭। দ্রষ্টব্য, Pachow-A Comparative study of the Prātimokṣa, p. 3

৮। Mahāvagga II, 3, 4

৯। Childers, Dictionary of the Pali Language, p, 363

১০। Visuddhimagga, I, 43

১১। দ্রষ্টব্য, Pachow, ঐ ; Finot, JA 1913, Le Prātimokṣa des Sarvāstivādins

১২। বিধুশেখর শাস্ত্রী,-ঐ, পৃঃ ১৩-১৮ ; Winternitz, ঐ, p. 26

১৩। Kern, Manual of Buddhism, p. 85 ; বিধুশেখর শাস্ত্রী, ঐ, পৃঃ ৭৪, পাদটীকা ১

১৪। পদ্ধতি সাতটি হ'ল—(i) সম্মুখ বিনয় অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর সামনেই বিরোধ নিষ্পত্তি ; (ii) সতিবিনয় (স্মৃতি) অর্থাৎ যে অভিযুক্ত ভিক্ষু বলেন যে তাঁর সম্পূর্ণ স্মরণে আছে যে তিনি নির্দোষ, —সেই ভিক্ষুর বিচার ; (iii) অমূল্‌হ (অমূঢ়) বিনয় বা যে ভিক্ষু পূর্বে উন্মত্ত হয়েছিলেন কিন্তু এখন উন্মত্ত নন, তার বিচার ; (iv) পটিঞ্‌ঞার (প্রতিজ্ঞাকারক) বিনয় বা যে ভিক্ষু তার অপরাধ স্বীকার করেন, তার বিচার ; (v) যেভুয্যসিকা (যদ্ভূয়-সিকীয়) বিনয় বা সঙ্ঘে উপস্থিত ভিক্ষুদের অধিকাংশের মতে বিচার ; (vi) তস্‌সপাপিয়্যসিকা (তস্যপাপীয়সিকা) বিনয় বা দুরাচারী ভিক্ষুর বিচার ; (vii) তিণবত্থারক (তৃণপ্রস্তারক) বিনয়

বা পুরাতন কলহবিবাদকে চাপা দিয়ে প্রশমিত করা। দ্রষ্টব্য, N. Dutt, EMB, I, pp. 308-10

১৫। পূর্বে দ্রষ্টব্য

১৬। বর্ষাকালে তিনমাস ভিক্ষুরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বাস করার অনুমতি পান ; দ্রষ্টব্য, N. Dutt, ঐ, পৃঃ 292

১৭। বর্ষাবাসের অবসানে এই অনুষ্ঠান হয়। বর্ষাবাসের সময় অনুষ্ঠিত সকল অপরাধ ভিক্ষুরা এই অনুষ্ঠানে স্বীকার করে পরিশুদ্ধ হ'ন। দ্র:, N. Dutt, ঐ, পৃঃ ২৯

১৮। American Lectures, pp. 57-58

১৯। বিধুশেখর শাস্ত্রী ঐ, পৃঃ ৫৯-৬২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুত্তপিটক

সুত্তপিটকের বিষয়বস্তু

বৌদ্ধসঙ্ঘের ইতিহাস এবং বুদ্ধ প্রবর্তিত শীলবিষয়ক শিক্ষার জন্য যেমন বিনয়পিটকের প্রয়োজন তেমনই বুদ্ধপ্রবর্তিত 'ধম্ম' ও বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্রগুলি জানতে হ'লে সুত্ত (সূত্র) পিটক অবশ্য পাঠ্য। এই পিটকে বৌদ্ধমতানুসারে লৌকিক ব্যবহার ও শিক্ষা এবং দৃষ্টিখণ্ডনের কথা আছে। সুত্তপিটকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'লে সমাধিসম্পন্ন ও স্থিরচিত্ত হওয়া যায়। বুদ্ধঘোষের মতে সুত্তপিটকে 'ব্যবহার' (বোহার) দেশনা করা হয়েছে ১। বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র, ধ্যান-ধারণা-ভাবনা, দর্শন, ধর্মের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে যথাযোগ্য আলোচনা ছাড়াও সুত্তপিটকে সমকালীন উত্তর ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার একটি প্রামাণ্য ছবি পাওয়া যায়। প্রাক্-বুদ্ধ যুগে ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারা এবং ঐ সময়কার পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য এই পিটকে পাওয়া যায়। সুত্তপিটকে লোকপ্রচলিত উপদেশের আধিক্য দেখা যায় এবং এর অঙ্গীভূত কতকগুলি গ্রন্থকে সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান বলে বিবেচনা করা হয়।

সুত্তপিটক পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত

সুত্তপিটক পাঁচটি নিকায় বা সংকলনে বিভক্ত, যথা, দীঘ (দীর্ঘ) নিকায়, মজ্ঝিম (মধ্যম) নিকায়, সংযুত্ত (সংযুক্ত) নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, এবং খুদ্দক (ক্ষুদ্রক) নিকায়। প্রথম চারটি নিকায় 'সুত্ত' বা বুদ্ধের উপদেশাবলীর সংকলন। সুত্তগুলি গাথা (শ্লোক)

মিশ্রিত গদ্যে বুদ্ধবচন বা বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর কোন শিষ্য বা অন্য কারও কথোপকথন। সাধারণভাবে সুত্তগুলি একই প্রকৃতির এবং একই সুত্ত দুই বা ততোধিক নিকায়েও পাওয়া যায়। তত্ত্বের দিকে থেকেও এই চারটি নিকায়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই। পঞ্চম নিকায়ের প্রকৃতি একটু ভিন্ন ধরণের—এটি কতকগুলি গ্রন্থের সংকলন। গ্রন্থের আকারের দিক থেকে দীঘ হ'ল ক্ষুদ্রতম এবং খুদ্দক হ'ল বৃহত্তম।

প্রসিদ্ধ পালি-টীকাকার বুদ্ধঘোষ মনে করেন সমগ্র ত্রিপিটকই পাঁচ নিকায়ে বিভক্ত এবং বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক পঞ্চম নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত[২]।

'নিকায়' শব্দের অর্থ

'নিকায়' শব্দটির পালি এবং সংস্কৃতে নানা অর্থ আছে[৩]। সংগ্রহ বা সংকলন, শ্রেণী, রাশি, সমষ্টি প্রভৃতি অর্থে এর প্রয়োগ আছে। পালি সাহিত্যে 'নিকায়' শব্দটি প্রধানতঃ সুত্তপিটকের 'সুত্ত সংগ্রহগুলিকেই বোঝায়। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে 'নিকায়' শব্দের পরিবর্তে 'আগম' শব্দের ব্যবহার আছে[৪], যেমন—দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম ইত্যাদি। বুদ্ধঘোষ 'নিকায়' শব্দটিকে 'নিবাস' অর্থের দ্যোতক বলে মনে করেন[৫]। তাঁর মতে দীর্ঘাকারের সূত্রগুলির 'নিবাস' হ'ল দীঘ নিকায়, মধ্য আকারের নিবাস মজ্‌ঝিম নিকায় ইত্যাদি।

দীঘ নিকায়

দীঘ নিকায় সুত্তপিটকের প্রথম অঙ্গ। দীর্ঘ প্রমাণের ৩৪টি সুত্ত (সূত্র) বা সুত্তন্ত এর অন্তর্গত। পালিতে সুত্ত এবং সুত্তন্ত (সুত্তমেব সুত্তন্তো) একই অর্থবোধক। এই গ্রন্থের প্রতিটি সুত্তে বৌদ্ধতত্ত্বের এক বা ততোধিক প্রশ্ন নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা হয়েছে। সুত্তগুলিকে এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলেও বিবেচনা করা যায়। সীলক্‌খন্ধ (শীলস্কন্ধ) বগ্‌গ, মহাবগ্‌গ, এবং পাটিকবগ্‌গ এই তিন বর্গে দীঘ নিকায়ের সুত্তগুলিকে ভাগ করা হয়েছে। প্রকৃতি এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে বর্গগুলি বিভিন্ন ধরণের এবং প্রত্যেকটি বর্গেই

প্রাচীন ও পরবর্তীযুগের রচনার নিদর্শন আছে। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা সুত্তগুলির আলোচ্য বিষয় এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তের কিছু অংশও আলোচিত হয়েছে। যে সব সুত্তের আলোচ্য বিষয় হ'ল 'শীল' সেগুলি প্রথম বর্গের অন্তর্ভুক্ত, যে গুলির আকার একটু বড় এবং নামের প্রারম্ভে 'মহা'-শব্দ আছে সেগুলিকে দ্বিতীয় বর্গে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং তৃতীয় বর্গের শুরুতে 'পাটিক সুত্ত' থাকায় তৃতীয় বর্গের নাম পাটিকবগ্‌গ হয়েছে। প্রথম বর্গের ১৩টি সুত্তে আমরা প্রাচীনতর রচনার নিদর্শন পাই। পরবর্তীযুগের রচনার সাক্ষ্য পাওয়া যায় তৃতীয় বর্গে (১১টি সুত্ত) এবং দ্বিতীয় বর্গের সুত্তগলি (১০টি সুত্ত) বৃহদাকার ধারণ করেছে প্রক্ষিপ্ত অংশের সংযোজনের ফলে।

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাসের পক্ষে দীঘ নিকারের প্রথম সুত্ত ব্রহ্মজাল সুত্ত বিশেষ মূল্যবান্। বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব, বুদ্ধের ধম্ম ও সীল এবং দার্শনিক চিন্তার একটা ছবি আমরা এই সুত্তে পাই। সে যুগে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ৬ ও জনগণের জীবনযাত্রা, উপজীবিকা ও পেশাসমূহের একটা নির্ভরযোগ্য বিবরণ থাকায় সুত্তটি ইতিহাসের উপাদান হিসেবে প্রয়োজনীয়। শীলের আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধ এই সমস্ত মতবাদ, পেশা ইত্যাদির বিবরণ দিয়ে বুদ্ধ-শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন এগুলি সযত্নে পরিহার করতে। এখানে আমরা প্রায় ৬২টি পরিহারযোগ্য দার্শনিক মতবাদের কথা পাই।

ব্রহ্মজালসুত্তের মূল বক্তব্য হ'ল বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের কবল থেকে বুদ্ধশিষ্যদের রক্ষা করে বুদ্ধ প্রবর্তিত মার্গে পরিচালিত করা। দক্ষ মৎস্যশিকারী ধীবর যেমন জানেন কাভাবে জাল ফেলে ছোট-বড় সব রকমের মাছ ধরা যায়, ঠিক তেমনই বুদ্ধ জানেন কীভাবে 'ব্রহ্ম-জাল' অর্থাৎ উত্তম জাল বিস্তার করে সকল প্রকার অসার দার্শনিক মতবাদ 'ধরতে' হয় এবং এই মতবাদগুলিকে কীভাবে মূল্যহীন ও সাধনার পথে বিঘ্নস্বরূপ প্রমাণ করতে হয়। চুল্লবগ্‌গের৭ অন্তর্গত প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির বিবরণে বলা আছে যে উপালি এই সুত্তটি ঐ সঙ্গীতিতে আবৃত্তি করেছিলেন।

বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতবর্ষের জীবন ও চিন্তাধারা আলোচনার পক্ষে দ্বিতীয় সুত্ত সামঞ্ঞফল সুত্ত (শ্রামণ্যফল,—বুদ্ধ নির্দিষ্ট শ্রমণ-জীবন অবলম্বনের ফল) অত্যন্ত মূল্যবান্। তৎকালীন অ-বৌদ্ধসম্প্রদায়গুলির প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষকদের মতবাদ এখানে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মগধরাজ অজাতশত্রু কীভাবে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ও বুদ্ধের অনুরাগী হ'লেন সে কথা এই সুত্তের মুখবন্ধে বলা হয়েছে। অশান্ত মনকে শান্ত ও স্থির করার জন্য তিনি জীবকের[৮] পরামর্শে তখনকার প্রসিদ্ধ ছয়জন তীর্থিক[৯]-শিক্ষকদের কাছে না গিয়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হ'ন। অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হ'য়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি করেন। এই উপলক্ষ্যে ছয়জন তীর্থিক-শিক্ষকের[১০] মতবাদ বিশ্লেষণ করে বৌদ্ধমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সুত্তটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা, বিনয়ের প্রবর্তন এবং সঙ্ঘ পরিচালনার নিয়মবিধি প্রণয়নে বুদ্ধের যুক্তি উপস্থাপিত করেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন[১১]। পেশা ও উপজীবিকাসমূহের যে তালিকা এই সুত্তে আছে তার সাহায্যে সেই সময়ের সমাজজীবনের একটা ধারণা করা যায়। সন্ন্যাস জীবন অবলম্বনের সুফল সম্বন্ধে বুদ্ধ এই সুত্তে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন।

জাতিভেদ সমস্যা সম্বন্ধে বুদ্ধের মত তৃতীয় সুত্ত অম্বট্‌ঠ সুত্ত থেকে জানা যায়। ভারতের জাতিভেদ প্রথার ইতিহাস ও সেই সম্বন্ধে বুদ্ধের বক্তব্য আলোচনার পক্ষে সুত্তটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। শাক্যজাতি ও ঋষি কৃষ্ণ'র (কণ্‌হ) উল্লেখ থাকায় কেউ কেউ সুত্তটির মধ্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক মূল্য দেখতে পান[১২]। বেদবিদ্যায় পারঙ্গম ব্রাহ্মণ যুবক অম্বট্‌ঠের সঙ্গে বুদ্ধের জাতি ও বর্ণের উৎপত্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা এই সুত্তে লিপিবদ্ধ।

কী কী গুণ থাকলে ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হওয়া যায় সোনদণ্ড সুত্ত নামক চতুর্থ সুত্তে বুদ্ধ তা' ব্যক্ত করেছেন। অন্যান্য কয়েকটি সুত্তে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও জাতিবাদ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। দীঘ নিকায়ের সুত্তগুলির মধ্যে মহাপরিনিব্বান সুত্ত (১৬ নং) নানা কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুত্তটিকে এই নিকায়ের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সুত্ত

বলা যেতে পারে। বিষয়বস্তু এবং গঠনের দিক থেকে সুত্তটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। বুদ্ধের কোন বক্তৃতা অথবা তত্ত্বমূলক সমস্যা নিয়ে আলোচনা এতে সংগৃহীত হয়নি। যে ঘটনা বৌদ্ধধর্মকে সব থেকে বেশী প্রভাবিত করেছে মরজগৎ থেকে বুদ্ধের বিদায় নেওয়ার (মহাপরিনির্বাণ) সেই ঘটনা এই সুত্তে বর্ণিত হয়েছে। বুদ্ধের জীবনের শেষ কয়েক বৎসরের বিবরণ, তাঁর শেষ উপদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি ধারাবাহিকভাবে এখানে উল্লিখিত আছে। বুদ্ধের জীবনী, বুদ্ধ-পরবর্তী কালে সঙ্ঘের পরিচালন ব্যবস্থা, সে যুগের ভারতবর্ষে বুদ্ধ এবং তাঁর উপদেশের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় আলোচনার পক্ষে সুত্তটি অপরিহার্য। ছয় অধ্যায়ের এই দীর্ঘ সুত্তটিতে কিছু প্রাচীন অংশ এবং কিছু পরবর্তীকালের সংযোজন আছে। ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যে বুদ্ধের জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ করে বৌদ্ধ স্থবিরগণ সুত্তটিকে এত দীর্ঘ করে ফেলেছেন। সুত্তটির প্রাচীনতর অংশে বুদ্ধকে পার্থিব মানুষ হিসেবে চিত্রিত দেখি আর অন্য অংশে একজন আধা-দেবতা হিসেবে তাঁকে নানা রকম অলৌকিক ঘটনার অনুষ্ঠান করতে দেখি।

বুদ্ধের দেহাবসানের পর তাঁর দেহাবশেষ যে যে জাতির মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল তার উল্লেখ এই সুত্তে আছে এবং তাঁর দেহাবশেষের উপর চৈত্য নির্মাণের সুফলও বর্ণিত হয়েছে। আসন্ন বিয়োগের চিন্তায় আনন্দ যখন শোকে অধীর তখন বুদ্ধ আনন্দকে সান্ত্বনা দিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন[১৩] যে তাঁর অবর্তমানে সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাহীন হওয়া কর্তব্য নয়[১৪]; ভিক্ষুরা নিজেদের 'নায়ক' ও 'জ্ঞানপ্রদীপ' হ'বেন, সঙ্ঘকে তিনি কখনও তাঁর উপর নির্ভরশীল করে গড়ে তোলেননি। আনন্দকে সান্ত্বনাদানের বিবরণ ও সুত্তের অন্তর্ভুক্ত গাথাগুলি বেশ প্রাচীন অংশ বলেই মনে হয়। সুত্তটি বৌদ্ধসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সম্মানের আধার ছিল এবং স্থবিরগণ কোন নতুন গ্রন্থের প্রচলন করতে হ'লে গ্রন্থটিকে সম্ভবতঃ এই সুত্তের অন্তর্ভুক্ত করতেন যাতে সকলেই ঐ গ্রন্থটিকে মান্য করেন। এইরকম উপায়েই হয়ত বুদ্ধ, ধম্ম এবং সঙ্ঘের উপর শ্রদ্ধা বা আস্থা স্থাপন করেছে যে "ধম্মাদস" (ধর্মাদর্শ, ধর্মের আদর্শ বা

দর্পণ) শীর্ষক অংশ তা' এই সুত্তের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। মল্লদের নগরী কুশীনারাতে একজোড়া শালগাছের মধ্যে বুদ্ধ শেষ শয্যায় শায়িত হ'ন। কুশীনারাতে আসার আগে তিনি কোন্ কোন্ দেশ ও পথ অতিক্রম করেন তার সুন্দর বিবরণ আমরা এখানে পাই। বৈশালীতে অম্বপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ তিনি এই সময়েই করেন এবং পাবাতে কর্মকারপুত্র চুন্দের আতিথ্য গ্রহণ করে শূকরমাংস ভক্ষণ করার পরই তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন ও কুশীনারার দিকে যাত্রা করেন। বুদ্ধের জীবনের যে সমস্ত ঘটনা এই সুত্তে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে বুদ্ধ-জীবনীর প্রাচীনতম উপাদান আছে এবং এই উপাদানের মাধ্যমেই বুদ্ধ-জীবনী রচনার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন ১৬।

বুদ্ধের জীবনী রচনার উপাদান হিসেবে মহাপদান সুত্তটির (১৪ নং) মূল্য কম নয়। চারটি নিকায়ের মধ্যে এই সুত্তটিতেই কেবল গৌতমের পিতা শুদ্ধোদনের নাম পাওয়া যায়। বুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের জন্য মহাগোবিন্দ সুত্ত (১৯নং) অত্যন্ত মূল্যবান্। ভারতবর্ষের আকার সম্বন্ধে সে যুগের বৌদ্ধদের ধারণা এই সুত্তে পাওয়া যায়। উত্তরে 'আয়ত' এবং দক্ষিণে 'শকটমুখ' বলে তাঁরা ভারতবর্ষকে বর্ণনা করেছেন! মহাসতিপট্ঠান সুত্তে (২২নং) বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের মূলতত্ত্ব চতুরার্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের আলোচনা আছে। এই সুত্তে চার প্রকারের 'সতি'র (স্মৃতি-একাগ্রচিত্ততা, *mindfulness*) বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে উচ্চতর মার্গ এই 'সতি'র চর্যা দ্বারাই পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের আলোচনায় সুত্তটির মূল্য অপরিসীম। দীঘ নিকায়ের অন্যান্য সুত্তের মধ্যে সিঙ্গালোবাদ সুত্ত (৩১নং) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সুত্তটিকে গার্হস্থ্যজীবনের 'বিনয়' বা 'গিহি-বিনয়' (গৃহী বিনয়) বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে একজন সৎ গৃহীর যা' কিছু কর্তব্য তার সব কিছুই এতে নির্দেশ করা হয়েছে বলে একে গৃহী-বিনয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুত্তটিকে অশোকের 'ধম্মে'র ভিত্তি বলে অনেকে মনে করেন১৭। অন্যান্য সুত্তগুলির মধ্যে পাটিক সুত্ত, আটানাটিয় সুত্ত, লকখণ সুত্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনা ও সমস্যা দীঘ নিকায়ের সুত্তগুলিতে স্থান পেয়েছে। কোন ক্রম, ধারা বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতির অনুসরণ করে সুত্তগুলি রচিত বা সংকলিত হয়েছে বলে মনে হয় না। এই কারণে নিকায়টিকে একটি বিশেষ সময়ের বা বিশেষ একজন গ্রন্থকর্তার রচনা বলা যায় না।

মজ্‌ঝিম নিকায়

সুত্তপিটকের দ্বিতীয় অংশ **মজ্‌ঝিম নিকায়ে** (মধ্যম) ১৫২ টি 'মধ্যম' আকারের সুত্ত সংকলিত আছে। সাধারণভাবে বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে সুত্তগুলিকে ১৫ টি বগ্‌গে (বর্গে) ভাগ করা হয়েছে। বর্গের প্রথম সুত্তের নামানুসারে কয়েকটি বর্গের নামকরণ করা হয়েছে, যেমন, মূল পরিয়ায়বগ্‌গ, সীহনাদবগ্‌গ ইত্যাদি। পঞ্চাশটি (পণ্‌ণাস) করে সুত্ত নিয়ে সমগ্র নিকায়টি আবার তিন খণ্ডে বিভক্ত, মূল পণ্‌ণাসা, মজ্‌ঝিম পণ্‌ণাসা ও উপরিপণ্‌ণাসা। তৃতীয় খণ্ডে মোট ৫২ টি সুত্ত ধরা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রায় সকল সমস্যা নিয়েই এই নিকায়ে আলোচনা আছে এবং সাধারণভাবে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাবিষয়ক শিক্ষাই এর উপজীব্য হলেও দীঘ নিকায় অপেক্ষা বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এখানে বেশী। সঙ্ঘের ভিতরে এবং বাহিরে ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা, গৃহীদের সঙ্গে ভিক্ষুদের সম্পর্ক, ব্রাহ্মণ্য যজ্ঞ, সংগঠন এবং জীবনযাত্রা, নানা প্রকার সন্ন্যাস ধর্ম, বুদ্ধের সঙ্গে তৎকালীন রাজন্যবর্গের সম্পর্ক, বৌদ্ধ এবং জৈনদের সম্পর্ক এবং সর্বোপরি বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোকপাত করেছে এই সুত্তগুলি। এ নিকায়ে চতুরার্যসত্য, কর্মবাদ, অনাত্মবাদ, বিভিন্নপ্রকার ধ্যান-সমাধি প্রভৃতির সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে।

মজ্‌ঝিম নিকায়ের আলোচ্য বিষয়গুলি কখনও কখনও সুন্দর কথা, আখ্যান, উপকথা ও গাথার মাধ্যমে ও নানা উপমার সাহায্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে। 'ইতিহাস-সম্বাদ' ও *ballad poetry*-র নিদর্শন এখানে বর্তমান। ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি বার বার আলোচনা করতে গিয়ে বক্তব্য যখন নীরস হয়ে যাচ্ছে তখন উপমা প্রভৃতির সাহায্যে আলোচনাকে সরস

করা হয়েছে। ইন্দ্রের স্বর্গ পরিদর্শন কালে বুদ্ধ-শিষ্য মোগ্গল্লানের পায়ের চাপে স্বর্গ কাঁপানোর বর্ণনা (৩৭নং সুত্ত) আমাদের মহাভারত-পুরাণের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। দুর্ধর্ষ দস্যু অঙ্গুলিমালের দীক্ষাগ্রহণ ও অর্হত্ব প্রাপ্তির বর্ণনা (৮৬নং সুত্ত) প্রাচীন 'আখ্যানে'র নিদর্শন। গদ্যে ও পদ্যে এই ঘটনার সুন্দর বর্ণনার মধ্যে আমরা প্রাচীন বৌদ্ধ কবিতার উদাহরণ পাই। ৮২নং সুত্তে রট্ঠপালের (রাষ্ট্রপাল) কাহিনী প্রাচান *ballad* এর রীতিতে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই নিকায়ের প্রথম সুত্ত মূলপরিয়ায় সুত্ত-তে বৌদ্ধ দর্শনের সার-মর্ম বলা হয়েছে (সব্বধম্ম মূলপরিয়ায়)। সমকালীন দার্শনিক মতবাদগুলিকে বিশ্লেষণ করে বুদ্ধ তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে ঐগুলির পার্থক্য দেখিয়েছেন। নির্বাণ সম্বন্ধেও এই সুত্তে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের জীবনের 'আসব' (অপবিত্রতা) কীভাবে দূর করা যায় তার উপায় দ্বিতীয় সুত্ত সব্বাসব সুত্তে দেখানো হয়েছে।

সত্য, শান্তভাব ও মধ্যম পথের আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় সুত্ত ধম্মদায়াদ সুত্তে। এই সুত্তের দ্বিতীয় অংশে আমরা সারিপুত্তকে নানা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে দেখি।

'বস্ত্রে'র উপমার সাহায্যে বুদ্ধ বত্থূপম সুত্তে (৪নং) তাঁর শিষ্যদের সকল প্রকার অপবিত্রতা দূর করতে ও মানসিক পবিত্রতা অর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

এই নিকায়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুত্ত অরিয়পরিয়েসনা সুত্তে (আর্য-পর্যেষণা-২৬ নং) বুদ্ধের সাধক জীবনের কিছু বৃত্তান্ত উল্লিখিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মূল বক্তব্যগুলির আলোচনার দিক থেকে সুত্তটি বিশেষ মূল্যবান্। এই সুত্তে বর্ণিত কাহিনীকে জাতক এবং অবদানের মত পরবর্তী যুগের উপাখ্যান-কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি বলে অনেকে মনে করবেন[১৭]।

মহাসারোপমা সুত্তে দেবদত্তের দ্বারা সংঘটিত সঙ্ঘভেদের বর্ণনা আছে। অচ্ছরিয়ব্ভুত সুত্তে বুদ্ধের জীবনের বহু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। জাতি-সমস্যা নিয়ে বিশেষ সারগর্ভ আলোচনা আছে মধুর সুত্ত, অস্সলায়ন

সুত্ত, চঙ্কী সুত্ত, এসুকারি সুত্ত প্রভৃতিতে। চুল্লসচ্চক-, মহাসচ্চক-, উপালি-, অভয়রাজকুমার-, দেবদহ-, সামগাম- প্রভৃতি সুত্তে জৈন আচার্য ও তাঁদের মতামত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দীঘ নিকায়ের মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তের বক্তব্য এই নিকায়ে সতিপট্‌ঠান- বা সম্মাদিট্‌ঠি- এবং সচ্চবিভঙ্গ- এই দুইটি সুত্তে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রথম সুত্তটিতে কেবল 'সতি'র চর্যা ও দ্বিতীয়টিতে 'আর্যসত্য' ও 'মার্গ' সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। কয়েকটি সুত্তে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের শাস্তির উল্লেখ আছে।

দীঘ নিকায়ের মত এই সুত্তগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মূল্য ও প্রকৃতির বিচারে সুত্তগুলির মধ্যে কোন ঐক্য নেই। এই নিকায়ের অধিকাংশ স্থানে পর-মতখণ্ডনের (পরবাদমথন) প্রবণতা দেখা যায়।

সংযুত্ত নিকায়

তৃতীয় অংশ সংযুত্ত (সংযুক্ত) নিকায় বৌদ্ধ শিক্ষার আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং দার্শনিক আলোচনায় পূর্ণ। গুচ্ছ, 'সংযুক্ত' বা সংগ্রহ আকারে এই নিকায়ের সুত্তগুলি গ্রথিত হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত ২৮৮৯টি সুত্ত ৫৬টি 'সংযুক্তে' বিভক্ত এবং সংযুক্তগুলি আবার পাঁচটি 'বর্গে' বিভক্ত। এক একটি বর্গের মধ্যে বেশ কয়েকটি 'সংগ্রহ' বা 'সংযুক্ত'কে স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন, প্রথম বর্গ সগাথ-বগ্‌গে ১১টি সংযুত্ত, দ্বিতীয় নিদানবগ্‌গে ১০টি, তৃতীয় খন্ধকবগ্‌গে ১৩টি, চতুর্থ সলায়তনবগ্‌গে ১০টি এবং পঞ্চম মহাবগ্‌গে ১২টি সংযুত্ত আছে। প্রত্যেকটি সংযুক্ত গঠিত হয়েছে কয়েকটি সুত্ত নিয়ে। সুত্তগুলিকে সংযুক্ত বা গুচ্ছাকারে সংগ্রহ করতে মনে হয় তিনটি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে,—(১) কোন একটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে সমস্ত সুত্তে; (২) একই শ্রেণীর দেবতা, দৈত্য অথবা মানুষ নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে সমস্ত সুত্তে, অথবা (৩) যে সমস্ত সুত্তে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি নায়ক অথবা উপদেষ্টা রূপে উল্লিখিত হয়েছেন, সেগুলিকে এক একটি 'সংযুক্তে' শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সংযুক্তগুলির নামকরণও হয়েছে এই নীতি অনুসরণ করে। দেবতা সংযুত্ত নাম দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত সুত্তের

সংগ্রহকে যাতে দেবতাদের উক্তি লিপিবদ্ধ আছে। ২৫টি সুত্তে নিয়ে গঠিত মারসংযুত্তে মার-সংক্রান্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ১৩১০টি সুত্তের সংগ্রহে রচিত সচ্চসংযুত্ত চতুরার্যসত্য নিয়ে আলোচনা করেছে এবং এই সংগ্রহের মধ্যে আছে ধম্মচক্কপ্পবত্তন (ধর্মচক্রপ্রবর্তন) সুত্ত বা বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশের ঘটনার বিবরণ। সুত্তগুলি দীঘ বা মজ্ঝিম নিকায়ের সুত্তগুলির চেয়ে অনেক ছোট আকারের। সংখ্যায় সুত্তগুলি এত বেশী হওয়ার কারণ বোধহয়[১৮] এই যে একটি সমস্যাকে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে তার সকল দিক থেকে এবং নানা প্রকারে ও ভাষায় বিশ্লেষণ করে বার বার বলা হয়েছে।

এই নিকায়ের প্রথম বর্গে আমরা কয়েকটি সুত্ত পাই সম্পূর্ণ গাথায় এবং অন্যান্য স্থানেও বক্তব্য বিষয় গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত করে বলা হয়েছে। সাহিত্যিক বিচারে ও ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে গাথাগুলি খুবই মূল্যবান্। প্রশ্ন ও সিদ্ধান্তমূলক উক্তির (aphorism) সাহায্যে বৌদ্ধতত্ত্বের নানা দিক এই সমস্ত গাথায় আলোচিত হয়েছে। মার-সংযুত্ত ও ভিক্খুনী-সংযুত্তর গাথাগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাকাব্যের সূচনার মূলে যে আখ্যান-কাব্যের প্রভাব আছে এই নিকায়ের অন্তর্গত কিছু কাহিনী সেই আখ্যান-কাব্যগুলির সঙ্গে তুলনীয়[১৯]। কিসা গোতমীর সুত্ত বা মার ও ভিক্খুনীদের কাহিনীগুলি এই শ্রেণীর আখ্যান-কাব্যের নিদর্শন। ভাষা বিশ্লেষণ করলে এই কাহিনীগুলিকে ত্রিপিটকের প্রাচীন অংশের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়[২০]।

ভাষা, সাহিত্য, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কোসল-, মার-, ভিক্খুনী-, যক্খ-, নিদান-, খন্ধ-, ঝান-, প্রভৃতি 'সংযুত্ত'গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এই নিকায়ের অধ্যায়গুলিকেই 'সংযুত্ত' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অঙ্গুত্তর নিকায়

সুত্তপিটকের চতুর্থ অংশের নাম অঙ্গুত্তর নিকায়। কখনও কখনও 'একুত্তর নিকায়' নামেও একে অভিহিত করা হয়েছে। নিকায়টিতে মোট

২৩০৮টি (অথবা ২৩৬৩ ?) সুত্ত[২১] আছে। সুত্তগুলি প্রথমতঃ ১১টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদে আবার কতকগুলি বর্গ আছে। পরিচ্ছেদগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'নিপাত' এবং প্রতিটি নিপাতে সুত্তগুলিকে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করা আছে যাতে একই নিপাতের অন্তর্ভুক্ত সুত্তগুলির আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যার সমতা থাকে। এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যাক্রমে বিষয়বস্তুগুলিকে এক একটি নিপাতের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বা এক-নিপাতে এমন বিষয়ের আলোচনা রয়েছে যাদের সংখ্যা 'এক'; এই নিপাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, নির্বাণপ্রাপ্তির উপায় হিসেবে ধ্যান-ধারণা, উপাসক ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এইরূপ দুক-নিপাতের আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলির সংখ্যা 'দুই'। এই নিপাতে দু'রকম বুদ্ধ, বনবাসের দুটি কারণ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। অন্য নিপাতগুলিও এই পদ্ধতিতে.গঠিত।

দীঘ ও মজ্ঝিম নিকায়ের বৃহদাকার সুত্তগুলিতে বৌদ্ধধর্মের যে সমস্ত তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলিই সংযুত্ত নিকায়ের মত এই নিকায়েও ক্ষুদ্রাকারের সুত্তের সাহায্যে সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, সঙ্ঘ, বিনয় ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের ও দর্শনের বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা ছাড়াও এই নিকায়ে এমন কিছু বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যার সঙ্গে বুদ্ধের উপদেশের কোন সম্পর্ক নেই। এই বিষয়গুলি মনে হয় এই নিকায়ে অনুসৃত সংখ্যাগত পদ্ধতি বজায় রাখার জন্যই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের সংকলন এমন এক সময় হয়েছিল বলে মনে হয় যখন বুদ্ধ তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে একজন সর্বজ্ঞ, সকল সত্যের উৎস এবং দেবতা না হলেও আধা-দেবতা হিসেবে পরিগণিত হ'তেন। অশোক তাঁর অনুশাসনে বলেছেন[২২] বুদ্ধের সমস্ত উক্তিই সু-উক্তি, দিব্যাবদানে বলা হয়েছে পৃথিবীতে বহু অঘটন ঘটলেও ঘটতে পারে তবু বুদ্ধ কখনও এমন উক্তি করেন না যা' মিথ্যা। কিন্তু এই নিকায়ে বৌদ্ধদের আমরা আরও অগ্রসর হয়ে বলতে দেখি যে, বুদ্ধ ছাড়া আর কেউ শ্রেষ্ঠ সত্য বা ধর্ম উপদেশ করতে পারেন না[২৩]।

অঙ্গুত্তর নিকায়ে থের মহাকচ্চানকে (কাত্যায়ন) বিশেষ প্রতিভাধর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধের যে কোন সংক্ষিপ্ত উক্তিকে তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারতেন। অপরাধের জন্য অমানুষিক শাস্তিদানের ও ঐ সম্পর্কিত বিচার ব্যবস্থার যে উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে তা' থেকে সে যুগে প্রচলিত 'দণ্ডবিধি' সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করতে পারি। অশোকের 'ধম্ম' এই নিকায়ের অন্তর্গত তত্ত্ব ও উপদেশাবলীর ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়[১৪]। অভিধম্মপিটকের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি এই নিকায়ের নির্বাচিত অংশ বা উদ্ধৃতি নিয়ে রচিত।

চারটি নিকায়ের মধ্যে সম্বন্ধ

দীঘ, মজ্‌ঝিম, সংযুত্ত ও অঙ্গুত্তর এই চারটি নিকায়ের প্রকৃতি থেকে পঞ্চম নিকায়ের প্রকৃতি ভিন্ন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে[১৫]। চারটি নিকায়-ই সুত্তাকারে রচিত হওয়া ছাড়া এদের বক্তব্য বিষয় ও অন্যান্য দিক থেকেও এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

একই সুত্তকে আমরা দুই বা ততোধিক নিকায়ে অন্তর্ভুক্ত দেখি; কোন্ নিকায়ে সুত্তটি প্রথম উপস্থাপিত করা হয়েছিল তা এখন নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। সংযুত্ত নিকায়ের মাতুগাম সংযুত্তে[১৬] স্ত্রীলোকের নরকপ্রাপ্তির কারণ স্বরূপ যে তিনটি দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অঙ্গুত্তর নিকায়ের তিক-নিপাতে ঠিক সেই সুত্তই সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং উভয় গ্রন্থেই সুত্তটি সুপ্রযুক্ত। দীঘ নিকায়ের কোন কোন সুত্ত পড়লে সেগুলি ক্ষুদ্রতর সুত্তের পরিবর্ধন করে রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। এইরূপেই হয়ত মজ্‌ঝিম নিকায়ের সতিপট্‌ঠান সুত্ত দীঘ নিকায়ে মহাসতিপট্‌ঠান সুত্ত রূপে স্থান পেয়েছে। সংযুত্ত ও অঙ্গুত্তর নিকায়ে সুত্তাধিক্যের কারণ নানাভাবে একই তত্ত্ব ও সুত্তের পুনরাবৃত্তি। এই একই কথা দীঘ ও মজ্‌ঝিম নিকায় সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। একই সুত্ত বা তত্ত্বকে বার বার নিকায়গুলিতে বলার উদ্দেশ্য বোধ হয় ভিক্ষুদের ধর্মচর্যায় সাহায্য করা। বার বার একই কথা বলার ফল স্বরূপ ভিক্ষুদের স্মৃতিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উপদেশগুলি উজ্জ্বল থাকত। এই

বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতেই বোধহয় তত্ত্বগুলিকে বিভিন্ন সুত্তের মধ্যে প্রয়োগ করে দীর্ঘাকারে, মধ্যমাকারে, গুচ্ছ বা শ্রেণীবিভাগ করে এবং সংখ্যার দিক থেকে সমতা রেখে বার বার বলা হয়েছে। এই কারণেই নিকায় চারটির মধ্যে তত্ত্বগত বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। চতুরার্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ, ইত্যাদি থেকে শুরু করে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার বিশ্লেষণ এবং নির্বাণ-প্রাপ্তির পথনির্দেশ প্রভৃতি চারটি নিকায়েরই ভিত্তি প্রস্তুত করেছে।

পুনরাবৃত্তি-ক্লিষ্ট দীর্ঘাকারের সুত্ত ছাড়া চারটি নিকায়ের মধ্যেই কিছু কিছু উপাখ্যান বা ব্যাখ্যান আছে যেগুলি পুনরাবৃত্তি-দোষে দুষ্ট নয়। সুন্দর এবং সংহত ভাবে উপস্থাপিত এই উপদেশগুলি পালি ত্রিপিটকের প্রাচীন অংশের নিদর্শন বলেই মনে হয়।[১৭]

রচনাশৈলী ও ভাষার দিক থেকেও নিকায়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নেই। রচনা কালের দিক থেকে অঙ্গুত্তর নিকায় কিছুটা পরবর্তী সময়ের হলেও অন্য নিকায় তিনটির সঙ্গে সময়ের পার্থক্য খুব বেশী নয়। কেউ কেউ দীঘ নিকায়কে বুদ্ধের উপদেশের প্রাচীনতম উপাদানের নিদর্শন বলে মনে করলেও[১৮] এই কথাটিই বোধ হয় ঠিক যে বৌদ্ধ সাহিত্যের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে এমন কয়েকটি বিক্ষিপ্ত সুত্তকেই মাত্র বুদ্ধের শিক্ষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যায়,[১৯] কোন বিশেষ সংগ্রহকে বা নিকায়-কে নয়। চারটি নিকায়ের মধ্যেই প্রাচীন ও পরবর্তীকালের উপাদান বর্ত্তমান। সাহিত্যিক উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখলেও মনে হয় চারটি নিকায় মূলতঃ একই উপাদানকে ভিত্তি করে রচিত।

উপমা ও রূপকের সাহায্যে বুদ্ধ শ্রোতৃবৃন্দকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতেন এবং তাঁর উপদেশ তাদের মনে দাগ কাটতো। আমরা চারটি নিকায়ে-ই বুদ্ধের এই শিক্ষণ-প্রণালী দেখতে পাই। সুন্দর সুন্দর উপমা ও রূপকের সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রাঞ্জলভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এ দৃশ্য আমারা বার বার দেখি। চারটি নিকায়ের মধ্যেই তাই উপমা ও রূপকের এত আধিক্য।[৩০]

যে দিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন নিকায় চারটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ বিদ্যমান বলে সহজেই বোঝা যায় এবং পঞ্চম নিকায়ের গঠন ও প্রকৃতি যে ভিন্ন ধরণের তা পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে।

খুদ্দক নিকায়

পঞ্চম নিকায়ের নাম খুদ্দক (ক্ষুদ্রক) নিকায়। এই নিকায়টি অন্য চার নিকায়ের মত কতকগুলি সুত্তের সংগ্রহ নয়, কয়েকটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রন্থের সংকলন। গ্রন্থগুলিও 'ক্ষুদ্র' নয়, কতকগুলি বেশ বড়-ই এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকেও গ্রন্থগুলির মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। রচনা কালের দিক থেকেও গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কতকগুলি গ্রন্থকে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রাচীনতম অংশ বলে মনে করা যায়, আবার কতকগুলি বেশ পরবর্তী সময়ের রচনা বলেই মনে হয়। বিষয়বস্তু, গঠন, আকৃতি, রচনাকাল, মূল্য প্রভৃতি দিক থেকে বিচার করলে এই নিকায়টির 'খুদ্দক' (ক্ষুদ্রক) নামের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। 'ক্ষুদ্র' বা ছোট এই আক্ষরিক অর্থে নিকায়টির নাম গ্রহণ না করে, একে বোধ হয় 'বিবিধ সংগ্রহ', 'প্রকীর্ণক সংগ্রহ' ইত্যাদি অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন[৩১]। কারও মতে আবার দীঘ-,মজ্‌ঝিম-, ও খুদ্দক নিকায়ের অর্থ হ'ল যথাক্রমে 'প্রথম', 'মধ্যম' ও 'শেষ' সংকলন[৩২]।

চীনা 'আগমে'র মধ্যে খুদ্দক নিকায়ের কোন উল্লেখ দেখা যায় না তবে এই নিকায়ের অনেকগুলি গ্রন্থ অন্যান্য নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণভাবে সিংহলী সূত্র অনুসারে ১৫টি গ্রন্থকে এই নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হ'লেও ব্রহ্মদেশে মিলিন্দপঞ্‌হ, সুত্তসংগহ, পেটকোপদেস এবং নেত্তিপকরণ এই চারটি গ্রন্থকেও এই নিকায়ের মধ্যে ধরা হয়। শ্যামদেশে সম্পাদিত ও ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ব্যাংকক থেকে প্রকাশিত ত্রিপিটকের খুদ্দক নিকায়ে ৮টি গ্রন্থকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মহাসংগীতিক-রা পটিসম্ভিদামগ্‌গ, নিদ্দেস এবং জাতকের কিছু অংশকে তাদের সংকলন থেকে বাদ দিয়েছেন। নিকায়টিকে কখনও কখনও অভিধম্মপিটকের সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। রাজগৃহের প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির বিবরণে আমরা কেবল চারটি নিকায়ের উল্লেখ পাই। এই সব তথ্য বিশ্লেষণ করলে মনে হয় খুদ্দক নিকায়ের গঠনগত ও শাস্ত্রগত চরিত্র কোন সময়েই স্থির ছিল না[৩৩]।

খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত এমন কতকগুলি গ্রন্থ আছে যেগুলিকে পৃথিবীর সাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ সম্পদের মধ্যে গণনা করা যায়। বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতির দিক থেকে খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান, কোন কোন গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে এবং কিছু গ্রন্থের অধিকাংশ গাথা বা শ্লোকে লেখা। থেরগাথা, থেরীগাথা প্রমুখ গ্রন্থগুলিকে বুদ্ধ-শিষ্যদের দ্বারা রচিত বলেই মনে হয়। সংযুত্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধের শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে[৩৪] তার মধ্যে এক জায়গায় উল্লেখ করা আছে যে ভবিষ্যতে বুদ্ধ-শিষ্যরা তথাগত-কথিত গভীর, অর্থপূর্ণ, আধ্যাত্মিক সুত্তন্তগুলির প্রতি মনোযোগী না হয়ে কবি বুদ্ধ-শিষ্যদের দ্বারা রচিত সুন্দর, অলঙ্কৃত, কাব্যসুষমামণ্ডিত শব্দ ও উক্তির সাহায্যে রচিত 'সুত্তন্ত'গুলির প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ মনে করেন[৩৫] যে এই নিকায়ের কাব্যগ্রন্থগুলি প্রথমে শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃতি পায়নি, কিন্তু পরবর্তীকালে এদের প্রাধান্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রন্থগুলিকে একত্র সংগ্রহ করে একটি নিকায়ের রূপ দেওয়া হয়। নিকায়ের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি গাথায় বিরচিত উপাখ্যান, নীতিকথা, উপকথা ইত্যাদি এবং মনে হয় এই গ্রন্থগুলিই প্রথম সংকলিত করা হয় এবং পরে কতকগুলি অ-কাব্যগ্রন্থ এর অন্তর্ভুক্ত করে নিকায়টিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। গ্রন্থগুলি যে বিভিন্ন সময়ের রচনা এবং একটি সংকলনের মধ্যেই সবগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার কোন উদ্দেশ্য যে প্রথমে ছিল না এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এই কারণেই আমরা সুত্তনিপাতের তিনটি সুত্তকে খুদ্দক পাঠের মধ্যে অবিকল দেখতে পাই এবং জাতকে বর্ণিত কতকগুলি কাহিনীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'চরিয়াপিট'কে বর্ণিত হতে দেখা যায়।[৩৬]

রচনা-কাল ও রচয়িতা, সম্পাদনা ও সংকলনের উদ্দেশ্য ও প্রণালী যাই হোক না কেন এই গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক সম্পদ্ ও বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বগুলিকে সুন্দর ও সহজ ভাবে প্রচার করার ব্যাপারে এগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার না করে উপায় নেই। যে ১৫টি গ্রন্থের সমন্বয়ে নিকায়টি গড়ে উঠেছে, সেগুলি হল, ১। খুদ্দকপাঠ ২। ধম্মপদ ৩। উদান ৪। ইতিবুত্তক ৫। সুত্ত-

নিপাত ৬। বিমানবত্থু ৭। পেতবত্থু ৮। থেরগাথা ৯। থেরীগাথা ১০। জাতক ১১। নিদ্দেস ১২। পটিসম্ভিদামগ্গ ১৩। অপদান ১৪। বুদ্ধবংস ১৫। চরিয়াপিটক।

যে ক্রম এই গ্রন্থগুলিকে উল্লেখ করা হ'ল তা' রচনা-কাল-নিরপেক্ষ। সিংহলী ঐতিহ্যে যে ভাবে গ্রন্থগুলিকে বলা হয়েছে আমরা এখানে সেই ভাবেই গ্রহণ করেছি। কোন কোন সূত্রে 'নিদ্দেস'- কে 'চুল্ল'- এবং 'মহা'- এই দুই অংশে ভাগ করে এই নিকায়ের গ্রন্থগুলির সংখ্যা বলা হয়েছে ষোল।

পরবর্তী অংশে আমরা এই ১৫টি গ্রন্থের আলোচনা করব।

১। খুদ্দক পাঠ

খুদ্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ হিসেবে খুদ্দকপাঠ উল্লিখিত হয়। 'ক্ষুদ্র' (*short*) পাঠ, 'অল্পতর' (*lesser*) পাঠ, 'অপ্রধান' (*minor*) পাঠ ইত্যাদি অর্থে গ্রন্থটির শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে। 'খুদ্দকপাঠ' নয়টি ছোট ছোট গ্রন্থের সংকলন এবং যে কোন শিক্ষানবীশ (*novice*) ভিক্ষুকে অন্য কিছু 'শিক্ষা' করার আগে এই ন'টি অংশ জানতে হয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে এই ন'টি অংশ 'মন্ত্র' বা 'প্রার্থনা' রূপে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রদায়ের যে কোন মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠানে আজও এই অংশগুলি একপ্রকার মন্ত্র বা প্রার্থনা রূপে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সমাজজীবনের আচার-অনুষ্ঠানে মন্ত্রের ব্যবহার এইক্ষেত্রে বৌদ্ধদের প্রভাবিত করেছিল। সংকলনটি শিক্ষানবীশদের 'শিক্ষা'র জন্য অথবা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল তা' নিশ্চিতরূপে বলা সম্ভব নয়[৩৭]। গ্রন্থের অংশ ন'টি যথাক্রমে উদ্ধৃত করা হ'ল,—

(১) 'ত্রিশরণ' গ্রহণ করে বুদ্ধের শিক্ষায় শ্রদ্ধা (faith) ঘোষণা।

(২) দশ প্রকার 'শিক্ষা'। শিক্ষাগুলি হল বিনয়পিটকে উল্লিখিত 'শিক্ষাপদ'; যেমন, প্রাণীহত্যা থেকে নিবৃত্ত থাকা; চৌর্য থেকে নিবৃত্ত থাকা; অব্রহ্মচর্য থেকে নিবৃত্ত থাকা; মিথ্যাভাষণ পরিহার করা; উত্তেজক পানীয় বর্জন করা; নৃত্য-গীত-বাদ্য বর্জন করা; মালা-গন্ধ বিলেপন-অলঙ্কার ত্যাগ করা; গৃহস্থালীর বিলাসদ্রব্য

বর্জন করা ; সোনা-রূপার ব্যবহার ত্যাগ করা ; এবং অসময়ে আহার গ্রহণ না করা।

(৩) মানবদেহের ৩২টি অংশের তালিকা। মানবদেহের ক্ষণস্থায়িত্ব বোঝাতে এবং এর প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করার জন্যই এই তালিকা।

(৪) নবদীক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের মূল-সূত্রগুলি সম্বন্ধে অবহিত করা। এইখানে অঙ্গুত্তর নিকায়ের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। উদাহরণ,

প্রঃ—দুইটি জিনিষ কী ? উঃ—নামরূপ।

প্রঃ—চারটি জিনিষ কী ? উঃ—চতুরার্যসত্য।

প্রঃ—'আট' বলতে কী বোঝায় ? উঃ—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

এইরকম দশটি প্রশ্ন ও উত্তর এই অংশে আছে।

পরবর্তী পাঁচটি অংশ গাথায় এবং ছোট ছোট 'সুত্তে'র আকারে রচিত। সুত্ত পাঁচটি হল : মঙ্গল সুত্ত, রতন সুত্ত, তিরোকুড্ড সুত্ত, নিধিকণ্ড সুত্ত, করণীয় মেত্তসুত্ত।

মঙ্গল সুত্তে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে। যে সব কার্য বা অনুষ্ঠান প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে শুভ বা হিতপ্রদ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে সেগুলিই এখানে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ, শান্তিপূর্ণ উপজীবিকা, সাধু জীবন-যাপন ইত্যাদি।

সুত্তনিপাতে এই সুত্তটিকে আমরা মহামঙ্গল সুত্ত নামে পাই। বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানে আশীর্বচন বা শুভাশংসন রূপে সুত্তটিকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পালি কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে রতন সুত্ত-কে অভিহিত করা যায়। সুত্তটিতে প্রাচীন রীতি অনুসারে সর্ব 'ভূতে'র পূজা, 'ত্রি-রত্নে'র পূজা প্রভৃতি উল্লিখিত হয়েছে। বিপদকে দূর করে উন্নতি লাভ করতে সুত্তটিকে আবৃত্তি করা হয়। এই সুত্তটিকেও সুত্তনিপাতে পাওয়া যায়।

তিরোকুড্ড সুত্ত নামে পরিচিত পরবর্তী অংশটি রতন সুত্তেরই সমগোত্রীয়। মৃতব্যক্তির জন্য শোক বৃথা এবং ভিক্ষুদের দান করলে পরলোকে পুণ্যভোগ করা যায় এই হ'ল সুত্তটির বক্তব্য। মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে

শ্রদ্ধা-তর্পণ নিবেদনের প্রাচীন বৌদ্ধ রীতি এই সুত্ত থেকে জানা যায়। এই রীতিটিও ব্রাহ্মণ্য (হিন্দু) রীতিরই অনুকরণে প্রচলিত বলে মনে হয়। এই সুত্তের কয়েকটি শ্লোক মৃতদেহ সৎকারের সময় আজও শ্যাম ও সিংহল দেশে আবৃত্তি করা হয়।

সুত্তটি তিরোকুড্ড পেতবত্থু নামে পেতবত্থুর অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টম অংশ নিধিকণ্ড সুত্তে বলা হয়েছে সৎকর্ম-অনুষ্ঠানরূপ সম্পদই একজন বৌদ্ধের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। অসময়ে কাজে লাগবে এই আশায় লোকে যেমন সম্পদ্রাশি গোপনে সঞ্চয় করে রাখে তেমনই পরলোকে তাঁর সাহায্যে আসবে এই আশায় একজন বৌদ্ধ শীল-ধর্ম পালন করেন ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেন।

মেত্তা-(মৈত্রী) ভাবনার উচ্চাদর্শ ব্যাখ্যা করে করণীয় মেত্তসুত্ত নবম বা শেষ অংশে বৌদ্ধদের মৈত্রী-ভাবনার চর্যায় অনুপ্রাণিত করেছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ভূত-অভূত, চরাচরের তাবৎ প্রাণীজাত সম্বন্ধে মনে অসীম প্রেম ও শুভেচ্ছা পোষণ করে সকলের মঙ্গলের জন্য তৎপর হ'তে হ'বে।

সুত্তনিপাতেও আমরা সুত্তটিকে সংগৃহীত দেখি।

খুদ্দকপাঠের সাতটি অংশ সিংহলী-বৌদ্ধদের পরিত্তা-(পরিত্রাণ) অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করা হয়। বিপদ-আপদ, অনিষ্ট, অশুভশক্তির হাত থেকে পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ 'যাদুমন্ত্র'রূপেই এগুলি ব্যবহৃত হয়। যে কোন উপলক্ষ্যে, এমন কি নতুন বাড়ী তৈরীর সময়েও, পরিত্তা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধসমাজেও এই অনুষ্ঠানের রীতি আছে[৩৮]। স্বয়ং বুদ্ধ 'পরিত্তা' শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে পালি সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে[৩৯]।

২। ধম্মপদ

খুদ্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ ধম্মপদ বৌদ্ধ শাস্ত্রের সবথেকে বেশী পরিচিত ও প্রচারিত গ্রন্থ। নৈতিক মূল্যের বিচারে গ্রন্থটি এত সমাদৃত যে পৃথিবীর বিদগ্ধমণ্ডলীর মতে এর স্থান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সঙ্গে সমান। সিংহলে বৌদ্ধ সমাজে ধম্মপদের মূল্য এত বেশী যে প্রত্যেক শিক্ষানবীশ ভিক্ষুকে উপসম্পদা লাভের আগে গ্রন্থটি আয়ত্ত করতেই হ'বে।

'ধম্মপদ'-শব্দের অর্থ

'ধম্মপদ' শব্দটির নানাভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'ধম্ম' অর্থাৎ বিনয়, তত্ত্ব, ধর্ম ; তার 'পদ' অর্থাৎ পথ, উপায়, মার্গ, ভিত্তি ইত্যাদি।[৪০] এই ভাবে শব্দটির অর্থ শীল-ধর্মের (virtue) পথ, ধর্মের ভিত্তি ইত্যাদি। 'পদ' শব্দটিকে শ্লোকের বা গাথার একটি 'অংশ' হিসেবে ব্যাখ্যা করলে 'ধম্মপদ' শব্দের অর্থ হয় 'ধর্মের উক্তি'। পাশ্চাত্য দেশে শব্দটির অনুবাদ হয়েছে এই ভাবে,—ধর্মের পংক্তি বা সোপান, ধর্মের মার্গ, শীল-ধর্মের মার্গ, সত্যের বচন, সত্যের পথ, ধর্মের বাক্যাবলী ইত্যাদি। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে গ্রন্থটিকে 'ধম্ম'সম্বন্ধীয় উক্তির বা গাথার সংগ্রহ' রূপে গ্রহণ করা যায়।

রচনাকাল

গ্রন্থটির সংকলন বা রচনার কোন সময় আমরা নির্দিষ্ট করতে পারিনা। প্রশ্নটি ত্রিপিটক রচনার সময়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধম্মপদের অর্ধেকের বেশী গাথা আমরা ত্রিপিটকের অন্যান্য স্থানে পাই এবং মনে হয়[৪২] সংকলক ঐ সব স্থান থেকেই গাথাগুলি সংগ্রহ করেন। গাথাগুলি ভগবান বুদ্ধের বাণী বলা হলেও এই গ্রন্থে আমরা এমন কিছু অংশ পাই যা' মূলতঃ বৌদ্ধ কিনা সন্দেহ আছে। এখানে যে সমস্ত নৈতিক উপদেশ আছে মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থেও অনুরূপ উপদেশ পাওয়া যায়। এমন অসম্ভব নয় যে, কোন সাধারণ সূত্র (common source) থেকেই এইগুলি বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শাস্ত্রে এবং মহাভারত, গীতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে Winternitz এর অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, "...were drawn from that inexhaustible source of Indian gnomic wisdom, from which they also found their way into Manu's law-book, into the Mahābhārata, the texts of the Jains, and into narrative works such as the

Pañcatantra, etc. It is, in general, impossible to decide where such sayings first appeared."[৪৩]

বক্তব্য

ধর্মনীতি সম্বন্ধীয় পদাবলীর সংগ্রহ এই গ্রন্থের বক্তব্য হল জনসাধারণকে নৈতিক উপদেশ দান। বৌদ্ধ শীল-ধর্ম ও তত্ত্বের ব্যাখ্যার মধ্যেই এই গ্রন্থে ভিক্ষু, শ্রমণ ও গৃহস্থ প্রভৃতি সকল স্তরের মানুষের জন্যই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সহজ উপমার সাহায্যে সরল ভাষায় চমৎকার ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কিভাবে জীবন যাপন করলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে মানুষ তার ঈপ্সিত পরম লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে।

ধর্মপদের বিভিন্ন *recension*

বিভিন্ন ভাষায় ধম্মপদের বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। আমরা যে কয়েকটি সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলতে পারি সেই সংস্করণগুলি হল, (১) পালি ধম্মপদ; (২) প্রাকৃত বা গান্ধারী ধর্মপদ (৩) সংস্কৃত ধর্মপদ বা উদানবর্গ; (৪) মহাবস্তুতে উদ্ধৃত দুইটি বর্গ এবং কয়েকটি গাথা যে সংস্করণকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল; (৫) প্রাচীনতম চীনা অনুবাদ Fa-chü-ching যে সংস্করণকে অবলম্বন করেছিল।

আমাদের এমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই[৪৪] যার সাহায্যে আমরা বলতে পারি কোন্ কোন্ বৌদ্ধশাখার নিজস্ব 'ধর্মপদ' সংগ্রহ ছিল অথবা তারা কোন্ সংস্করণটি স্বীকার করতো।

সংস্করণগুলির মধ্যে পালি ধম্মপদ-ই সর্বাধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয় এবং এই সংস্করণটিই সম্পূর্ণ রূপে বর্তমান। গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পালি সংস্করণটিকেই ভিত্তি করে হ'বে, তবু, এই প্রসঙ্গে অন্যান্য সংস্করণ সম্বন্ধে কিছু তথ্য আলোচনা করা যায়।

উদানবর্গ বা সংস্কৃত ধর্মপদের দুই তৃতীয়াংশ আমরা মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে পেয়েছি। তিব্বতী এবং চীনা অনুবাদে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি পাওয়া যায়। উদানবর্গের সংকলন-কর্ত্তা হিসেবে ধর্মত্রাতকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সম্বন্ধে চীনা সূত্রে পাওয়া যায় যে ধর্মপদ নামক গ্রন্থে ধর্মত্রাত এক সহস্র গাথা সংগ্রহ করে সেগুলিকে তেত্রিশটি বর্গে বিভক্ত করেন।[৪৫]

প্রাকৃত বা গান্ধারী ধর্মপদের পঁুথি মধ্য এশিয়ায় খোটানের কাছে আবিষ্কৃত হয়। পঁুথিটি খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি পাওয়া না গেলেও প্রাকৃত ধর্মপদ পালি ধম্মপদের মত ২৬ বর্গেই বিভক্ত ছিল বলে মনে করা হয়[৪৬]। পঁুথিটির শুরুতেই বুদ্ধবর্মণের নামোল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধবর্মণ সম্ভবতঃ[৪৭] প্রাপ্ত পঁুথিটির লেখক বা অধিকারী ছিলেন, ধর্মত্রাতের মত প্রাকৃত সংস্করণের সংকলন-কর্তা ছিলেন না।

প্রাচীন চীনা অনুবাদ Fa chü ching ৫০০ গাথা বিশিষ্ট মিশ্র সংস্কৃতে রচিত কোন মূল ধর্মপদকে অবলম্বন করে করা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন[৪৮]। এই অনুবাদ কয়েকটি সংস্করণকে অনুসরণ করে করা হয়েছিল বলেও কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন[৪৯]। অনুবাদটিতে আমরা ৩৯টি বর্গ পাই এবং এর অধিকাংশ বর্গের বিন্যাস ও নামকরণের সঙ্গে পালি সংস্করণের সাদৃশ্য আছে। এই চীনা অনুবাদের মূল গ্রন্থটির পালি সংস্করণের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল বলে মনে হয়না।

সংস্করণগুলির মধ্যে পালি ধম্মপদ থেরবাদী শাখার গ্রন্থ এবং সংস্কৃত[৫০] উদানবর্গ সর্বাস্তিবাদী ও মহাবস্তুতে উদ্ধৃত অংশ লোকোত্তরবাদিন্-মহাসাঙ্ঘিকদের গ্রন্থ বলে মনে করা হলেও, প্রাকৃত ধর্মপদ কোন্ শাখার সংকলন ছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। গ্রন্থটিকে কখনও-মহাসাঙ্ঘিক শাখার, আবার কখনও মহাসাঙ্ঘিক এবং সর্বাস্তিবাদী অথবা সৌত্রান্তিক শাখার দুই গ্রন্থের সমন্বয়ে গঠিত, আবার, কেবলমাত্র সর্বাস্তিবাদীদের গ্রন্থ বলেও মনে করা হয়েছে[৫১]। চীনা অনুবাদটি সর্বাস্তিবাদী কোন মূল গ্রন্থের অবলম্বনে করা হয়েছিল বলে একটি প্রচলিত অভিমত আছে[৫২]

সংস্করণগুলির মধ্যে সাদৃশ্য

পালি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধর্মপদের প্রাপ্ত অংশগুলির বিশ্লেষণ করে দেখলে মনে হয় প্রাকৃত সংস্করণটি পালি সংস্করণের থেকে আকারে বড়

হলেও বৃহদাকার উদানবর্গের চেয়ে পালি সংস্করণের সঙ্গেই তার বেশী সাদৃশ্য আছে। এখানে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে পালি গাথার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন গাথার সংখ্যার ব্যাপারে প্রাকৃত ও সংস্কৃত সংস্করণে মিল দেখা যায়[৫৩]। এই তিন সংস্করণের ৩৫০ থেকে ৩৬০টি গাথার মধ্যে মিল পাওয়া যায়।

গাথা ছাড়া বর্গ হিসেবে বিভক্ত করার ব্যাপারেও এই তিন গ্রন্থে সাদৃশ্য আছে। সাধারণতঃ শীল-ধর্ম অনুসারে গাথাগুলিকে সাজিয়ে গ্রন্থগুলিকে বর্গে বর্গে ভাগ করা হয়েছে। উদানবর্গের শ্রমণবর্গ প্রাকৃতে থের- এবং পালিতে ধম্মট্‌ঠবগ্‌গ হয়েছে। পালির বুদ্ধবগ্‌গের নাম উদানবর্গে তথাগতবর্গ করা হয়েছে। পালি-প্রাকৃতের জরাবগ্‌গকে সংস্কৃতে অনিত্যবর্গ বলা হয়েছে।

গাথাগুলির গঠন, শব্দ ও ভাষার ব্যাপারে তুলনা করে দেখলে[৫৪] প্রাকৃত গাথার সঙ্গে সংস্কৃত গাথাগুলির সাদৃশ্যই বেশী মনে হয়,—এ ব্যাপারে পালির সঙ্গে এদের মিল কম। আবার বর্গের বিন্যাস ও গাথার নির্বাচন ব্যাপারে পালি ও প্রাকৃতের মধ্যে সাদৃশ্য বেশী।

মহাবস্তুতে ধর্মপদের যে অংশ উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে 'সহস্র বর্গ' নামে উল্লিখিত অংশটি মনে হয় বর্গহিসেবে সম্পূর্ণ, যদিও অন্যান্য সংস্করণের সহস্রবর্গের গাথাগুলির বিন্যাসের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ মিল পাওয়া যায় না। আর একটি অংশের নামোল্লেখ মহাবস্তুতে না থাকলেও গাথাগুলি যে 'ভিক্ষুবর্গের' তা' বলা যায়,—এখানে বর্গটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয় নি। মহাবস্তুর কয়েক স্থানে আবার ধর্মপদের কয়েকটি গাথা বিক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত আছে।

প্রাচীনতম ধর্মপদ

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই সংস্করণগুলির সাধারণ উৎস হিসেবে কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থ ছিল, না প্রচলিত নীতি ও ধর্মবিষয়ক গাথাগুলিকেই সংগ্রহ করে বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়া হয়েছিল। কোন নির্দিষ্ট তথ্যনির্ভর প্রমাণ দেওয়া না গেলেও ধরে নেওয়া যায় যে বৌদ্ধধর্মের প্রথম দিকে সাধারণভাবে প্রচলিত নীতি ও ধর্ম বিষয়ক গাথাগুলিকেই বিভিন্ন শাখার

স্থবিরগণ বহুলাংশে পরিমার্জিত, পুনর্বিন্যস্ত ও পরিবর্ধিত করে বিভিন্ন 'ধর্মপদে'র সংকলন প্রস্তুত করেন। এই সংকলনগুলির মধ্যে পালি ধম্মপদকে প্রাচীনতম বলে অনেকে মনে করেন। কারো মতে আবার পালি ধম্মপদকে কিছুতেই প্রাচীনতম বলা উচিত নয়[৫৫]।

পালি সাহিত্যে ধম্মপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মিলিন্দ পঞ্‌হো[৫৬] গ্রন্থে। পালি ধম্মপদ ছাড়া অন্য কোন ধম্মপদে পাওয়া যায় না এমন কিছু গাথা প্রাক্-অশোক পর্বের 'চুল্লনিদ্দেস' গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'মহানিদ্দেস' গ্রন্থেও অনুরূপ কিছু গাথা আছে। অপ্রমাদবর্গ সম্রাট অশোকের কাছে আবৃত্তি করা হয়েছিল বলে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সব তথ্য বিশ্লেষণ করে অনেকে মনে করেন পালি সংস্করণ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের মধ্যেই প্রস্তুত হয়েছিল[৫৭]। অন্য সংস্করণগুলির সময় সম্বন্ধে আলোচনার পক্ষে আমাদের পাওয়া তথ্য যথেষ্ট নয়[৫৮]।

বর্গবিভাগের পদ্ধতি

পালি ধম্মপদে ৪২৩টি গাথা আছে, গাথাগুলি ২৬টি বগ্‌গে বিভক্ত। আলোচ্য বিষয় বা উপমা হিসেবে গৃহীত কোন বস্তুর নামানুসারে বর্গগুলির নামকরণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বিষয়বস্তু বা উপমা ভিত্তি করেই গাথাগুলির সংকলন করা হলেও কতকগুলি বর্গ এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না, যেমন যমক বগ্‌গ, পকিণ্‌ণক (প্রকীর্ণক) বগ্‌গ ইত্যাদি।

যমক-বগ্‌গে সংগৃহীত গাথাগুলির বিন্যাসে একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে রচিত এক এক 'জোড়া' গাথার সাহায্যে বক্তব্য বিষয়কে পরিষ্কার করা হয়েছে। এই পদ্ধতির জন্যই বর্গটির এইরূপ নামকরণ হয়েছে বলে মনে হয়। 'জোড়া'র প্রথম গাথাটিতে যদি নঞর্থক উক্তির সাহায্যে বক্তব্য বলা হয়ে থাকে তবে দ্বিতীয় গাথা সেই বক্তব্যই নিশ্চয়াত্মক ভাবে উপস্থাপিত করেছে।

পকিণ্‌ণক (প্রকীর্ণক) বগ্‌গ কে বিবিধ প্রকারের গাথার সংগ্রহবর্গ বলা যায়। কোন নির্দিষ্ট বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি এমন গাথাই এই বর্গে

গৃহীত হয়েছে। পালি, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত এই তিন সংস্করণেই বর্গটি আছে কিন্তু গাথা ও গাথার সংখ্যার দিক থেকে বিশেষ মিল নেই।

পালি ধম্মপদের ২৬টি বর্গ ক্রমানুসারে দেওয়া হল : যমক-, অপ্পমাদ-, চিত্ত-, পুপ্ফ-, বাল-, পণ্ডিত-, অর্হন্ত-, সহস্স-, পাপ-, দণ্ড-, জরা-, অত্ত-, লোক-, বুদ্ধ-, সুখ-, পিয়-, কোধ-, মল-, ধম্মটঠ-, মগ্‌গ-, পকিণ্ণক-, নিরয়-, নাগ-, তণ্‌হা-, ভিক্খু-, ও ব্রাহ্মণবগ্‌গ।

নৈতিক উপদেশ ছাড়া বৌদ্ধধর্মের তাত্ত্বিক উপদেশেও ধম্মপদ সমৃদ্ধ। চতুরার্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করে এদের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংসারের অনিত্যতা, অনাত্মতা, দুঃখময়তা প্রতিপন্ন করে কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্তব্য তা দেখানো হয়েছে। বর্গগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা করলে গ্রন্থটির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশের উৎকর্ষ উপলব্ধি করা যায়।

৩। উদান

তৃতীয় গ্রন্থ উদান গাথা এবং গদ্যের মিশ্রণে রচিত। গ্রন্থটি আটটি বর্গে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বর্গে দশটি করে সুত্ত আছে। সুত্তগুলির অধিকাংশই গাথায় রচিত। সুত্তগুলিতে বুদ্ধের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা বর্ণনা করার পর বুদ্ধের মুখনিঃসৃত কোন ভাবগম্ভীর উপদেশাত্মক বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই ভাবগম্ভীর উদাত্ত বাণীই 'উদান'। ত্রিপিটকের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ 'উদান' পাওয়া যায়, এর সবগুলিই অবশ্য বুদ্ধ-বাণী নয়। রাজা, দেবতা বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও আমরা 'উদান' প্রকাশ করতে দেখি।

এই গ্রন্থের রচনা-রীতি অতি সরল এবং 'উদান' রূপ উক্তিগুলি সংক্ষিপ্ত হ'লেও গভীর অর্থদ্যোতক। প্রত্যেকটি 'উদানে'র পূর্বে সুত্তগুলিতে বলা হয়েছে, "...এই বিষয় সম্যগ্ অবহিত হয়ে বুদ্ধ এই 'উদান' প্রকাশ করলেন,..."। সাধারণতঃ সুত্তগুলিতে প্রথম বুদ্ধের জীবনের কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং শেষে একটা উদান বা উদাত্ত উক্তি আছে। গ্রন্থটির আটটি বর্গ হ'ল : বোধিবগ্‌গ, মুচলিন্দ-, নন্দ-, মেঘিয়-, সোনথেরস্স-, জচ্চন্ধ-, চূল-, পাটলিগামিয় বগ্‌গ। বৌদ্ধ জীবনাদর্শ, অর্হত্তের

গভীর প্রশান্ত মন, অনন্ত সুখদায়ক নির্বাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা এই বর্গগুলির মূল বিষয়। ভাষা সরল, অনাড়ম্বর এবং স্বাভাবিক।

প্রাচীনত্ব

'উদান' গুলি যথার্থই বুদ্ধ-বচন কিনা এ সম্বন্ধে প্রশ্নের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু আমরা একথা বলতে পারি যে 'উদান' গুলি যথেষ্ট প্রাচীন এবং বুদ্ধের বা তাঁর কোন প্রধান শিষ্যের বাণী হওয়া অসম্ভব নয়। ছোট ছোট গাথার উক্তিগুলি ঘটনাত্মক বিবরণগুলির চেয়ে যে প্রাচীন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। এই কাহিনীগুলির কিছু অংশ হয়ত মুখবন্ধ হিসেবে প্রাচীনতর সময় থেকে চলে এসেছে কিন্তু এমনও কিছু অর্বাচীন ও অর্থহীন কাহিনীর সাক্ষাৎ আমরা এই গ্রন্থে পাই যা' পরবর্তী কালের সংকলন-কর্তাদের সংযোজন বলে মনে হয়। বিনয়পিটক ও মহাপরিনিব্বান সুত্তে বর্ণিত বুদ্ধ-জীবনীর ঘটনার সঙ্গে মিল আছে এমন কিছু কাহিনীও এতে পাওয়া যায়। এই কাহিনীগুলি প্রাচীন প্রচলিত সাধারণ (common) ঐতিহ্য থেকেই গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়।

'উদান'গুলি সাধারণতঃ ত্রিষ্টুভ্ বা জগতী ছন্দে রচিত। বৌদ্ধদের জীবনাদর্শ, অর্হতের মানসিক শান্তি, নির্বাণের মহিমা প্রভৃতিই হল মোটামুটি ভাবে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

৪। ইতিবুত্তক

উদানের অধিকাংশের মত খুদ্দক নিকায়ের চতুর্থ গ্রন্থ ইতিবুত্তক গদ্য এবং পদ্যের মিশ্রণেই রচিত। উদানের গদ্যে যেমন কিছু বিবরণ বা ঘটনা মাত্র পাওয়া যায় এখানে গদ্যের প্রকৃতি তা' থেকে একটু ভিন্ন। একই ভাব বা তত্ত্ব বা উপদেশ কিছুটা গদ্যে এবং কিছুটা পদ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। অনেক জায়গায় বক্তব্য বিষয় প্রথম সংক্ষেপে গদ্যে প্রকাশ করে আবার গাথায় বলা হয়েছে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়, কয়েকটি গাথার মধ্যে মাত্র একটিরই ভাব গদ্যে বলা হয়েছে, অন্যগুলির ক্ষেত্রে কোন গদ্যাংশের সংযোজন নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে গদ্যাংশ এবং গাথা পরস্পরের পরিপূরক

হিসেবে স্থান পেয়েছে। উদানের মতই এর ভাষা এবং রচনারীতি সরল, স্বাভাবিক ও অনাড়ম্বর।

ইতিবুত্তকে ১১২টি ক্ষুদ্র সুত্ত আছে এবং সুত্তগুলি চারটি 'নিপাত' বা বর্গে বিভক্ত। ভগবান্ এইরূপ ('ইতি') বলিয়াছেন (উক্ত বা 'বুত্ত')—এই অর্থে গ্রন্থটির এইরূপ নামকরণ। এই জন্যই সুত্তগুলির প্রারম্ভে-'ভগবান এইকথা বলেছেন, অর্হত্ এ কথা বলেছেন, আমি শুনেছি,' এবং শেষে-'ভগবান্ এই কথাও বলেছেন, আমি শুনেছি',—এইরকম বাক্য সংযুক্ত আছে।

বিষয়বস্তু

গ্রন্থটিকে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত নৈতিক উপদেশাত্মক বাণীর সংকলনও বলা যায়। রাগ, দ্বেষ, লোভ, ঈর্ষা, কায়-বাক্-চিত্তের অন্যান্য দুর্বলতা, মৈত্রী দান, সত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বুদ্ধের উপদেশ এতে লিপিবদ্ধ। তা' ছাড়া নির্বাণ, স্কন্ধ, বোধি প্রভৃতির আলোচনাও এতে করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে সুন্দর রূপক, অলঙ্কার প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। বুদ্ধ বলেছেন ইন্দ্রিয়গুলি মানব-শরীরের দরজা স্বরূপ, দরজায় যেমন উপযুক্ত প্রহরী রাখা দরকার ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধেও মানুষের তেমন সতর্ক হওয়া উচিত। পালি-ছন্দের দিক থেকে এর গাথাগুলি বিশেষ আলোচনার যোগ্য।

গ্রন্থটির কিছু অংশ আমরা অঙ্গুত্তর নিকায়ে পাই। প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙ্ ইতিবুত্তকের যে চীনা অনুবাদ করেন তাতে বর্তমানে প্রচলিত পালি গ্রন্থটির কিছু অংশ পাওয়া যায় না, কিন্তু চীনা অনুবাদে ১৩৭টি সূত্র আছে।

৫। সুত্তনিপাত

খুদ্দক নিকায়ের পঞ্চম গ্রন্থ সুত্তনিপাত পালি-সাহিত্যের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ। ধম্মপদের পর যে গ্রন্থটি বৌদ্ধদের কাছে সব থেকে বেশী সমাদৃত তা' হ'ল সুত্তনিপাত। গাথায় নিবদ্ধ এর সুত্তগুলি পাঁচটি বগ্‌গে বিভক্ত। উরগ-, চূল-, মহা-, ও অট্‌ঠকবগ্‌গ এই চারটি বর্গে মোট ৫৪টি ছোট কবিতা আছে এবং পঞ্চম পারায়ণবগ্‌গ একটি বড় স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা ও

এতে ১৬টি ছোট ছোট অংশ আছে। এই ভাবে সুত্তনিপাতের মোট সুত্ত সংখ্যা সত্তর বলা যায়।

অট্ঠকবগ্গ এবং পারায়ণবগ্গ পালি শাস্ত্রে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। এই দুই বর্গের প্রাচীন টীকা খুদ্দক নিকায়ের 'নিদ্দেস' নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সুত্তনিপাতের বহু গাথা ও সুত্ত পালি-শাস্ত্রের বহুস্থানে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত দেখা যায়। সম্রাট্ অশোক তাঁর Bhābrū অনুশাসনে যে সুত্ত বা গ্রন্থগুলি পড়বার জন্য বলেছেন, তার মধ্যে অন্ততঃ তিনটি সুত্তকে সুত্তনিপাতে পাওয়া যায়। ভাষা এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে সুত্তনিপাতের অন্তর্গত বহু সুত্ত বৌদ্ধধর্মের আদিযুগেই রচিত হয়েছিল এবং কিছু সুত্ত অন্ততঃ তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রধান শিষ্যরাই তাঁর দেহাবসানের কিছুকালের মধ্যেই রচনা করেছিলেন।

রচনা ও গঠনের বৈশিষ্ট্য

সুত্তগুলি আকারে এক রকম নয়, ছোট বড় সব রকমের সুত্তই আছে এবং সুত্তগুলির রচনা পদ্ধতিও এক নয়। কোন সুত্তে গদ্যে মুখবন্ধ করে গাথায় বক্তব্য বলা হয়েছে, কোথাও গদ্যাংশ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, কোন জায়গায় গদ্যাংশ ও গাথা এমন ভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে গদ্যে ঘটনার বিবরণ বা গাথার বক্তব্যগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া আছে আর গাথায় মূল বক্তব্য বলা হয়েছে। কোন সুত্তে আবার গদ্যাংশে উপদেশ দিয়ে তার মধ্যে গাথার সংযোজন করা আছে। প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সাহিত্যে 'সংবাদ' বা 'আখ্যান' রীতির যে ধারা চলে আসছিল সুত্তনিপাতের রচনাবলীর মধ্যে তার প্রয়োগ দেখা যায়। আলবক সুত্ত, সূচিলোম সুত্তে বেদ ও মহাকাব্যের রচনার ধারা লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতে যুধিষ্ঠির যেমন যক্ষের ধাঁধা ও প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এই সুত্তগুলিতেও তেমনি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এক সন্ন্যাসী বৌদ্ধ নীতিমূলক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। নালক সুত্ত, পব্বজ্জা সুত্ত ও পধানসুত্ত প্রাচীন আখ্যান কাব্যের নিদর্শন হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধের জীবনীকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল এই সুত্তগুলিতে তার সূচনার

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের বুদ্ধ-কাহিনীর প্রধান লক্ষণগুলি এই সুত্তগুলিতে আছে। নালক সুত্তে গৌতমের জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরের ঘটনার বিবরণ আছে। পব্‌বজ্জা সুত্তে গৌতমের গৃহত্যাগ ও পরিব্রাজক রূপে রাজগৃহের রাজার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার বর্ণনা করা হয়েছে। পধান সুত্তে বুদ্ধ ও মারের সংঘর্ষ এবং মারের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। তিনটি সুত্তই আখ্যান কাব্যের উত্তম নিদর্শন। পুরাণ ও উপাখ্যান-সুলভ আঙ্গিকগুলি এদের মধ্যে বর্তমান থাকলেও পরবর্তীযুগের বুদ্ধ-উপাখ্যানের তুলনায় সুত্তগুলি সহজ ও অনাড়ম্বরভাবে রচিত। এই আখ্যানগুলিকে আমরা প্রাচীন যুগের রচনার মধ্যে ধরতে পারি না, এদের আগে বুদ্ধ-কাহিনীর বেশ ক্রমবিকাশ ও পরিণতি ঘটেছিল বলে মনে হয়।

সুত্তনিপাত বিভিন্ন সময়ের রচনার সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এবং গ্রন্থটিকে কোন রকমেই একটি একক (unified) রচনা বলা যায় না, যদিও কিছু কিছু সুত্ত একই ব্যক্তির রচনা হ'তে পারে। উরগ বগ্‌গের ১২টি সুত্ত একই ব্যক্তির রচনা হওয়া সম্ভব বলে Winternitz[৫৯] মনে করেন।

প্রাচীনত্ব

বুদ্ধ-কালীন ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সঙ্গে পরিচয় করতে হ'লে সুত্তনিপাতের সাহায্য নিতেই হ'বে। জাতিমূলক সমস্যার প্রতি বুদ্ধের মনোভাব, প্রত্যেকবুদ্ধের আদর্শ, নির্বাণ ও বৌদ্ধতত্ত্ব, সেই সময়ের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় সুত্তনিপাতে আলোচনা করা হয়েছে। ধনিয়সুত্ত, খগ্‌গবিসাণ সুত্ত, কসি-ভারদ্বাজ-, বসল-, মেত্ত-, রতন-, মহামঙ্গল-, ব্রাহ্মণধম্মিক-, বাসেট্‌ঠ-, কলহবিবাদ-, তুবটকসুত্ত প্রভৃতি সুত্তনিপাতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও প্রয়োজনীয় সুত্ত।

ভাষাতত্ত্বের জন্য সুত্তনিপাতের আলোচনা[৬০] বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখানে বেশ কিছু বৈদিক শব্দের প্রভাব ও প্রয়োগ দেখতে পাই। ভাষার দিক থেকে সুত্তনিপাতের প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করা যায়:

ভাষা এবং সুত্তগুলির প্রকৃতিই কেবল সুত্তনিপাতের প্রাচীনত্বের নিদর্শন নয়। সুত্তনিপাতে বৌদ্ধধর্ম যে অবস্থায় উপস্থাপিত তা'তে মনে হয় বৌদ্ধধর্মের গোড়ার দিকের ছবিই আমরা দেখছি। প্রাচীনতম বা *Primitive* বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনায় সুত্তনিপাতের বিশিষ্ট স্থান আছে। এই গ্রন্থে 'বিহারের' অধিবাসী ভিক্ষুদের ছবি নেই, যা আছে তা' হ'ল বনবাসী সন্ন্যাসীদের প্রাথমিক স্তরের জীবনযাত্রার বর্ণনা। সঙ্ঘকে এখনও আমরা গড়ে উঠতে দেখিনা, কিন্তু একটি জীবন দর্শনের প্রকাশ যে ঘটছে তা' বুঝতে পারি। বৌদ্ধ দর্শনের সুস্পট প্রতিশ্রুতি সুত্তনিপাতে নেই, আছে নীতি-ধর্ম (*ethical*) হিসেবে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা। নীতি-ধর্মের দিক থেকেই সুত্তনিপাতে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দার্শনিক চিন্তার যে বীজ সুত্তনিপাতে পাওয়া যায় সেই বীজ পরবর্তী যুগেই বৌদ্ধদর্শন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুত্তনিপাতে বৌদ্ধধর্মকে আমরা একটি সরল ও সহজ ধর্মবিশ্বাস রূপে মাত্র দেখি— যা'র নির্দেশ হ'ল বিবেকবান্ হয়ে শীল ও নীতিমূলক উপদেশগুলি পালন ও নৈতিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন, এবং জগৎকে অনিত্য, অনাত্ম ও দুঃখময় রূপে উপলব্ধি করা। বুদ্ধ এখানে সকলকে বলছেন পবিত্র জীবন যাপন করতে, সংসার ও বিষয়ে আসক্ত না হতে ; কিন্তু, কাউকে বলছেন না সঙ্ঘে বা ঐ রূপ কোন সংগঠনে যোগ দিতে। এর থেকে বোঝা যায়, যে সময় সুত্তগুলি লেখা হয় তখনও সঙ্ঘের কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং বুদ্ধের শিষ্য-সংখ্যা তখনও এত বেশী হয়নি যাতে কোন সংগঠনের প্রয়োজন হয়। ঐ সময় বুদ্ধ-শিষ্যরা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরূপে বনে-পাহাড়ে বুদ্ধের উপদেশ ও নির্দেশ মত ধর্ম-চর্যা করতেন।

৬। বিমানবত্থ

বিমানবত্থু খুদ্দক নিকায়ের ষষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে দিব্যকায়সম্পন্ন ব্যক্তিদের আবাসভূমির বর্ণনা আছে। ইহলোকে শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করলে মৃত্যুর পর মানুষ দিব্যকায়সম্পন্ন হয়ে স্বর্গীয় আবাস ভূমিতে অশেষ সুখ অনুভব করে। নৈতিক চরিত্রের শুদ্ধতা ও সু-কর্মের অনুষ্ঠানই গ্রন্থটির বক্তব্য। মানুষ যেমন কর্ম করে তার ফলও সে তেমনই ভোগ করে, এই কর্মবাদ

এতে প্রচার করা হয়েছে। যে সমস্ত গল্প বা কাহিনীর সমাবেশ এই গ্রন্থে করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হ'ল পরিশুদ্ধ কর্মানুষ্ঠানে ও পবিত্র চরিত্র অবলম্বনে পাঠক বা শ্রোতাদের আকৃষ্ট করা। স্বর্গীয় ভূমির সুখ ও আনন্দের বর্ণনা এবং নরকের দুঃখ-যন্ত্রণার বিবরণ সু-কর্মের পুরস্কার ও কু-কর্মের শাস্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এখানে দেওয়া হয়েছে। দিব্যকায়-সম্পন্ন একজনকে প্রশ্ন করে মোগ্‌গল্লান বুঝতে পারেন যে পৃথিবীতে নানা সৎ ও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের ফলেই মৃত্যুর পর তিনি দিব্যভূমিতে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হয়েছেন। সাতটি বর্গে বিভক্ত গ্রন্থটিতে ৮৫টি গাথা আছে। গ্রন্থটির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নেই।

৭। পেতবত্থু

পরবর্তীগ্রন্থ পেতবত্থুতে প্রেত ও প্রেতলোকের কথা আছে। ছোট ছোট সুত্তে প্রেতলোকে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের বর্ণনা করা হয়েছে। নারদ প্রেতযোনি প্রাপ্ত মৃত ব্যক্তিকে তার দুঃখভোগের কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রেত জানায় যে কু-কর্মের অনুষ্ঠানই তার ঐ দশার কারণ। বিমানবত্থুর মতই এই গ্রন্থে বলা হয়েছে কু-কর্ম ও অপবিত্র জীবনযাপন মানুষের মৃত্যুর পর তার অশেষ দুঃখভোগের কারণ হয়। কর্মবাদ এই গ্রন্থটিরও ভিত্তি। কর্মফল মানুষকে ভোগ করতেই হ'বে, তাকে এড়ানো অসম্ভব। জীবিত অবস্থায় আন্তরিকতার সঙ্গে দান প্রভৃতি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করলেই মৃত্যুর পর সুখভোগের অধিকারী হওয়া যায়। রক্তমাংসের মানুষের যা' যা' প্রয়োজন পেতবত্থুর মতে প্রেতদেরও ঠিক তাই প্রয়োজন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনার তাড়না প্রেতকেও ভোগ করতে হয়। মানুষের দেওয়া খাদ্য ও অন্যান্য কিছুই প্রেত সাক্ষাৎভাবে স্বীকার করতে পারে না, জীবিত কোন মানুষকে সেই দ্রব্যদানে সন্তুষ্ট করে ঐ পুণ্যের মাধ্যমেই প্রেতকে সন্তুষ্ট করতে হয়। প্রেতযোনির দুঃখদুর্দশা দূর করবার এই উপায় আমরা হিন্দুদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যেও দেখি। প্রেতলোকের দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের যে গল্প ও বর্ণনা পেতবত্থুতে আছে, তা'র উদ্দেশ্য হ'ল যাতে বুদ্ধ-শিষ্যরা ঐ যন্ত্রণা ও অবস্থার ভয়াবহতা সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে সত্য ও ধর্মের পথ

থেকে ভ্রষ্ট না হ'ন, যাতে তাঁরা কায়মনোবাক্যে জীবজগতের প্রতি শুভ আচরণ করেন[৬১]।

চারভাগে বিভক্ত পেতবত্থুতে ৫১টি গাথা আছে। এই গ্রন্থটিরও সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নেই।

৮। থেরগাথা

পরবর্তী গ্রন্থ থেরগাথা (স্থবির-) বৌদ্ধ-থেরদের দ্বারা রচিত গাথার সংকলন-গ্রন্থ। জ্ঞানবৃদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থের বা স্থবির বলা হয়। ১২৭৯টি গাথার সমন্বয়ে গঠিত ১০৭টি কবিতায় থেরদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এক একটি কবিতা যদিও এক একজন থের-র নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, তবু মনে হয় কোন কোন কবিতায় গাথাগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা। রচনার মধ্যে বৈচিত্র্য ও সজীবতা আছে।

এই গাথাগুলিতে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের অভিজ্ঞতা সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁরা প্রকৃতির যে ছবি মাঝে মাঝে এঁকেছেন তাতে তাঁদের অসামান্য কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের মত এই গ্রন্থেও বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা আছে কিন্তু কোথাও এই তাত্ত্বিক আলোচনা নীরস ও বৈচিত্র্যহীন হয় নি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ বর্জন করে, বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে সন্ন্যাসীরা যে মানসিক প্রশান্তি লাভ করেছেন তা' যে সকলের উপরে, গাথাগুলিতে তা' বারবার বলা হয়েছে। মেত্তা, অহিংসা, সংযম, করুণা প্রভৃতি আদর্শগুলির শ্রেষ্ঠত্ব ধম্মপদ ও সুত্তনিপাতের মত এখানেও প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সন্ন্যাসীরা কী করে সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধের উপদেশ বরণ করলেন সেই সব ব্যক্তিগত কাহিনীর বর্ণনাও সুন্দরভাবে করা হয়েছে। থেরগাথায়[৬২] কোথাও কোথাও স্ত্রীলোককে বন্ধন, ফাঁদ, সাধনার পথে বাধা ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্ত্রীজাতিই এঁদের মতে সর্বদুঃখের আকর এবং এদের মোহজাল ছিন্ন করতে পারলে সুখের পথের সন্ধান করা যায়। থেরদের এই সমস্ত গাথায় বেশী প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের মনের ভাব, অন্তরের অনুভূতি, অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতা ও চেতনার কথা; ব্যক্তিগত কাহিনী ও

অন্যান্য ঘটনার সমাবেশ কিছু কিছু থাকলেও বাহ্য বা বহির্জাগতিক অভিজ্ঞতার কথা এখানে খুব বেশী বলা হয়নি। তালপুট, অঙ্গুলিমাল প্রভৃতি থের-দের নামে চিহ্নিত গাথাগুলি অপূর্ব কাব্য প্রতিভার নিদর্শন।

থেরগাথাতে প্রকৃতির যে বর্ণনা আছে তাতে তাঁদের প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা তাঁদের উপমা হিসেবেও অধিকাংশ স্থানে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিষয়গুলিকে ব্যবহার করেছেন। সন্ন্যাসীকে অচল শৈল ও হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কোথাও বলা হয়েছে জিতেন্দ্রিয় ভিক্ষু আপন গুহায় অবস্থিত সিংহ সদৃশ। আবার, যে ভিক্ষু কেবলমাত্র তার সন্ন্যাসীর পোষাক সম্বন্ধেই সচেতন তাকে ব্যঙ্গ করে সিংহচর্মাবৃত বানরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কোন কোন জায়গায় থের-দের ভিক্ষু অপেক্ষা কবি-রূপই বেশী প্রকটিত হয়েছে। পাহাড়-জঙ্গলের সুন্দর পটভূমিতে নির্জনে সাধককে তপস্যায় নিরত দেখলে মন আমাদের অপূর্ব অনুভূতিতে ভরে ওঠে। ঘনকৃষ্ণ মেঘের মধ্যে প্রবল বজ্রনির্ঘোষ ও বারিপাতের পরিবেশে অপূর্ব প্রশান্তিতে সাধককে যখন তার গুহায় স্থির ভাবে বসে থাকতে দেখি তখন আমাদের রোমাঞ্চ হয়। গাথাগুলিতে থের-দের কবিত্বের সঙ্গে ধর্মশীলতার পরিচয় আছে। বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য ও সারমর্ম এবং নৈতিক উন্নতি সম্পন্ন বৌদ্ধভিক্ষুদের পারমার্থিক ভাবধারা প্রচারই সংকলনটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

কাব্যগ্রন্থ হিসেবে থেরগাথা ভারতীয় গীতি-কবিতার (*lyric poem*) প্রথম সারির একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত ভাষা সব জায়গায় সহজবোধ্য নয়। থেরবাদী বৌদ্ধধর্মর প্রথম দিকে কী রূপ ছিল তার পরিচয় পেতে হ'লে সুত্তন্ত, ধম্মপদ ও সুত্তনিপাতের সঙ্গে থেরগাথারও আলোচনা আবশ্যক।

গ্রন্থটিতে এমন কিছু কিছু অংশ আছে যা নিশ্চিতভাবেই বেশী প্রাচীন নয়। একটি ফুল দান করার মত সৎ কার্য অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যখন একজন ভিক্ষুর 'নির্বাণ' প্রাপ্তি ঘটে অথবা যখন সাত বছরের এক সন্ন্যাসীকে নানা অলৌকিক কাজ করতে দেখি তখন এই সংকলনে যে বেশ পরবর্তীকালের কিছু অংশ ঢুকে পড়েছে তা' স্বীকার না করে উপায় নেই। বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যদের দ্বারা রচিত প্রাচীন অংশও এর মধ্যে আছে।

৯। থেরীগাথা

নবম গ্রন্থ থেরীগাথার মধ্যে বৌদ্ধ থেরীদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লিপিবদ্ধ আছে। অধিকাংশ ভাবে থেরগাথার অনুরূপ এই সংকলনে ৫২২টি গাথার সমন্বয়ে ৭৩টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত। থেরগাথার সঙ্গে এই গ্রন্থের প্রধান পার্থক্য হ'ল প্রথমোক্ত গ্রন্থে যেমন ভিক্ষুদের অনুভূতি ও অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে, এই গ্রন্থে তেমন না হয়ে ভিক্ষুণীদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। স্থবিরদের গাথাগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনার বর্ণনা যেমন আমাদের পুলকিত করে, এখানে মানুষের জীবন-বর্ণনা তেমনই আমাদের মানুষের জীবন সম্বন্ধে অবহিত করে। গীতিকাব্য হিসেবে এই গ্রন্থটিকেও ভারতীয় গীতি-কাব্য সাহিত্যে প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া যায়। রচনাশৈলী এবং প্রাচীন ও পরবর্তী অংশ নিয়ে কবিতাগুলির গঠন প্রকৃতিতেও সংকলনটি থেরগাথার অনুরূপ।

সে যুগের সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান নির্ণয় করার পক্ষে এই সংকলনটির গুরুত্ব অপরিসীম। থেরগাথার মত এই গ্রন্থেও সেকালের সামাজিক অবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার একটি আভাস আমরা পাই। সংসার জীবন ত্যাগ করে থেরী-রা কেন বুদ্ধের শরণ নিলেন তা' এই গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় বেশ ভালভাবে বলা হয়েছে। পুত্রশোকাতুরা জননী শান্তি পেয়েছেন সঙ্ঘের আশ্রয়ে, অভাবের তাড়নায় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে বিধবা রমণী শান্তির সন্ধানে ভিক্ষুণী হয়েছেন, সুন্দরী ও যুবতী বারবণিতা বিষয়-বাসনা ও ভোগের ভয়াবহ পরিণতি বুঝতে পেরে বুদ্ধ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেছেন, এইরূপ নানা চিত্র আমরা এই গ্রন্থে দেখতে পাই। বুদ্ধের উপদেশ আশ্রয় করতে সঙ্কল্প করেছেন এমন কন্যাকে আত্মীয়রা নিবৃত্ত করতে চেয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন, আর ধনাঢ্য যুবক বা রাজপুত্র সুন্দরী কন্যার অভিভাবককে বহু ধনদৌলত উপঢৌকন দিয়ে কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছেন কিন্তু কন্যাটি সব উপরোধ প্রত্যাখ্যান করে বুদ্ধ-শাসন অবলম্বন করছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। কিসা-গোতমী একজন নিষ্ঠাবতী ও ভক্তিপরায়ণা থেরী। তিনি সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন যখন সংসারে তাঁর আপন বলতে কেউ ছিলনা।

এক করুণ ও বিয়োগান্ত ঘটনার বর্ণনা করে তিনি বলছেন বুদ্ধের আশ্রয়ে তিনি সব শোক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। একদা প্রসিদ্ধা বারবণিতা নর্তকী অম্বপালী তাঁর যৌবনের অসামান্য রূপলাবণ্যে জরার অব্যর্থ প্রকোপ লক্ষ্য করে যৌবনের ক্ষণস্থায়িত্ব উপলব্ধি করলেন ও বুদ্ধের উপদেশ পালন করে শান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করলেন।

বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার নানা তাত্ত্বিক আলোচনা এই গ্রন্থেও পাওয়া যায়। নির্বাণের প্রকৃতি সম্বন্ধে থেরীদের ধারণা এই সংকলনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক[৬৩]। থেরী-রা মনে করতেন লোভ এবং 'প্রমত্ততা' থেকে মুক্তিলাভই নির্বাণ; নির্বাণের সাহায্যেই কেবল সংযত জীবন যাপন, অন্তর্দৃষ্টিলাভ, পরম শান্তি অর্জন এবং শ্রেষ্ঠ সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব।

ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিক উপদেশের দিক থেকে এবং বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য ও সারমর্ম প্রচারের ব্যাপারে থের- ও থেরীগাথায় কোন প্রভেদ নেই। থেরীগাথার অধিকাংশই যে স্ত্রীলোকের রচনা এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ নেই। থেরগাথার মধ্যে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বতের যে বর্ণনা দেখা যায় থেরী-গাথার মধ্যে তা' বিশেষভাবেই অনুপস্থিত। গাথাগুলি থেরীদেরই রচনা বলে তাঁদের অভিজ্ঞতা বা জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁরা এমন কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা করেন নি যে সম্বন্ধে তাঁদের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়[৬৪]।

১০। জাতক

খুদ্দক নিকায়ের অন্যতম মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল এর দশম গ্রন্থ জাতক। প্রাচীন ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ও ধর্মীয় ইতিহাসের মূল্যায়ন করতে হ'লে জাতকের সাহায্য অপরিহার্য।

'জাতক' শব্দের অর্থ যে 'জাত' বা 'জন্মলাভ করেছে'—কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যে শব্দটি গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের পূর্বোল্লিখিত নবাঙ্গ-বিভাগের অন্যতম অঙ্গও 'জাতক'।

বৌদ্ধরা মনে করেন যে বুদ্ধ হওয়ার আগে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় কোটিকল্প

কাল বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করে, দান-শীল প্রভৃতি দশপারমিতায় পারদর্শী হয়ে যিনি বুদ্ধ হ'বেন তাঁকে চরিত্রের চরমোৎকর্ষ লাভ করতে হ'বে। তখনই বোধিসত্ত্ব পূর্ণপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হ'য়ে বোধিলাভ করেন বা অভিসম্বুদ্ধ হ'ন। 'জাতক গ্রন্থে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় গৌতম বুদ্ধের বিভিন্ন জন্মের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই আখ্যানগুলিতে কোথাও তিনি ঘটনার প্রধান চরিত্র, কখনও তিনি ঘটনার পর্যবেক্ষক আবার কোনও স্থানে তাঁর ভূমিকা গৌণ।

জাতকত্থবণ্ণনা

আমরা খুদ্দক নিকায়ে 'জাতক' নামে পরিচিত পাঁচ 'অঙ্গ' যুক্ত গদ্যে ও পদ্যে লেখা যে সমস্ত কাহিনী পাই সেগুলি মূল জাতকের প্রাচীন রূপ নয়। মূল জাতক কেবল গাথায় রচিত এবং গাথাগুলি ২২টি 'নিপাতে' বিভক্ত। একটি নিপাতে সেই ক'টি গাথাই নেওয়া হয়েছে যার সমন্বয়ে একটি 'জাতক' সম্পূর্ণ হয়। এই দিক দিয়ে মূল জাতকে কোন গদ্যাকার আখ্যানাংশ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র গাথার সাহায্যে কোন কাহিনীর বক্তব্য বুঝতে পারা কঠিন মনে হওয়ায় কালক্রমে গদ্যে লেখা আখ্যান-রূপ অঙ্গের প্রয়োজন দেখা দিল। এই ভাবে গাথার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যের কাহিনীগুলিও প্রচলিত হ'য়ে 'জাতকত্থ-বণ্ণনা'র উৎপত্তি হ'ল। আমরা বর্তমানে এই জাতকত্থবণ্ণনার মধ্যেই মূল জাতকগুলি পাই। কাহিনীগুলি পরবর্তীকালের রচনা আর 'গন্ধবংস' নামক গ্রন্থের মতে৬৫ প্রসিদ্ধ পালি-টীকাকার আচার্য বুদ্ধঘোষ এই জাতকত্থবণ্ণনার গ্রন্থকর্তা। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর বুদ্ধঘোষ আদৌ এই গ্রন্থের রচয়িতা হ'তে পারেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ভারহুত ও সাঁচীর স্তূপ-প্রাচীরে উৎকীর্ণ শিলাচিত্রের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি গদ্যে রচিত আখ্যানাংশ সহ কোন কোন জাতক খৃ: পূ: দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। কোন কোন স্তূপ-চিত্রের পাশে জাতকের নামও উৎকীর্ণ দেখা যায়। জাতকের সংকলন-কার্যের সময় আমরা স্থিরভাবে বলতে না পারলেও স্তূপ-চিত্রগুলির ভিত্তিতেই বলা যায় যে খৃ: পূ: দ্বিতীয় শতকে জাতক-কাহিনীগুলি বোধিসত্ত্ব-কাহিনীরূপে জনসমাজে পরিচিত ছিল। কতকগুলি

গাথা বৈদিক সময়ের রচনা এবং কতকগুলিকে মহাকাব্যের প্রাথমিক স্তর বলে মনে করা যায়।৬৬

সুত্তপিটকের অন্যান্য নিকায়ে এবং বিনয়পিটকের মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গে জাতক-কাহিনীর প্রাচীনতর রূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। ঐ সব জায়গায় বোধিসত্ত্ববর্জিত পশুপক্ষীর গল্প এবং পৌরাণিক ও নীতিমূলক কাহিনী ছাড়া এমন আখ্যায়িকাও পাওয়া যায় যার মধ্যে কোন প্রধান চরিত্রের সঙ্গে বুদ্ধকে অভেদ করে দেখানো হয়েছে। এই পর্যায়ে মহাবগ্‌গে দীঘায়ুকুমার কথা, দীঘ নিকায়ের কূটদন্ত ও মহাসুদস্‌সন সুত্তগুলির নাম করা যায়। কয়েকটি ছাড়া এই আখ্যানগুলির বেশীর ভাগই পূর্ণাঙ্গ জাতক রূপে 'জাতকত্থবণ্‌ণনা'র অন্তর্ভুক্ত। এদের সাধারণতঃ 'সুত্তন্তজাতক' বলা হয়। নবাঙ্গ-শাসনের 'জাতক' অঙ্গটি বোধ হয় নিকায় প্রভৃতির অন্তর্গত জাতক-সদৃশ কাহিনীগুলিকেই নির্দেশ করে।

জাতকের সংখ্যা

প্রসিদ্ধ মহাযানী গ্রন্থ সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের মতে৬৭ বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের সূত্র, গাথা, পৌরাণিকী কাহিনী অথবা জাতকের সাহায্যে বিভিন্ন উপায়ে উপদেশ দিতেন। এর থেকে মনে হয় তাঁর পরবর্তীকালে বুদ্ধ-শিষ্যরাও এই পন্থাতেই ধর্মের ব্যাখ্যান করতেন। এইভাবে নতুন নতুন কাহিনীর উদ্ভব হয়ে 'জাতকে'র কলেবর বৃদ্ধি করা অসম্ভব নয়। জাতকগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ মতপার্থক্য দেখা যায়। 'চুল্লনিদ্দেস' জাতকের সংখ্যা পাঁচশত বলে উল্লেখ করে এবং চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণীতেও জাতকের সংখ্যা পাঁচশত বলা আছে। Fausböll সম্পাদিত 'জাতক' গ্রন্থে মোট ৫৪৭টি জাতক পাওয়া যায়, আর, বুদ্ধঘোষ বলেছেন জাতকের সংখ্যা ৫৫০।

মূল্য

প্রাচীনত্ব ও সংখ্যার দিক দিয়ে যত মতপার্থক্যই থাক এবং উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যেভাবেই হোক্‌, 'জাতক'-কাহিনী বলতে বর্তমানে আমরা যে সংকলন-গ্রন্থটি বুঝি তার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য আজ স্বীকৃত।

শিল্পের উপাদান হিসেবেও যে এগুলি প্রাচীনকালে স্বীকৃতি পেয়েছিল তার প্রমাণ পূর্বে উল্লিখিত স্তূপ-চিত্রগুলি। বোধগয়া, অমরাবতী, শ্যাম, ব্রহ্ম ও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জাতক অবলম্বনে বহু বিশিষ্ট শিল্পকর্ম রচিত হয়েছিল এবং অজন্তার গুহা-চিত্রগুলিতেও জাতক-কাহিনীর প্রভাব সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারেও 'জাতকে'র প্রধান ভূমিকা ছিল।

কর্মবাদ

সমস্ত জাতক-কাহিনীর ভিত্তিই ছিল জনপ্রিয় কর্মবাদ। জাতকে প্রচারিত ধর্মের নৈতিক আদর্শ নির্বাণ-প্রাপ্ত অর্হত্ নন, এখানে আদর্শ হলেন বোধিসত্ত্ব, যিনি বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন শীলধর্মের আচরণ করে ভবিষ্যতে সম্যক্ সম্বুদ্ধ হ'বার যোগ্যতা অর্জন করেন। উচ্চ বা নীচ যে বংশেই বোধিসত্ত্বের জন্ম হোক্ না কেন জাতক-কাহিনীতে তাঁকে আমরা কারুণিক, আত্মোৎসর্গকারী, সাহসী, অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন ইত্যাদি রূপে চিত্রিত দেখি। পরের প্রাণরক্ষার জন্য স্বীয় চক্ষু-উৎসর্গকারী শিবিরাজা বা দুষ্ট ব্রাহ্মণের জন্য সন্তান-দানকারী রাজকুমার বেস্সন্তর জাতক-কাহিনীর নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বৈশিষ্ট্য

জাতক-কাহিনীর রচনায় আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। প্রত্যেক জাতকে পাঁচটি অংশ আছে। জাতক-কাহিনীর প্রারম্ভে বলা হয় বুদ্ধ কোথায় এবং কোন্ প্রসঙ্গে জাতকটির বর্ণনা করেছিলেন। এই অংশের নাম 'পচ্চুপ্পন্ন (প্রত্যুৎপন্ন) বত্থু' বা বর্তমান কাহিনী। তার পর বলা হয়েছে বুদ্ধের অতীত জন্ম কাহিনী। এই অংশের নাম 'অতীত বত্থু' এবং এই হ'ল প্রকৃত 'জাতক-কাহিনী'। অধিকাংশ জাতকের এই অংশ "অতীতকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করিবার সময়" এইরূপ বাক্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। গদ্য-পদ্যমিশ্রিত এই অতীতবত্থুর পদ্যাংশকে 'গাথা' বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম অংশেও আমরা 'গাথা' দেখতে পাই। গাথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টীকার নাম 'বেয্যাকরণ' বা ব্যাকরণ অর্থাৎ

বিবৃতি বা ব্যাখ্যা। জাতকের শেষ অংশে আছে উপসংহার যাকে 'সমোধান' বা সমবধান বলা হয়। এই অংশে অতীতবস্তুতে বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নবস্তুর ব্যক্তিদের অভিন্নতা দেখানো হয়।

নিদানকথা

জাতকত্থবণ্ণনার সূচনায় মুখবন্ধ স্বরূপ আর একটা অংশ দেখা যায়। এই প্রারম্ভিক অংশের নাম 'নিদানকথা'। নিদানকথা তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, যথা-'দূরে নিদান', 'অবিদূরে নিদান' এবং 'সন্তিকে নিদান'। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় গৌতমের সুমেধ ব্রাহ্মণ রূপে জন্মগ্রহণ ও তারপর তুষিত-স্বর্গে তাঁর উৎপত্তি পর্যন্ত ঘটনা সমূহ প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত। তুষিত-স্বর্গ-চ্যুত শুদ্ধোদন-পুত্র সিদ্ধার্থের বোধিবৃক্ষমূলে বোধিলাভ পর্যন্ত ঘটনাবলী 'অবিদূরে নিদানে'র অন্তর্গত। তৃতীয় পরিচ্ছেদ বা 'সন্তিকে-নিদান' অংশে বুদ্ধ-জীবনীর অন্যান্য ঘটনাসমূহ বিবৃত হয়েছে।

নানা দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে 'জাতক'-কে ভারতীয় সমাজে ও সাহিত্যে মহাভারতের তুল্য স্থান দেওয়া উচিত[৬৮]। জাতকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়[৬৯], তত বৈচিত্র্য মহাভারত ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় গ্রন্থে বোধহয় পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে পশুপক্ষীর কাহিনীর মধ্য দিয়ে লৌকিক জ্ঞান প্রচার করা হয়েছে, জনপ্রিয় উপকথা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এমন বহু উপকথা এই গ্রন্থে আছে যার সঙ্গে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের কোন সংস্রব নেই। বহু ছোট ছোট সরস কাহিনী ও আখ্যান জাতকে আছে যার মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই। উপন্যাসের মত বড় কাহিনী, নীতি-ধর্মজ্ঞাপক কাহিনী, সদুক্তি ও সৎ উপাখ্যান প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের সমাবেশ সংকলনটিকে নানা ভাবে আকর্ষণীয় ও মূল্যবান করে তুলেছে।

১১। নিদ্দেস

সুত্তনিপাতের অন্তর্গত অট্ঠক-ও পারায়ণবগ্গের বত্রিশটি সুত্তের বিশদ ব্যাখ্যাই হ'ল পরবর্তী গ্রন্থ নিদ্দেস। মহানিদ্দেস ও চুল্লনিদ্দেস এই দুই

ভাগে গ্রন্থটি বিভক্ত। প্রথমটিতে আছে অট্ঠক বগ্গের ব্যাখ্যা এবং খগ্গবিসাণ সুত্ত ও পারায়ণবগ্গের ব্যাখ্যা দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত। এই দুই খণ্ডকে দুটি বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে কখনও কখনও খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থ সংখ্যা ষোল করা হয়েছে[৭০]। নিদ্দেস প্রসিদ্ধ বুদ্ধ-শিষ্য সারিপুত্ত (শারিপুত্র) রচিত টীকা গ্রন্থ বলেও মনে করা হয়[৭১]।

এই গ্রন্থে উপরোক্ত সুত্তগুলির প্রতিটি শব্দ ধরে তার ব্যাকরণ ও অভিধানগত ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তত্ত্বসংক্রান্ত উপদেশও আছে। বৌদ্ধতত্ত্বের পটভূমিকায় বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রগ্রন্থের উদ্ধৃতির সাহায্যে অর্থ বোঝানো হয়েছে। একটি শব্দের অনেকগুলি করে প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে এবং যতবার শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে ততবারই ঐ শব্দতালিকা দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় বার বার আবৃত্তি করার ফলে শব্দ ও প্রতিশব্দগুলি যাতে ভাল ভাবে আয়ত্ত হয়ে যায়।

এরূপ একটি টীকাগ্রন্থকে কেন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল এ প্রশ্ন উঠতে পারে। টীকা গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ এটি নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়[৭২]। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটি পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি প্রাচীনকালে পাঠের সময় শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা কীভাবে করা হ'ত।

এই গ্রন্থের শব্দ-তালিকা পরবর্তীকালের কোষ-গ্রন্থগুলির ভিত্তি বলে অনেকে মনে করেন[৭৩]।

১২। পটিসম্ভিদামগ্গ

দ্বাদশ গ্রন্থ পটিসম্ভিদামগ্গে সম্পূর্ণরূপে অভিধম্মপিটকের রীতিতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়গুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে। সুত্তপিটকের সুত্তগুলির প্রারম্ভে যেমন 'এবং মে সুতং' বাক্যটি থাকে, এই গ্রন্থের অধিকাংশ সুত্তই সেই ভাবে আরম্ভ করা হয়েছে এবং 'ভিক্খবে' এই সম্বোধন পদটি ঐ একই ভাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয় গ্রন্থটির এই গঠন রীতির জন্যই একে অভিধম্মপিটকের মধ্যে না ধরে সুত্তপিটকের অন্তর্গত করা হয়েছে[৭৪]।

'পটিসম্ভিদা' অর্থাৎ বিশ্লেষণ, বিশ্লেষণমূলক অন্তর্দৃষ্টি বা জ্ঞান চার রকমের বলে উল্লিখিত হয়েছে,[৭৫] অত্থ-, ধম্ম-, নিরুত্তি-, ও পটিভান পটিসম্ভিদা। পটিসম্ভিদামগ্‌গ বা বিশ্লেষণের মার্গ তিনটি বড় অধ্যায় বা বগ্‌গে বিভক্ত, যথা, মহাবগ্‌গ, যুগনন্ধবগ্‌গ ও পঞ্‌ঞাবগ্‌গ। প্রত্যেক বর্গে দশটি পরিচ্ছেদ আছে এবং বৌদ্ধ-তত্ত্বের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই পরিচ্ছেদগুলির আলোচ্যবস্তু। প্রথম বর্গের প্রথম পরিচ্ছেদে ৭৩ প্রকার জ্ঞানের কথা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সত্তি, সপ্তম পরিচ্ছেদে কর্মবাদ আলোচনা করা হয়েছে। এই ভাবেই দ্বিতীয় বর্গে চতুরার্যসত্য, মৈত্রী প্রভৃতি এবং তৃতীয় বর্গে যোগীদের অলৌকিক শক্তির কথা বলা হয়েছে।

১৩। অপদান

অপদান (অবদান) খুদ্দক নিকায়ের পরবর্তী গ্রন্থ। অপদান বা অবদান কথার অর্থ হ'ল 'উল্লেখযোগ্য কার্য, মহৎ কার্য, প্রশংসনীয় কার্য' ইত্যাদি। জাতকের সমগোত্রীয় অপদান প্রকৃতপক্ষে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের কীর্তিকলাপ সমন্বিত ঐতিহ্যমূলক জীবনীগ্রন্থ। গ্রন্থটি 'জাতকে'র মতই বিরাট এবং বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, যদিও সাহিত্যিক মর্যাদায় 'জাতক' উচ্চস্তরের।

জাতক ও অপদান

জাতকের মত অপদানেও বর্তমান কাহিনী, অতীত কাহিনী ও একটি নীতি আছে। প্রধান ও একমাত্র পার্থক্য হ'ল 'জাতক' কাহিনী গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বিবৃত করে আর 'অপদান' কাহিনী কোন একজন সাধক বা অর্হতের জন্মান্তরের কথা বলে। সম্পূর্ণরূপে গাথায় রচিত অপদান খুব প্রাচীনকালের রচনা বা সংকলন বলে মনে হয় না। সংস্কৃত 'অবদান' সাহিত্যের সঙ্গে এর বিশেষ যোগ আছে।

গৌতম বুদ্ধের কিছু কাহিনী অপদানের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও এর অধিকাংশ হ'ল স্থবিরদের কাহিনী। স্থবিরদের কাহিনীগুলিকে ৫৫টি বর্গে ভাগ

করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বর্গে দশটি করে কাহিনী আছে। শেষাংশে থেরীদের কাহিনী আছে এবং এই কাহিনীগুলি চারটি বর্গে বিভক্ত। এখানেও প্রত্যেক বর্গে দশটি করে কাহিনী পাওয়া যায়। প্রথমটির নাম 'থের-অপদান' এবং শেষোক্তটির নাম 'থেরী-অপদান'। গ্রন্থটিতে ৫৫০ জন থের এবং ৪০ জন থেরীর কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম 'অপদান' হ'ল 'বুদ্ধাপদান' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'পচ্চেকবুদ্ধাপদান' (প্রত্যেকবুদ্ধ-)। বুদ্ধাপদানে বুদ্ধ নিজেই তাঁর মহিমা বিবৃত করেছেন এবং দ্বিতীয় অপদান সুত্তনিপাতের খগ্‌গবিসান সুত্তের পুনরুক্তি মাত্র।

১৪। বুদ্ধবংস

খুদ্দকনিকায়ের পরবর্তী গ্রন্থ বুদ্ধবংস। সম্পূর্ণরূপে গাথায় রচিত বুদ্ধবংসে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর পূর্ববর্তীরূপে উক্ত ২৪ জন বুদ্ধের জীবন কাহিনী ও ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। ঐ ২৪ জন বুদ্ধ হ'লেন দীপঙ্কর, কোন্দঞ্‌ঞ, মঙ্গল, সুমণ, রেবত, সোভিত, অনোমদস্‌সী, পদুম, নারদ, পদুমুত্তর, সুমেধ, সুজাত, পিয়দস্‌সী, অত্থদস্‌সী, ধম্মদস্‌সী, সিদ্ধত্থ, তিস্‌স, ফুস্‌স, বিপস্‌সি, সিখি, বেস্‌সভু, ককুসন্ধ, কোনাগমন ও কস্‌সপ। দীঘ নিকায়ের মহাপধান সুত্ত এবং আটানাটীয় সুত্তে শেষোক্ত ছ'জন বুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌতমবুদ্ধ ২৫ তম বুদ্ধরূপে চিহ্নিত।

ভগবান্ বুদ্ধ তাঁর বাইশ হাজার আত্মীয়-স্বজন ও অসংখ্য কোটি দেব-মনুষ্যকে 'রাগ'-মুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং এই গ্রন্থ ব্যাখ্যান করেন[৭৬]। গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় তিন ভাগে বা 'নিদানে' ভাগ করা যায়। দীপঙ্কর বুদ্ধের নিকট বুদ্ধ হ'বার সংকল্প থেকে শুরু করে তুষিত লোকে গৌতমের জন্মগ্রহণ পর্যন্ত অংশকে 'দূরে নিদান' অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বোধিবৃক্ষ মূলে বোধিলাভ পর্যন্ত তৎপরবর্তী ঘটনা 'অবিদূরে নিদান' এবং বোধিলাভের পর থেকে পরিনির্বাণ পর্যন্ত 'সন্তিকে নিদান'।

২৫জন বুদ্ধের কাহিনী এই গ্রন্থে ২৫টি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে এবং এর পূর্বে একটি প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদও আছে। শেষ পরিচ্ছেদে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মেত্তেয় (মৈত্রেয়) উল্লিখিত হয়েছেন।

পূর্ববর্তী ২৪ জন বুদ্ধের কাহিনী বিবৃত করার প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধ বলেছেন ঐ বুদ্ধদের সময় তিনি কে ছিলেন, কীভাবে তিনি ঐ বুদ্ধদের পূজা করতেন এবং তাঁর বুদ্ধত্বলাভ সম্বন্ধে তাঁরা কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

গ্রন্থটিতে বুদ্ধপূজা ও বুদ্ধকে দেবতার স্তরে উন্নীত করার বিষয় বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি যে বুদ্ধবংস ত্রিপিটকের রচনাকালের শেষ স্তরের একটি গ্রন্থ।

১৫। চরিয়াপিটক

খুদ্দকনিকায় তথা সুত্তপিটকের শেষ গ্রন্থ চরিয়াপিটক। সম্পূর্ণরূপে গাথায় রচিত এই গ্রন্থে ৩৫টি জাতকের কাহিনী বলা হয়েছে। গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হ'ল বোধিসত্ত্বরূপে জন্মজন্মান্তরে গৌতম বুদ্ধ যে 'পারমিতা'গুলি অর্জন করেছিলেন সেইগুলির কথা বলা। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ এই কাহিনীগুলি বিবৃত করেছিলেন বলে গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে।

এই গ্রন্থে বর্ণিত জাতকগুলি 'জাতকে'র অন্তর্ভুক্ত কাহিনীগুলিরই অনুরূপ। কেবল পারমিতার 'চর্যা' বর্ণনার উদ্দেশ্য নিয়ে কাহিনীগুলি রচিত হওয়ার জন্য এতে সাহিত্যিক বা কাব্যসৌন্দর্য একরকম অনুপস্থিত। 'জাতক' কাহিনী নিয়ে গ্রন্থটি রচিত হলেও জাতকের সঙ্গে চরিয়াপিটকের সম্বন্ধ নির্ণয় করা সম্ভব নয় কারণ জাতকের মূল বা প্রাচীনরূপ এখনও নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

গ্রন্থটি অশোকের পরবর্তী যুগে কোন নিষ্ঠাবান ভিক্ষু পারমিতার 'চর্যা' (চরিয়া) ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে রচনা করেন বলে মনে হয়। গ্রন্থের গাথাগুলি অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত এবং ভাষা ও রচনাশৈলী ধম্মপদের মতই সহজ ও সরল। গ্রন্থটি প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিতে আনন্দ বিবৃত করেন এবং উপস্থিত ৫০০ জন অর্হত্ আবৃত্তি করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে[৭]।

১। Sumaṅgala Vilāsinī (P. T. S.) p. 19 ; ২। Winternitz, HIL, II. p 34, f. n. 1. ৩। Rhys Davids, Pali Dictionary, p 362 ; ৪। Geiger, PLL, p 16 ; ৫। Sum. V., p 23 ; ৬। Winternitz, HIL, II, p 37 ; B. C. Law, HPL, I, p 82 ; ৭। CV. XI. I. 8 ;

৮। জীবক ছিলেন বিম্বিসারের প্রখ্যাত রাজবৈদ্য। বুদ্ধের গৃহীশিষ্য রূপে তিনি সারাজীবন বুদ্ধ এবং সংঘের সেবা ও চিকিৎসা করেন। তিনি তাঁর একটি বাগান বুদ্ধের সেবায় উৎসর্গ করেন। এটি 'জীবকের আম্রবন' নামে পরিচিত। ৯। অ-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মশিক্ষকদের সাধারণ ভাবে এইরূপে অভিহিত করা হয়! ১০। এঁরা হলেন, পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বলিন্, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত। এঁদের মত ও আদর্শের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য B. M. Barua, A Pre-Buddhistic Indian Philosophy গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। ১১। Rhys Davids, Dialogues etc. SBB II.; ১২। Winternitz, ঐ, p 37; ১৩। Winternitz, ঐ, p 39; ১৪। ঐ
১৫। Winternitz. ঐ, p 41; ১৬। Winternitz, ঐ, pp 38-39; ১৭। B. C. Law, ঐ, p 129; ১৮। Winternitz, ঐ, p 56; ১৯। Winternitz. ঐ, p 59; ২০। Winternitz, ঐ, p 58; ২১। Winternitz, ঐ, p 61; ২২। Bhābrū Edict; ২৩। AN. IV. 163; ২৪। B. C. Law, ঐ, p 192; ২৫। দ্রঃ পৃঃ 88; ২৬। SN. IV; ২৭। Winternitz, ঐ, p 68; ২৮। ঐ, 69; ২৯। ঐ; ৩০। ঐ, 70; ৩১। ঐ, 76; ৩২। N. Dutt, J. N. Banerjee Vol., p 119; ৩৩। Winternitz, ঐ, 76-79; ৩৪। SN. XX. 7; AN. IV. 160; ৩৫। Winternitz, ঐ, 77; ৩৬। ঐ, 98; ৩৭। Woodward এটিকে 'Buddhist Layman's Prayer Book' রূপে অভিহিত করেছেন, (Some Sayings of the Buddha, p 153); ৩৮। Winternitz, ঐ, 80; ৩৯। M P, P 150; ৪০। প্রব্রজ্যা নিয়ে কিছুদিন শ্রমণরূপে জীবন যাপনের পর উপযুক্ত বয়সে উপসম্পদা দেওয়া হ'ত। দ্রঃ অনুকূল বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, পৃঃ ৩২-৩৩; ৪১। Radhakrishnan (Ed.), Dhammapada, p 1; ৪২। Winternitz, ঐ, p 83; ৪৩। Winternitz, ঐ, p 84; ৪৪। Brough, (Ed.), Gāndhārī Dhammapada, p 31; ৪৫। ঐ, 35; ৪৬। ঐ, 13; ৪৭। ঐ, 41: ৪৮। Barua & Mitra (Ed.), Prakrit Dharmapada, Intro. xivi; ৪৯। Brough, ঐ, 35;

৫০। ঐ, 41 ; ৫১। ঐ, 42 ; ৫২। Barua & Mitra, ঐ ; ৫৩। Brough ঐ, 23 ; ৫৪। ঐ, 29 ; ৫৫। ঐ, 27 ; ৫৬। MP, p 5 ; ৫৭। Barua & Mitra, ঐ ; ৫৮। Brough, ঐ, 26 ; ৫৯। Winternitz, ঐ, 98 ; ৬০। B. C. Law, ঐ, 258-60 ; ৬১। দ্রঃ B. C. Law, Heaven & Hell in Bud. Perspective ; ৬২। No. 267, 453 etc. ৬৩। B. C. Law, ঐ, 266 ; ৬৪। Winternitz, ঐ, 102 ; ৬৫। ঐ, 117 ; ৬৬। ঐ, 123 ; ৬৭। ঐ, 114 ; ৬৮। ঐ, 122 ; ৬৯। ঐ, 125 ; ৭০। দ্রঃ পৃঃ ৫৮ ৭১। B. C. Law, ঐ, 277 ; ৭২। Winternitz, ঐ, 156 ; ৭৩। ঐ, 157 ; ৭৪। ঐ, 157 ; ৭৫। Rhys Davids, Pali Dictionary, p 400 ; ৭৬। B. C. Law, ঐ, 286 ; ৭৭। ঐ, 290.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অভিধম্মপিটক

অভিধম্মপিটকের বিষয়বস্তু

পালি বৌদ্ধশাস্ত্রের তৃতীয় ও শেষ অঙ্গের নাম অভিধম্মপিটক। বুদ্ধের প্রজ্ঞাবিষয়ক শিক্ষা অভিধম্মপিটকে সংগৃহীত। এই পিটকের আলোচ্য বিষয়বস্তুতে নিপুণ হ'লে প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় এবং চার প্রকার 'পটিসম্ভিদা'[১] অর্থাৎ 'প্রতিসংভেদ' বা প্রভেদজ্ঞান লাভ করা যায়। এই চার প্রকার প্রভেদজ্ঞান হ'ল অর্থসম্পর্কে জ্ঞান, ধর্ম বা হেতুসম্পর্কে জ্ঞান, নিরুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রতিভাযুক্ত জ্ঞান। সুত্তপিটকের ন্যায় এই পিটকও 'চিত্ত' বা মনের উপর নির্ভরশীল।

অভিধম্ম (অভিধর্ম) শব্দটিকে অভি-'ধম্ম' ভাবে গ্রহণ করে এর অর্থ করা হয়েছে 'উচ্চতর ধম্ম' বা 'ধম্মের উচ্চতর সূক্ষ্ম তত্ত্ব'[২]। এই 'ধম্ম'-শিক্ষা যে পিটকের অন্তর্গত তাকে অভিধম্ম পিটক বলা হয়। এই পিটকে বৌদ্ধ অধিবিদ্যা বা metaphysics এর আলোচনা করা হয়েছে এমন কথাও বলা হয়[৩]। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পিটকে ধারাবাহিক কোন দর্শনের আলোচনা নেই এবং metaphysics এর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না[৪]।

সুত্তপিটকে যে 'ধম্ম', তত্ত্ব বা চিত্তবিষয়ক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, এই পিটকে বস্তুতঃ তারই বিশদ ও বিশ্লেষণ মূলক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে 'সুত্ত-' ও 'অভিধম্মে-'কোন পার্থক্য আছে বলা যায় না, পার্থক্য যা' আছে তা' হল পিটক দুটির প্রকৃতিতে। অভিধম্মপিটককে সুত্তপিটকের চেয়ে নীরস, বস্তুবিষয়ক এবং বেশী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা scholastic বলা চলে।

পিটকটির বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা এবং শ্রেণীবিন্যাস পিটকটির একটি বৈশিষ্ট্য। প্রতিশব্দের দীর্ঘ তালিকায় এর ব্যাখ্যাংশগুলি ভারাক্রান্ত, অবশ্য পরিভাষা ও কোষগ্রন্থের দিক থেকে ব্যাখ্যার এই পদ্ধতির কিছু মূল্য আছে। শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রেও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। অনর্থক দীর্ঘ বিবৃতির ফলে আকর্ষণহীন হওয়ায় এই পিটক সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিকভাবে লেখা বলেও কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন[৫]। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে catechism এর আকারে সম্পূর্ণ পিটকটি লেখা হয়েছে।

সুত্তপিটকের পরিপূরক

অভিধম্মপিটক হল সুত্তপিটকেরই পরিপূরক মাত্র এবং এই পিটকে বিধিবদ্ধ-ধারাবাহিক কোন নতুন দার্শনিক চিন্তার খোঁজ করা বৃথা। মজ্‌ঝিম ও অঙ্গুত্তর নিকায়ের বহু সূত্রেই অভিধম্মের সূচনা দেখা যায়। সম্ভবতঃ সুত্তপিটকে আলোচিত দর্শন ও শীলধর্মের যে 'মাতিকা' বা তালিকার কথা বিনয়পিটকে উল্লিখিত হয়েছে, অভিধম্মপিটক সেই 'মাতিকা'রই পরিবর্ধিত রূপমাত্র[৬]। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে সুত্তকেই অভিধম্মের ভিত্তি বলে মনে করা হয়[৭]।

রচনাকাল

অভিধম্মপিটক কোন্ সময় লেখা হয়েছিল এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ আছে। যদিও বুদ্ধঘোষ তাঁর মূল্যবান টীকা গ্রন্থগুলিতে (অট্‌ঠকথা) বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতির বিবরণ প্রসঙ্গে ঐ সময় অভিধম্ম আবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন, তবু প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে অভিধম্ম আলোচিত হয়েছিল এ সিদ্ধান্তে আসার মত কোন যুক্তিসঙ্গত তথ্য আমাদের নেই। আমরা পূর্বেই বলেছি[৮] যে সম্রাট অশোকের সময়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতেই প্রথম অভিধম্মের আলোচনা হয়। জীবদ্দশায় বুদ্ধ 'অভিধম্ম' সম্বন্ধে কোন পৃথক উপদেশনা করেছিলেন বলে মনে হয় না। বিনয়

পিটকে[৯] 'অভিধম্ম' কথার যে উল্লেখ আছে তা' ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যে অর্থে আমরা 'অভিধম্ম' ব্যবহার করে থাকি সেই অর্থে নয়।

'অভিধম্মের' প্রথম প্রচার সম্বন্ধে পালি ঐতিহ্যের নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। তাবতিংস বা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাদের কাছেই বুদ্ধ নাকি প্রথম 'অভিধম্ম' প্রকাশ করেন। সারিপুত্তের কাছে ভদ্দজি (ভদ্রজি) অভিধম্ম শিক্ষা করেন, তারপর গুরু-শিষ্য পরম্পরায় স্থবির রেবত ও অন্যান্য কয়েকজন এই বিদ্যায় প্রাবীণ্য অর্জন করেন। অশোকের সময় তৃতীয় সঙ্গীতিতে অভিধম্ম চূড়ান্ত রূপে প্রকাশিত হয়। থেরবাদীদের ঐতিহ্যানুসারে গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং অভিধম্ম প্রকাশ করেন এবং ধম্মসংগণি, বিভঙ্গ ও পট্‌ঠান প্রভৃতি অভিধম্মপিটকের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলি দ্বিতীয় সঙ্গীতির সময়েই প্রচলিত ছিল। এই সিদ্ধান্ত যে গ্রহণযোগ্য নয় তা' আমরা পূর্বেই বলেছি। কাশ্মীর বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মতে বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত উপদেশ দেন অর্হত্‌ ও বুদ্ধ-শিষ্যরা তাঁর সেই বাণী ও শিক্ষা সংগ্রহ করেই অভিধর্মের সৃষ্টি করেন।

অভিধম্মপিটকের অন্যতম বিশিষ্ট গ্রন্থ 'কথাবত্থু' তৃতীয় সঙ্গীতিতে রচিত হয়েছিল এই ঐতিহ্য গ্রহণ করে গ্রন্থটিকে যদি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের রচনা বলে মনে করা হয় তবে এর প্রাচীনতর গ্রন্থগুলি যে আরও পূর্বের রচনা একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। এই দিক থেকে বিচার করলে আমাদের বলতে হয় যে সুত্তপিটকের সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই ভিক্ষুরা তৎপর হয়ে অভিধম্মপিটকের সংকলন করেন। অভিধম্মপিটককে প্রামাণ্য ও প্রাচীন গ্রন্থ বলে সকল বৌদ্ধসম্প্রদায় স্বীকার করেন না। সৌত্রান্তিক-শাখা এর প্রামাণিকতায় সন্দিগ্ধ এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত সর্বাস্তিবাদ-শাখার সাতটি অভিধর্ম গ্রন্থই থেরবাদী অভিধম্মের সাতটি গ্রন্থের থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক[১০]। কেউ কেউ মনে করেন অভিধম্মপিটকের সংকলন সিংহলে হয়েছিল[১১]।

মূল্য

যে সমস্ত বৌদ্ধসম্প্রদায় অভিধম্মপিটককে শাস্ত্রগ্রন্থ বলে স্বীকার করেন,

তাঁদের কাছে এই পিটক বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত[১২]। মিলিন্দ পঞ্‌হো গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি এত তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধিসম্পন্ন যে তাঁকে 'সুত্ত' উপদেশ না দিয়েই একেবারে অভিধম্মের সাতটি পুস্তক শেখানো যায়। ৯৬১খৃষ্টাব্দের একটি সিংহলী অভিলেখ-এ একটি বিহারের ভিক্ষুদের স্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে অভিধম্মপিটকের প্রবক্তাদের জন্য ১২টি, সুত্তপিটকের শিক্ষকদের জন্য সাতটি এবং বিনয়-পিটক-বিশারদদের জন্য পাঁচটি ঘর (cell) নির্দিষ্ট[১৩]। অভিধম্মের পঠন-পাঠন ব্রহ্মদেশের ভিক্ষুদের মধ্যে এখনও বিশেষ সমাদৃত এবং ঐ দেশে এই বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সিংহল এবং শ্যামদেশেও এর যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং এখনও এই বিষয়ে আগ্রহ বর্তমান।

সপ্তপ্রকরণ

ধম্মসংগণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক, পট্‌ঠানপকরণ এই সাতটি গ্রন্থ অভিধম্মপিটকের অন্তর্ভুক্ত। এই সাতটি গ্রন্থকে একত্রে সত্তপকরণ বা সপ্তপ্রকরণ বলা হয়।

ধম্মসংগণি

অভিধম্মপিটকের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হল ধম্মসংগণি[১৪]। চিত্ত-বিষয়ক পদার্থগুলি বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিন্যাস করে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। 'ধম্ম' অর্থাৎ লৌকিক ও লোকোত্তর পদার্থের গণনা করার জন্যই গ্রন্থটির এইরূপ নামকরণ। ধম্মের ব্যাখ্যানই গ্রন্থটির মুখ্য উদ্দেশ্য, চিত্ত-জগৎ ও বহির্জগতের যাবতীয় বিষয়কে শ্রেণীবিভাগ করে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। কামলোক, রূপলোক ইত্যাদির অবস্থাগুলি সংগ্রহ ও সংক্ষেপ করে এই গ্রন্থে উপস্থাপিত—'কামাবচর রূপাবচরাদিধম্মে সংগহ্য সংখিপিত্বা বা গণয়তি সংখ্যাতি এত্থাতি ধম্মসংগণি'[১৫]। নীতিধর্ম (*ethics*) গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হলেও এটি একটি *manual* বিশেষ এবং বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে। ধম্মসংগণি বহুলাংশে

নীতিধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মনস্তাত্ত্বিক ও মানস-ভৌতিক (psycho-physical) বিশ্লেষণ[১৬]।

রচনাকাল

রচনাকালের দিক থেকে ধম্মসংগণি নিকায়-পরবর্তী যুগেরই রচনা। নিকায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ এই গ্রন্থেও ব্যবহৃত এবং নিকায়ে উল্লিখিত বিষয়, তত্ত্ব প্রভৃতির বিশ্লেষণও এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। আলোচনার পদ্ধতি ছাড়া নিকায়গুলির সঙ্গে ধম্মসংগণির আর কোন প্রভেদ নেই বলে অনেকে মনে করেন[১৭]। অভিধম্মপিটকের অন্যতম গ্রন্থ কথাবত্থুর আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের পরবর্তী অধ্যায়েরই পরিচয় বহন করে। কথাবত্থুর রচনাকাল সাধারণ ভাবে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক বলে মনে করা হয়। ধম্মসংগণি সম্ভবতঃ নিকায়ের পরবর্তী ও কথাবত্থুর পূর্ববর্তী কালের রচনা এবং সেদিক থেকে এই গ্রন্থটিকে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের শেষভাগের রচনা বলে ধরা যায়।

বিষয়বস্তু

ধম্মসংগণির প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ এই ভাবে শ্রেণীভাগ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রধান তিনটি ভাগে এই গ্রন্থ বিভক্ত। প্রথম ভাগে চিত্ত ও চৈতসিকের বিশ্লেষণ আছে। চিত্ত একটি, চৈতসিকের সংখ্যা বাহান্ন। এদের স্বরূপ, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিকার বা পরিবর্তনশীল পদার্থকে অভিধম্মে 'রূপ' বলা হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে আছে রূপের বিশ্লেষণ। তৃতীয় ভাগটি হ'ল নিক্খেপ (নিক্ষেপ) এবং এই অংশে আছে পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই অংশটি পুনরুক্তিবাহুল্যে দুষ্ট এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যার পরিবর্তে প্রতিশব্দের সাহায্যে বৌদ্ধদর্শনের কতকগুলি বিষয় বোঝাবার চেষ্টা হওয়ার জন্য আকর্ষণহীন।

এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে আছে 'কামাবচর মহাচিত্ত',

'মনায়তন', 'ধম্মায়তন', 'মনোবিঞ্‌ঞাধাতু', 'ধম্মধাতু', 'পঞ্চঙ্গিকধম্ম', খন্ধ (স্কন্ধ), ইন্দ্রিয়, ইত্যাদি।

ধম্মসংগণির কিছু কিছু অংশ (passage) সামঞ্‌ঞফলসুত্ত, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি এবং মিলিন্দপঞ্‌হে পাওয়া যায়[১৮]। বুদ্ধঘোষ তাঁর বিসুদ্ধিমগ্‌গে এই গ্রন্থে আলোচিত মূল্যবান্ বিষয়গুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষরূপে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও সিংহলে ধম্মসংগণির খুবই সমাদর ছিল। খৃষ্টীয় দশম শতকে সিংহলের এক রাজা রত্নখচিত সোনার পাতে সমগ্র ধম্মসংগণি খোদাই করে সাড়ম্বরে নবনির্মিত এক বিহারে নিয়ে যান এবং সেখানে গ্রন্থটিকে পূজা করেন[১৯]।

ধম্মসংগণির তৃতীয় ভাগের একটি প্রাচীন টীকা পরিশিষ্টরূপে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পালি ঐতিহ্যানুসারে সারিপুত্ত এই টীকার রচয়িতা।

বিভঙ্গ

দ্বিতীয় গ্রন্থ বিভঙ্গকে ধম্মসংগণিরই পরবর্তী অংশ বলে মনে করা যায়। ধম্মসংগণিতে উল্লিখিত পদার্থ ও সূত্র বা formulaগুলিকে ধরে নিয়েই এই গ্রন্থের আলোচনা শুরু এবং কিছু নতুন বিষয়ও সংযোজিত। 'বিভঙ্গ' শব্দের অর্থ ভেঙ্গে-চুরে বিশদভাবে ব্যাখ্যা (exposition)। ধম্মসংগণিতে যে পদার্থগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিভঙ্গে সেইগুলিকেই ব্যাখ্যা বা আলোচনা করা হয়েছে। ধম্মসংগণির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হ'লেও আলোচনার ধারা ও আলোচিত বস্তুর দিক থেকে বিভঙ্গ পৃথক্ এবং বৌদ্ধদর্শনের একটি মূল্যবান্ গ্রন্থ।

বিষয়বস্তু

আঠারোটি 'বিভঙ্গ' বা পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি বিভক্ত। প্রতিটি 'বিভঙ্গে'র আবার তিনটি করে অংশ আছে, যথা-সুত্তন্তভাজনীয়, অভিধম্মভাজনীয়, ও পঞ্‌ঞাপুচ্ছক। খন্ধবিভঙ্গ (স্কন্ধবিভঙ্গ) দিয়ে এই গ্রন্থের আরম্ভ। আয়তনবিভঙ্গ, ধাতুবিভঙ্গ, সচ্চবিভঙ্গ, ইন্দ্রিয়বিভঙ্গ, পচ্চয়াকারবিভঙ্গ, মগ্‌গবিভঙ্গ ইত্যাদি নামগুলিতেই বোঝা যায় কোন্ 'বিভঙ্গে' কোন্

তত্ত্ব বা বিষয় অর্ন্তভূ'ক্ত। ধাতুবিভঙ্গে পঠবী (ক্ষিতি), আপ (অপ্) তেজ, বায়ু, আকাস (আকাশ) এবং বিঞ্‌ঞান (বিজ্ঞান) এই ছয়টি ধাতুর কথা বলা হয়েছে। ঝানবিভঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ধ্যানের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা আছে।

ধম্মসংগণির মত বিভঙ্গও বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব ও সত্যের আলোচনা দিয়েই শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান পর্যন্ত আলোচিত এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদ জ্ঞানের পরিপন্থী বিষয়গুলি তুলে ধরেছে। শেষ পরিচ্ছেদে কিছু পৌরাণিক উপাদান আছে।

জ্ঞানের প্রসারের চেয়ে সুত্তপিটকে বিক্ষিপ্তভাবে অন্তভু'ক্ত প্রজ্ঞা ও নীতিধর্মবিষয়ের প্রসারের জন্য তথ্য ও কার্যকরী উপায় নির্ধারণই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

ধাতুকথা

ধাতুকথা বা ধাতু (elements) সম্বন্ধায় ব্যাখানকে অভিধম্মপিটকের একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ না বলে ধম্মসংগণির পরিপূরক গ্রন্থ হিসেবে ধরা যায়। ধম্মসংগণির খন্ধ, ধাতু ও আয়তন বিষয়ক পরিচ্ছেদগুলিই ধাতুকথার মূল। এই গ্রন্থের চৌদ্দটি অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নানাভাবে খন্ধ, ধাতু ও আয়তনের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মে' দীক্ষিত ও আগ্রহী ব্যক্তিদের যে সমস্ত চিত্ত-ধর্ম থাকা সম্ভব সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশায়তন, আঠারো ধাতু, চতুরার্যসত্য, পঞ্চবল, সপ্ত বোধাঙ্গ (বোজ্‌ঝঙ্গ), আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি

পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি (পুদ্‌গলপ্রজ্ঞপ্তি) অভিধম্মপিটকের একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ এবং সুত্তপিটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। দীঘ নিকায়ের সঙ্গীতিসুত্তের সঙ্গে রূপগতভাবে এর প্রভেদ অল্পই এবং গ্রন্থটির তৃতীয় থেকে পঞ্চম

অধ্যায়ের অধিকাংশ অঙ্গুত্তরনিকায়ে পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলা না গেলেও এটি যে নিকায়-পরবর্তী যুগের রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পুগ্‌গল শব্দের অর্থ 'ব্যক্তি' এবং পঞ্‌ঞত্তি শব্দের অর্থ 'ধারণা', 'পরিচয়' ইত্যাদি। গ্রন্থের দশটি অধ্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ের 'ব্যক্তি'র বিশেষ আলোচনা আছে। সম্যক্‌সম্বুদ্ধ প্রত্যেকবুদ্ধ, অর্হত্ প্রভৃতির পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তু

গ্রন্থটির প্রারম্ভে একটি 'মাতিকা' দিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তুর একটি ধারণা দেওয়া হয়েছে। প্রথম অধ্যায়েই ছয় রকম 'পঞ্‌ঞত্তি'র কথা বলে 'পুগ্‌গলে'র আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার পুদগলের একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেখ (শিক্ষার্থী), অর্হত্, পচ্চেকবুদ্ধ (প্রত্যেকবুদ্ধ), সম্মাসম্বুদ্ধ (সম্যক্‌সম্বুদ্ধ), সদ্ধানুসারী (শ্রদ্ধানুসারী) ইত্যাদি পঞ্চাশ প্রকার 'পুদগল' এই তালিকায় উল্লিখিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৬ প্রকার পুদগলের কথা বলা হয়েছে, যাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে দুইটি গুণের ভিত্তিতে,—যে ক্রুদ্ধ এবং শত্রু অথবা যে অলস এবং বিবেকহীন। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তিনটি গুণের ভিত্তিতে,—যারা শীলধর্মের বিপরীত আচরণ করে, যারা ব্রহ্মচর্য পালন করে না, এবং যারা এগুলি পালন করে। এই ভাবে দশম বা শেষ অধ্যায়ে দশ প্রকার পুদগলের কথা বলা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য

গ্রন্থটি ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অভিধম্মপিটকের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ভিন্ন। কয়েকটি অধ্যায় নিকায়ের 'সুত্ত'গুলির প্রকৃতি ও আকারে রচিত। কোন কোন জায়গায় উপমার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য

কথাবত্থু অভিধম্মপিটকের অন্যতম মূল্যবান্ গ্রন্থ। ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র কথাবত্থুরই সংকলকের নাম পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতির সময় মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স কথাবত্থুর সংকলন করেন। সিংহলী পালি গ্রন্থ মহাবংস অনুসারে অশোকের সময় বৌদ্ধসম্প্রদায় নানা শাখায় বিভক্ত হয় এবং এমন আশঙ্কা দেখা দেয় যে থেরবাদী সম্প্রদায়ের স্থান অন্য কোন শাখা অধিকার করে নেবে। এই পটভূমিতে থেরবাদী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই সম্ভবতঃ কথাবত্থু রচিত হয়েছিল[২০]। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই গ্রন্থটির বক্তব্য উপস্থাপিত। প্রশ্নগুলি সাধারণভাবে বিরুদ্ধবাদী শাখার দৃষ্টিকোণ থেকে থেরবাদী শাখার বিরুদ্ধে আলোচনামূলক। উত্তরগুলিতে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করে থেরবাদী মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদী মত বিনয় ও সুত্তপিটকের উদ্ধৃতির সাহায্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

বুদ্ধঘোষ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কথাবত্থুর টীকা রচনা করেন এবং কথাবত্থুতে উল্লিখিত ও খণ্ডিত মতবাদগুলি কোন্ কোন্ শাখার তা' তিনি উল্লেখ করেছেন।

রচনাকাল

সিংহলী ও সাধারণ পালি ঐতিহ্য কথাবত্থুর রচনাকাল খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক বলে নির্দিষ্ট করলেও গ্রন্থটিতে পরবর্তীকালের কিছু সংযোজন আছে বলে মনে করা হয়[২১]। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে পিটক-পরবর্তীযুগের রচনা[২২]। ধম্মসংগণি ও বিভঙ্গের অংশবিশেষের এবং পট্‌ঠানে আলোচিত বিষয়বস্তুর উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়; কিন্তু ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি বা যমক থেকে কোন উদ্ধৃতি নেই। বর্তমানে যে রূপে আমরা কথাবত্থুকে পাই সম্পূর্ণভাবে সেই রূপে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে গ্রন্থটি রচিত না হলেও সেই যুগের বৌদ্ধ প্রজ্ঞার একটি পরিচয় আমরা এই গ্রন্থে পাই এবং

পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ অভিধর্ম শাস্ত্রের বিকাশ ও পরিণতি বিষয়ে এই গ্রন্থ আলোকপাত করে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার ইতিহাস সম্বন্ধেও গ্রন্থটিতে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে প্রাপ্ত কথাবত্থু ২৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে ৮ থেকে ১২ টি পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর আছে। একজন কাল্পনিক বিরুদ্ধবাদী প্রশ্ন করছেন এবং উত্তরে ঐ বিরুদ্ধমত খণ্ডন করা হচ্ছে, এই ভাবে গ্রন্থটিতে থেরবাদী-মত প্রতিষ্ঠিত। বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যান প্রণালীর বিশ্লেষণ করলে কথাবত্থুকে মৌলিক গ্রন্থ না বলে থেরবাদী মতবাদের ব্যাখ্যানমূলক গ্রন্থ (book of interpretation) বলা যায়[২৩]। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যান প্রণালীর সঙ্গে মিলিন্দ পঞ্হের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পালি সাহিত্যে তর্কশাস্ত্রের (Logic) উপর কোন গ্রন্থ নেই কিন্তু বাদ-প্রতিবাদের (controversy) ভিত্তিতে ও রূপে রচিত কথাবত্থুকে আমারা ন্যায়শাস্ত্রের অব্যহিত পূর্ববর্তী পটভূমি বলে মনে করতে পারি[২৪]।

যমক

যমক অভিধম্মপিটকের ষষ্ঠ গ্রন্থ বলে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। 'যমক' শব্দের অর্থ 'জোড়া' বা 'যুগ্ম'। এই গ্রন্থে প্রতিটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর দুই ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলেই সম্ভবতঃ গ্রন্থটির এই নাম[২৫]।

মূল যমক, খন্ধযমক, আয়তনযমক ইত্যাদি দশটি 'যমক' বা পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি বিভক্ত। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদই স্বয়ংসম্পূর্ণ। যমক একটি দুরূহ গ্রন্থ। অভিধম্মপিটকের পূর্ববর্তী পাঁচটি গ্রন্থ পাঠ করেও যে সব সমস্যা বা প্রশ্ন থাকতে পারে সেগুলির সমাধানই সম্ভবতঃ এই গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য[২৬]।

'যমক' বা পরিচ্ছেদগুলির নামকরণ থেকেই পরিচ্ছেদগুলির আলোচ্য বস্তু জানা যায়। চিত্ত-,নীতিধর্ম-,পরলোক-বিষয়ক প্রভৃতি তত্ত্বের প্রতি আগ্রহের নিদর্শন গ্রন্থটিতে দেখা যায়।

পট্‌ঠানপকরণ বা পট্‌ঠান (প্রস্থান) অভিধম্মপিটকের সপ্তম বা শেষ গ্রন্থ। অভিধম্ম আলোচনার জন্য গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য আছে। মহা-পকরণ (মহাপ্রকরণ) নামেও গ্রন্থটিকে উল্লেখ করা হয়। এক-পট্‌ঠান, দুক-পট্‌ঠান ও তীক-পট্‌ঠান এই তিন খণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত।

বিষয়বস্তু

'পট্‌ঠান' শব্দের অর্থ পচ্‌চয় (প্রত্যয়), বিশ্লেষণ করা হয়েছে এমন কিছু, প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি বা প্রধান কারণ। বৌদ্ধদর্শনে কার্য-কারণ নির্ণয়ের দু'টি পদ্ধতির উল্লেখ আছে, পটিচ্চসমুপ্পাদ (প্রতীত্যসমুৎপাদ)-নয় ও পট্‌ঠান -নয়। পট্‌ঠান প্রতীত্যসমুৎপাদেরই বিশ্লেষণধর্মী বিশদ ব্যাখ্যা।

পরম-পদ নির্বাণ ছাড়া বৌদ্ধদর্শনে এমন কিছুর অস্তিত্ব নেই যা কোন না কোন উপায়ে *relative* বা অন্য কিছুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়[৭]। এই সম্পর্ক চব্বিশ রকমভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। তীক-পট্‌ঠানের প্রথমাংশে এই ২৪টি প্রত্যয় বা সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। হেতু-, আরম্মণ-, অধিপতি-, অনন্তর-, সমনন্তর-, সহজাত-, ইত্যাদি ২৪টি পচ্চয়ই (প্রত্যয়) হল 'পট্‌ঠান' বা ধর্মগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের উপায়।

অনুলোম-, পচ্চনিয়-, অনুলোমপচ্চনিয়-, ও পচ্চনিয় অনুলোম-পট্‌ঠান এই চারটি প্রধান ভাগে সমগ্র পট্‌ঠান বিভক্ত। এই চার ভাগে ৬ প্রকারে ২৪টি প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে।

১। দ্রঃ পৃঃ ৮২

২। Winternitz, HIL, II, p 165

৩। ঐ

৪। ঐ

৫। ঐ, p 166

৬। ঐ

৭। Law, HPL, I, p 304

৮। দ্রঃ পৃঃ ১০

৯। মহা ১.৩৬.১২-অভিব্রহ্মচারিকায় সিক্‌খায় সিক্‌খাপেতুং অভিধম্মে বিনেতুং অভিবিনয়ে বিনেতুং।

১০। Law, HPL, I, 336 ; দ্রষ্টব্য, A. C. Banerjee, Sarvastivada Literature

১১। Nyanatilaka, Guide through the Abhidhamma Pitaka, Foreword.

১২। Winternitz, HIL, II, p 173

১৩। ঐ, p 173

১৪। Mrs. Rhys Davids তাঁর ধম্মসংগণির ইংরাজী অনুবাদ A Buddhist Manual of Psychological Ethics এর Introduction এ গ্রন্থটির উৎপত্তি, রচনাকাল ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

১৫। Childers, Pali Dictionary, p 447

১৬। Mrs. Rhys Davids, Buddhist Manual etc., xxiii

১৭। Law, HPL, I, p 305 ; দ্রষ্টব্য Mrs. Rhys Davids, Buddhist Manual etc. Indroduction.

১৮। Law, ঐ, p 309

১৯। Mrs. Rhys Davids, ঐ, xxv

২০। Law, HPL, I, p 324 ; Winternitz, HIL, II, pp 169-171

২১। ঐ

২২। ঐ

২৩। Law, HPL, I, p 316

২৪। Law, HPL, II, p 646

২৫। Winternitz, HIL, II, p 171 পাদটীকা 4

২৬। ঐ, p 171

২৭। ঐ, p 172

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ত্রিপিটক-বহির্ভূত পালিসাহিত্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা বৌদ্ধ থেরবাদী শাস্ত্র (canon) পালি ত্রিপিটকের একটি রূপরেখা দেবার চেষ্টা করেছি। পিটক-পরবর্তী যুগেও বেশ কিছু মূল্যবান্ গ্রন্থ পালিভাষায় রচিত হয়েছিল। মৌলিক গ্রন্থ ছাড়া এই যুগে রচিত পালি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের টীকা-গ্রন্থগুলিও বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে শাস্ত্রগ্রন্থের উৎপত্তি হয়েছিল ভারতবর্ষে এবং পরবর্তী কালে সিংহলে প্রচারিত হয়েছিল, কিন্তু ত্রিপিটক বহির্ভূত গ্রন্থগুলির অধিকাংশ হ'ল সিংহলী ভিক্ষুদেরই রচনা। ব্রহ্মদেশের পণ্ডিতদেরও কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায়।

ত্রিপিটক বহির্ভূত পালি সাহিত্যকে আমরা মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত সাত অংশে ভাগ করতে পারি :

(ক) টীকা গ্রন্থগুলির পূর্ববর্তী মৌলিক গ্রন্থ

(খ) টীকা গ্রন্থ

(গ) ইতিহাসাশ্রয়ী গ্রন্থ (*chronicles*)

(ঘ) সংকলন-গ্রন্থ (*compendium, manual*)

(ঙ) কাব্য-গ্রন্থ

(চ) ব্যাকরণ

(ছ) বিবিধগ্রন্থ :-অভিধান, ছন্দ, অলঙ্কার

ত্রিপিটক-বহির্ভূত এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমরা মিলিন্দপঞ্‌হোকে প্রাচীনতম এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সাসনবংসকে আধুনিকতম বলে মনে করতে পারি। ব্রহ্মদেশ, সিংহল, শ্যাম প্রভৃতি দেশে এখনও পালিভাষায় মৌলিক ও টীকাগ্রন্থ, বিশেষ করে অভিধম্মের উপর, রচিত হয়ে থাকে।

আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে ত্রিপিটক বহির্ভূত রচনাবলীর একটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এই আলোচনার মধ্যে সাসনবংস-পরবর্তী সময়ের কোন রচনা গ্রহণ করা হয়নি।

(ক) টীকা গ্রন্থগুলির পূর্ববর্তী মৌলিক পালি গ্রন্থ :

এই পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে মিলিন্দপঞ্‌হো প্রাচীনতম। গ্রন্থটির উৎপত্তিস্থল উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন অঞ্চল বলেই মনে করা হয়[১]। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল[২]। মিলিন্দ হলেন খৃঃ পূঃ প্রথম শতকের ভারতীয় গ্রীক সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট সম্রাট মেনানড্রোস্‌। মিলিন্দের সঙ্গে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনের উত্তর-প্রত্যুত্তরের আকারে গ্রন্থটি রচিত।

মূল গ্রন্থটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত বা উত্তর ভারতের কোন আঞ্চলিক প্রাকৃতে রচিত হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সূত্র থেকেই আমরা মূল গ্রন্থটির কোন সন্ধান পাই নি। বর্তমানে আমরা যে মিলিন্দপঞ্‌হো পাই তা' বহু প্রাচীন কালেই সিংহলে ঐ মূল গ্রন্থ থেকে পালিভাষায় অনূদিত হয়েছিল[৩]। ৩১৭ থেকে ৪২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই মিলিন্দ পঞ্‌হোর চীনা অনুবাদ হয়েছিল[৪]। আমরা দুইটি বিভিন্ন চীনা অনুবাদের কথা জানি, কিন্তু এগুলি মূলগ্রন্থ থেকে অথবা পালি অনুবাদ থেকে চীনা করা হয়েছিল তা' নিরূপণ করা সম্ভব নয়[৫]।

পালি গ্রন্থটিতে আমরা সাতটি খণ্ড পাই, কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন মূল গ্রন্থে কেবল তিনটি খণ্ড ছিল এবং মিলিন্দ পঞ্‌হের ৪র্থ থেকে ৭ম খণ্ড প্রক্ষিপ্ত[৬]। চীনা অনুবাদেও চতুর্থ থেকে সপ্তম খণ্ড পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধধর্মের নানা তত্ত্বমূলক সমস্যা এই গ্রন্থে উপমা, রূপক, গল্প প্রভৃতির সাহায্যে অত্যন্ত সহজভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কথোপকথনের মাধ্যমে যে ভাবে এই জটিল সমস্যাগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, মূল সমস্যা-গুলি তুলে ধরে তার সমাধান করা হয়েছে, তা' থেকে বলা যায় যে ভগবদ্‌ গীতার মত 'মিলিন্দপঞ্‌হ'-ও ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সম্রাট্‌ মিলিন্দ একের পর এক প্রশ্ন তুলেছেন আর সন্ন্যাসী নাগসেন ধীর সংযত ভাবে সাধারণ দৈনন্দিন জীবন থেকে উদাহরণ দিয়ে

বুদ্ধের শিক্ষার সারবত্তা প্রমান করেছেন। গ্রন্থের একেবারে গোড়াতেই বৌদ্ধতত্ত্বের মূল প্রশ্নগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে ভিক্ষু বললেন তাঁকে নাগসেন বলা হয় কিন্তু এর সঙ্গে কোন 'আমি' (ego) অথবা পুদ্গল সংযুক্ত নয়। অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি আলোচনার শেষে সম্রাট স্বীকার করলেন যে কোন স্থায়ী অহং-ভাব (ego) নেই।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গদ্যরচনার রীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থের ভাষা কমনীয় এবং প্রাঞ্জল। সহজবোধ্য, সাবলীল ভাষা ও বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাকারী রচনাশৈলীর জন্য গ্রন্থটিকে একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যকৃতি বলা হয়[৭]।

বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনের জন্য অতি মূল্যবান এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন নগর, জনপদ ও নদীর উল্লেখ এবং প্রায় সম্পূর্ণ সুত্তপিটকের এবং অভিধম্মপিটকের কিছু অংশের উদ্ধৃতি অথবা নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষার দিক থেকে সুত্তপিটকে ব্যবহৃত ভাষা এই গ্রন্থের ভাষা থেকে প্রাচীন। অনাত্ম-, অনিত্য-, কর্মবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বগুলি এতে এত দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে যে প্রসিদ্ধ পালি টীকাকার বুদ্ধঘোষ মিলিন্দপঞ্হ-কে পিটকগ্রন্থের তুল্য মর্যাদাসম্পন্ন বলে অভিহিত করেছেন[৮]।

মিলিন্দপঞ্হের মূল অংশের সমসাময়িককালে রচিত একটি প্রাচীন গ্রন্থ হ'ল নেত্তি-পকরণ। নেত্তি-গন্ধ বা শুধু 'নেত্তি' নামেও গ্রন্থটি অভিহিত। বুদ্ধের সমুদয় শিক্ষা প্রথম এই গ্রন্থেই ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে।

সদ্ধর্মে জ্ঞানলাভের পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি রচিত। দক্ষ উপদেষ্টার সাহায্য ছাড়া ধর্মীয় তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভব হয় না এই কথা মনে রেখেই গ্রন্থটিতে জ্ঞানলাভের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সর্বাস্তিবাদী অভিধর্ম-গ্রন্থ জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রের সঙ্গে নেত্তি-পকরণের বহু সাদৃশ্য দেখা যায়। বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় যাস্ক-কৃত নিরুক্তের যে মূল্য পালি-শাস্ত্রের (canon) আলোচনায় নেত্তি-র স্থান তদ্রূপ।

প্রসিদ্ধ বুদ্ধ-শিষ্য মহাকচ্চান (মহাকাত্যায়ন) এই গ্রন্থের রচয়িতা[৯]। মজ্ঝিম নিকায়ে মহাকচ্চানকে বুদ্ধবচনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা বলা হয়েছে।

পঞ্চম শতাব্দীতে ধম্মপাল (ধর্মপাল) এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। Mrs. Rhys Davids[১০] এর মতে অভিধম্মপিটকের শেষ গ্রন্থ দুটি (যমক ও পট্‌ঠান) অপেক্ষা নেত্তিপকরণ প্রাচীন ।

পেটকোপদেস নেত্তির মতই মহাকচ্চান রচিত আর একটি প্রাচীন পালি গ্রন্থ। নেত্তি-তে আলোচিত বস্তুগুলিই এখানে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। নেত্তির তিনটি অধ্যায় এখানে উদ্ধৃত। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় পিটকান্তর্গত উপদেশাবলীই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। নেত্তির কোন কোন জায়গায় বক্তব্য খুব পরিষ্কার নয়, এই গ্রন্থে সেই সব সমস্যার উপর কিছু নতুন কথা বলা হয়েছে। সংযুত্ত- ও অঙ্গুত্তর নিকায় এই গ্রন্থে সংযুত্তক ও একুত্তরক নামে উল্লিখিত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকালে সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ সাহিত্যে চতুরার্যসত্যকে যেমন প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে চতুরার্যসত্যকে তেমন বৌদ্ধধর্মের সারবস্তু বলা হয়েছে ।

বুদ্ধজীবনীর পক্ষে মূল্যবান উপাদানে সমৃদ্ধ নিদান-কথা একটি প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য পালি গ্রন্থ। সুত্ত ও বিনয়পিটকে আমরা বুদ্ধ-কাহিনীর প্রারম্ভ পাই এবং জাতক, বুদ্ধবংস, ও চরিয়াপিটকে বুদ্ধকাহিনীর কিছু উপাদান আছে। কিন্তু নিদান-কথার পূর্বে আর কোন পালি গ্রন্থে বুদ্ধ-জীবনীর এমন সম্বদ্ধ ও ধারাবাহিক আলোচনা নেই। গ্রন্থটির রচনাকাল ও রচয়িতা সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়[১১]। এটি জাতকের বিরাট টীকাগ্রন্থ জাতকট্‌ঠবণ্‌ণনার (জাতকর্থবর্ণনা) মুখবন্ধ স্বরূপ ।

নিদান-কথা তিন খণ্ডে বিভক্ত : দূরে নিদান, অবিদূরে নিদান ও সন্তিকে নিদান। দীপঙ্কর বুদ্ধের সময় সুমেধ ব্রাহ্মণরূপে গৌতম বুদ্ধের জন্ম গ্রহণ থেকে শুরু করে তুষিতস্বর্গে তাঁর পুনর্জন্মগ্রহণ পর্যন্ত প্রথম খণ্ডে বিবৃত হয়েছে। প্রধানতঃ বুদ্ধবংস ও চরিয়াপিটকের মূল বিষয় অবলম্বন করে এই অংশ রচিত। দ্বিতীয় অংশে তুষিতস্বর্গ থেকে অবতরণ করে গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভ পর্যন্ত কাহিনী বলা হয়েছে। বোধিলাভের পর থেকে অনাথপিণ্ডিকের দান পর্যন্ত গৌতম বুদ্ধের কার্যকলাপ তৃতীয় অংশ সন্তিকে-নিদানের বক্তব্য।

এই গ্রন্থে বিবৃত বুদ্ধ-কাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখলে মনে হয় ললিতবিস্তর

বা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে বুদ্ধকাহিনীর যে পরিচয় আমরা পাই তার থেকে নিদান-কথার কাহিনী পূর্বস্তরের।

(খ) টীকা-গ্রন্থ

মিলিন্দপঞ্‌হোর পরবর্তী সময়ে পালি শাস্ত্রের যে ভাষ্যগ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছিল এই পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে সেইগুলির আলোচনা করব। পালি শাস্ত্রের ভাষ্যকাররূপে আমরা বুদ্ধদত্ত, বুদ্ধঘোষ ও ধম্মপাল এই তিন প্রধান ব্যক্তির নাম. ও কীর্তিই স্মরণ করতে পারি। চুল্ল ধম্মপাল, উপসেন, মহানামন্, অনুরুদ্ধ প্রমুখ আরো কয়েকজন বিশিষ্ট টীকাকারও আছেন।

সাধারণভাবে ভারতীয় ও সিংহলী ভিক্ষুদের কাছেই আমরা এই অমূল্য সম্পদের জন্য ঋণী। টীকা-গ্রন্থগুলি মূল-গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যামাত্রই নয়, অনেক জায়গায় টীকাগুলি মৌলিকত্বের দাবী করতে পারে এবং তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার পক্ষে কোন কোন টীকা অপরিহার্য। বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশের উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং এই শিক্ষা ও ভাবধারার সঙ্গে সাধারণকে পরিচিত করাই টীকাকারদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই ভাষ্য বা টীকা-রচনার বীজ শাস্ত্রগ্রন্থের (canon) মধ্যেই পাওয়া যায়। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে পাতিমোক্‌খের টীকা হিসেবেই সম্ভবতঃ সুত্তবিভঙ্গের সংকলন হয়েছিল। সুত্তনিপাতের গদ্যাংশ এবং উদান টীকার প্রকৃতিতেই রচিত, নিদ্দেস সুত্তনিপাতের কিয়দংশের টীকাবিশেষ এবং সারিপুত্তরচিত টীকা ধম্মসংগণির পরিশিষ্টরূপে অভিধম্মপিটকের অন্তর্ভুক্ত। সিংহলী বৌদ্ধ ঐতিহ্যমতে টীকাগুলি মূল গ্রন্থগুলির সঙ্গেই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির সময় থেকে প্রচারিত এবং বট্টগামনির সময়ে লিপিবদ্ধ[১২]। এই মতে বুদ্ধঘোষ পঞ্চম শতাব্দীতে ঐ মূল টীকাগুলির পালি অনুবাদ করেন। মূলটীকা সম্বন্ধে এই ঐতিহ্য গ্রহণ-যোগ্য না হলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ভারতীয় ভিক্ষুরা শাস্ত্ররচনার অব্যবহিত পর থেকেই ভাষ্যরচনায় ব্রতী হন। বর্তমানের টীকাগুলিতে অনেক জায়গায় তাঁদের 'পোরাণা' বা 'পুরাতনেরা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পোরাণ-কথা ও পোরাণ-অট্‌ঠকথা রূপেও পুরাতন আচার্যদের টীকাগুলি উল্লিখিত। ভারতবর্ষে থেরবাদী সম্প্রদায় যখন উত্তরোত্তর অন্য সম্প্রদায়ের

তুলনায় প্রভাবহীন হয়ে পড়তে লাগল তখন থেকেই সিংহলী বিহারগুলিতে টীকারচনা ও শাস্ত্রাধ্যয়নের সূচনা হল। যে সমস্ত টীকা পাওয়া গেল সব সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করা হল এবং সিংহলী পণ্ডিতেরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালিভাষার চর্চাও করলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় পালিভাষা এমন একটি মার্জিত সাহিত্যিক রূপ পেল যাতে পঞ্চম শতাব্দীতেই বুদ্ধঘোষের পক্ষে টীকাগুলিকে সিংহলীভাষা থেকে এরূপ উন্নত রীতিতে পালিভাষায় অনুবাদ বা পুনরায় অনুবাদ করা সম্ভব হয়[১৩]।

ভাষ্য বা টীকারচনার উৎস ও ইতিহাস যাই হোক না কেন আমরা বর্তমানে যে সমস্ত টীকাগ্রন্থ পাই তার অধিকাংশই যে সিংহল দেশে রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পালিভাষায় টীকা বা ভাষ্যগ্রন্থগুলিকে অট্‌ঠকথা (অর্থকথা) বলা হয়। আমরা এখন প্রধান অট্‌ঠকথাগুলি এবং প্রধান টীকাকারদের সম্বন্ধে আলোচনা করব।

পালি টীকাকারদের মধ্যে বুদ্ধঘোষই প্রধান। বুদ্ধদত্ত, বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপাল এই ক্রমে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা পালি অট্‌ঠকথা সমূহের ও এঁদের রচিত অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থের পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

বুদ্ধদত্ত ভারতের কাবেরী-অঞ্চলের চোল-রাজ্যের অধিবাসী এবং সিংহলের প্রসিদ্ধ মহাবিহারের একজন পণ্ডিত ছিলেন। বুদ্ধদত্তকে অনেকে বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক ও সমবয়সী বলে মনে করেন। তাঁর ধর্মনিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিনয় ও অভিধম্মের উপর তাঁর কয়েকটি মূল্যবান ভাষ্যগ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে উত্তরবিনিচ্ছয়, বিনয়বিনিচ্ছয়, অভিধম্মাবতার এবং রূপারূপবিভাগ প্রধান। এই চারটিকে বুদ্ধদত্তের *manual* হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রথম গ্রন্থদু'টি বিনয়পিটক অবলম্বনে রচিত এবং ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিনয়সম্বন্ধীয় নানা বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। গদ্য-পদ্যে রচিত অভিধম্মাবতার চব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং অভিধম্মের সূক্ষ্ম বিষয়গুলির বিশ্লেষণই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। পদ্যে রচিত রূপারূপবিভাগে অভিধম্মের দুরূহ বিষয় নামরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মধুরত্থবিলাসিনী নামে বুদ্ধবংসের একটি টীকাও তিনি রচনা করেন।

থেরবাদী সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম আলোচনায় বুদ্ধদত্তের দান বিশেষ মূল্যবান। বুদ্ধদত্ত ও বুদ্ধঘোষ সম্ভবতঃ পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁদের গ্রন্থগুলির মূল বোধহয় একই। এইজন্যই হয়ত অভিধর্ম্মাবতারের সঙ্গে বুদ্ধঘোষের বিসুদ্ধিমগ্গের এত সাদৃশ্য। সিংহলী ঐতিহ্যে বলা হয়ে থাকে যে বুদ্ধঘোষ সিংহলী ভাষা থেকে অট্‌ঠকথার পালি অনুবাদ করে বুদ্ধদত্তর অনুরোধে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং বুদ্ধদত্ত বিনয়ের টীকাগুলির সারাংশ হিসেবে বিনয়বিনিচ্ছয় এবং অভিধর্ম্ম নিয়ে অভিধর্ম্মাবতার রচনা করেন।

বুদ্ধদত্ত তাঁর আলোচনাকে চিত্ত, চেতসিক, রূপ এবং নির্ব্বাণ এইভাবে ভাগ করেছেন আর বুদ্ধঘোষ পঞ্চ স্কন্ধের উপর ভিত্তি করে তাঁর আলোচনা করেছেন।

বুদ্ধঘোষকে পালি ভাষ্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়। তাঁর জীবন ও ইতিহাস[১৪] নিয়ে বহু কাহিনী, উপকথা ইত্যাদি প্রচলিত আছে। মগধের বিখ্যাত বোধিবৃক্ষের নিকটবর্তী কোন অঞ্চলে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণ সন্তান হিসেবে তিনি বেদ ও অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী হ'ন। পরে এক বৌদ্ধ থের তাঁকে বুদ্ধের শিক্ষার উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে সক্ষম হলে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং সদ্ধর্মের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বুদ্ধের বাণীর 'ঘোষণা' করতেন বলেই নাকি তাঁর নাম বুদ্ধ'ঘোষ' হয়। সিংহলী বৌদ্ধদের মতে সিংহলী অট্‌ঠকথা অধ্যয়ন করার জন্য তিনি রাজা মহানামের সময় সিংহলে যান এবং অনুরাধপুরে মহাবিহারে অট্‌ঠকথা অধ্যয়ন করেন। অট্‌ঠকথাগুলির মূল্য উপলব্ধি করে তিনি ঐগুলি অনুবাদ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর বিদ্যা ও ক্ষমতার পরীক্ষা নিয়ে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সমগ্র অট্‌ঠকথার পালি অনুবাদ করেন, তাঁর সিংহল যাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে তিনি বোধিবৃক্ষের অর্চনার জন্য মগধে ফিরে আসেন।

বুদ্ধঘোষের বিপুল রচনাবলী পাঠ করলে তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা বোঝা যায়। অধিবিদ্যা (metaphysics), জ্যোতির্বিদ্যা ব্যাকরণ, ভূগোল প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দক্ষতা ছিল।

অট্ঠকথাগুলি ছাড়া বুদ্ধঘোষ অভিধম্মের আলোচনার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান বিসুদ্ধিমগ্গ রচনা করেন। সিংহলীরা বলেন যে বুদ্ধঘোষকে অট্ঠকথার অনুবাদ করার অনুমতি দেওয়ার আগে মহাবিহারের পণ্ডিতগণ তাঁর বিদ্যা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তাঁকে যে দু'টি গাথার ব্যাখ্যা করতে বলেন সেই গাথাদুটি অবলম্বন করেই তিনি তেইশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। বিসুদ্ধিমগ্গ প্রকৃতপক্ষে তিন পিটকের বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। নিব্বান হ'ল 'বিসুদ্ধি' বা পবিত্রতা আর ঐ বিশুদ্ধ পদ প্রাপ্তির উপায় বা 'মগ্গ' হ'ল সীল (শীল), সমাধি, ও পঞ্ঞা (প্রজ্ঞা)।

সমন্তপাসাদিকা নামে তিনি বিনয়পিটকের একটি বিস্তৃত টীকা রচনা করেন। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ছাড়াও এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ ও স্থান, রাজগৃহের অষ্টাদশ মহাবিহার, সম্রাট অশোকের কথা, ইত্যাদি নানা আলোচনা এখানে আছে। বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্মপিটকের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ এবং তৃতীয় সঙ্গীতি পর্যন্ত কী ভাবে বিনয় প্রচারিত হয় তার বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র পাতিমোক্খের উপর রচিত তাঁর টীকা কঙ্খাবিতরণী একটি বিশিষ্ট পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থ।

সুত্তপিটকের উপর তিনি অনেকগুলি টীকা রচনা করেন। দীঘ নিকায়ের টীকার নাম সুমঙ্গলবিলাসিনী, মজ্ঝিম নিকায়ের টীকা হ'ল পপঞ্চসূদনী সংযুত্তনিকায়ের টীকা সারত্থপকাসিনী আর মনোরথপূরণী হ'ল অঙ্গুত্তর নিকায়ের টীকা। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ছাড়াও টীকাগুলি সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে সুমঙ্গলবিলাসিনীর স্থান প্রধান। শাক্যবংশের উৎপত্তির কথাও সুমঙ্গলবিলাসিনীতে আলোচিত। খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ এবং সুত্তনিপাত,—খুদ্দকনিকায়ের এই তিনটি গ্রন্থের টীকাও তিনি রচনা করেন। খুদ্দকপাঠ অট্ঠকথা বা পরমত্থজোতিকাতে লিচ্ছবিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। সুত্তনিপাত অট্ঠকথাও পরমত্থজোতিকা নামে অভিহিত। ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক প্রভৃতি

নানা মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ সুত্তনিপাত-অট্ঠকথা একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ধম্মপদ-অট্ঠকথা বুদ্ধঘোষের রচনা কি না সে বিষয় মতভেদ আছে। এটি একটি বিরাট গ্রন্থ এবং জাতকের অনুরূপ গল্প দিয়ে ধম্মপদের প্রতিটি গাথার ব্যাখ্যার মুখবন্ধ করা হয়েছে। কোথায়, কোন প্রসঙ্গে, কার কাছে, কোন গাথা বলা হয়েছিল তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত এই টীকায় পাওয়া যায়। ধম্মপদের মতই জাতকের টীকা বা জাতকট্ঠকথা বুদ্ধঘোষের রচনা বলে কোন কোন মহলে উল্লিখিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আলোচনার মূল্যবান উপাদান হিসেবে ধম্মপদ ও জাতকের টীকা প্রসিদ্ধ। অপদানের টীকাকার হিসেবেও বুদ্ধঘোষের নাম করা হয়। অভিধম্মপিটকের সাতটি গ্রন্থের উপর তিনি পরমত্থকথা শীর্ষক টীকা রচনা করেন। তাঁর রচিত অত্থসালিনী ধম্মসংগণির বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা। বিভঙ্গ-অট্ঠকথা বা সম্মোহবিনোদনী, ধাতুকথাপকরণ-অট্ঠকথা, পুগ্গলপঞ্ঞত্তি-অট্ঠকথা, কথাবত্থু-অট্ঠকথা, যমকপকরণ-অট্ঠকথা, ও পট্ঠানপকরণ-অট্ঠকথা প্রভৃতি গ্রন্থ বুদ্ধঘোষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য টীকাকার ধম্মপাল দাক্ষিণাত্যের পদরতীর্থের অধিবাসী ছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে তাঁকে তামিলদেশের কাঞ্চীপুরের (কাঞ্জীবরম্) লোক বলা হয়েছে। বুদ্ধঘোষের সঙ্গে তাঁর সময়ের ব্যবধান খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। খুদ্দক নিকায়ের কয়েকটি গ্রন্থের উপর তিনি পরমত্থদীপনী শীর্ষক টীকা রচনা করেন। এই টীকা উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, চরিয়াপিটক, থের-ও থেরীগাথার ব্যাখ্যান। নেত্তিপকরণের টীকা এবং চারটি নিকায়-অট্ঠকথা ও জাতক-অট্ঠকথার টীকা লীনত্থপকাসিনী ধম্মপালের রচনা।

এই টীকাগুলি ছাড়া উপসেনরচিত নিদ্দেস-এর টীকা সদ্ধম্মপজ্জোতিকা এবং মহানাম-থের রচিত পটিসম্ভিদামগ্গের টীকা সদ্ধম্মপকাসিনী উল্লেখযোগ্য।

(গ) ইতিহাসাশ্রয়ী গ্রন্থ (chronicles)

সিংহলের বৌদ্ধভিক্ষুরা কেবলমাত্র ধর্ম ও তত্ত্বের ব্যাখ্যান এবং কাহিনী ও উপকথার সংকলন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। প্রাচীন কাল থেকেই বৌদ্ধ সংঘের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল। চুল্লবগ্‌গের অন্তর্ভুক্ত সঙ্গীতির বৃত্তান্ত এবং কথাবত্থুর অন্তর্গত বৌদ্ধশাখা ও সম্প্রদায়ের বিবরণ ঐ সব ভিক্ষুদের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহের পরিচয় দেয়, অট্‌ঠকথা-গুলিতেও ঐতিহাসিক বিবরণের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় এমন কোন গ্রন্থ প্রাচীন ভারতে ছিল না, ভারতীয় পণ্ডিতদের ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ কেবলমাত্র ঐতিহাসিক কাব্য বা ঐ ধরণের গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পালি-বিশারদ পণ্ডিতরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। সিংহলের পালি পণ্ডিতগণ কিছু ইতিহাসাশ্রয়া গ্রন্থ রচনা করেন যার মধ্যে দীপবংস ও মহাবংস বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ দু'টিকে অবশ্য প্রকৃত ইতিহাস না বলে ঐতিহাসিক কাব্য (*historical poems*) বলাই সঙ্গত।

বংস (বংশ) শব্দটি 'ধারা', 'বংশক্রম', ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত। যে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থকে এই শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হোত। এই ধারার প্রবর্তন বা 'বংস'-পর্যায়ের পালি গ্রন্থের উৎস সম্ভবতঃ খুদ্দক নিকায়ের বুদ্ধবংস। পালি 'বংস'-সাহিত্যের মধ্যে দীপবংস, মহাবংস, থূপবংস, দাঠাবংস, হত্থবনগল্লবিহারবংস, ছ-কেসধাতুবংস, গন্ধবংস. সাসনবংস প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়।

দীপবংস বা লঙ্কাদ্বীপের বৃত্তান্ত (chronicle) পালি ভাষায় রচিত প্রাচীনতম ইতিহাসাশ্রয়ী গ্রন্থ। গ্রন্থটির রচয়িতার নাম জানা যায় নি, তবে গ্রন্থটি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটি পদ্যে রচিত এবং কিছু গদ্যাংশও এতে আছে। বুদ্ধঘোষের সময় দীপবংস সিংহলে বহুল প্রচারিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল। প্রথম দুটি বৌদ্ধ সঙ্গীতি এবং দ্বিতীয় সঙ্গীতির পরে উদ্ভূত বৌদ্ধসম্প্রদায়সমূহ, সম্রাট্ অশোক, বঙ্গদেশের রাজপুত্র বিজয় কর্তৃক সিংহল দেশ জয় ইত্যাদি কাহিনী এই গ্রন্থে বিবৃত।

মহাবংস কবি মহানাম রচিত একটি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে সম্ভবতঃ গ্রন্থটি রচিত হয়। কবি যে একটি কাব্য (*ornate poem*) রচনায় প্রয়াসী ছিলেন তা' পরিষ্কার বলা আছে। বিষয়বস্তু ও ভাষার দিক্ থেকে দীপবংসের সঙ্গে গ্রন্থখানির বহু সাদৃশ্য বর্তমান। গৌতম বুদ্ধের জীবনকাহিনী দিয়ে দু'টি গ্রন্থই আরম্ভ হয়েছে এবং গৌতমের তিনবার সিংহল পরিভ্রমণের সংবাদ দু'টি গ্রন্থেই পাওয়া যায়। মহাবংসে তিনটি বৌদ্ধ সঙ্গীতির বিবরণ আছে। সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য বহির্ভারতে বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণের কথা এই গ্রন্থে জানা যায়। সিংহলের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশ ও বিস্তারের ইতিবৃত্তরূপে দুটি গ্রন্থই বিশেষ মূল্যবান্। সিংহলবিজয়ী বিজয় থেকে শুরু করে মহাসেন পর্যন্ত সিংহলের রাজাদের কাহিনী মহাবংসে লিপিবদ্ধ।

মহাবংসের পরিপূরক গ্রন্থ হিসেবেই বোধ হয় চূলবংস রচিত হয়েছিল। কোন একজন ব্যক্তি এই গ্রন্থের রচয়িতা নন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এর এক একটি অংশ রচনা করেন বলে মনে হয়। সিংহলী ঐতিহ্যমতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা দ্বিতীয় পরাক্রমবাহুর সময় ব্রহ্মদেশ থেকে সিংহলে আগত স্থবির ধর্মকীর্তি গ্রন্থটি শুরু করেন। একশোটি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই গ্রন্থে মহাসেন-পুত্র রাজা শ্রীমেঘবর্ণ থেকে শুরু করে রাজা শ্রীবিক্রমরাজসিংহ পর্যন্ত চব্বিশ জন রাজার বৃত্তান্ত আছে।

দশম শতাব্দীতে ভিক্ষু উপতিস্স কর্তৃক রচিত মহাবোধিবংস বা বোধিবংস বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত, বৌদ্ধ সংগীতি, মহিন্দের লঙ্কাগমন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। কোন সূত্রে গ্রন্থটি ৪র্থ শতকে রচিত বলা হয়েছে, আবার, কারও মতে এটি একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের রচনা[১৫]।

থূপবংস (স্তূপবংশ) ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাচিস্সর কর্তৃক রচিত একটি গদ্যগ্রন্থ। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদানের জন্য গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। নিদান-কথা, সমন্তপাসাদিকা, মহাবংস প্রভৃতি থেকে অনেক উদ্ধৃতি এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। মোগ্গলিপুত্ত তিস্স বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনজন থেরকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন বলে

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। থূপবংসের বিষয়বস্তুকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত প্রথম ভাগে, গৌতম বুদ্ধের জন্ম থেকে তাঁর পরিনির্বাণ, পূতাস্থি বণ্টন, অস্থিধাতুর উপর অজাতশত্রু কর্তৃক রাজগৃহে স্তূপ নির্মাণ দ্বিতীয় ভাগে এবং পরবর্তী বৃত্তান্ত তৃতীয় ভাগে লিপিবদ্ধ। পালির পূর্বে সিংহলী এবং মাগধী ভাষাতে থূপবংস রচিত হয় বলে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন১৬।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহাথের ধম্মকিত্তি পাঁচ সর্গের পালি কাব্য দাঠাবংস (দংষ্ট্রাবংশ) বা দন্তধাতুবংস রচনা করেন। কাব্যের বাহন হিসেবে পালি ভাষা যে ব্যবহৃত হ'তে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ল দাঠাবংস। গৌতম বুদ্ধের দন্তধাতু সম্পর্কিত ইতিবৃত্তের সঙ্গে সিংহলের ইতিহাস এই গ্রন্থে আলোচিত। দাঠাবংস সিংহলের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য।

সহজ পালিতে একাদশ পরিচ্ছেদে রচিত হত্থবনগল্লবিহারবংসে রাজা সিরিসংঘবোধির (শ্রীসঙ্ঘবোধি) কাহিনী লিপিবদ্ধ।

ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে রচিত বুদ্ধঘোষুপ্পত্তি সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর বৈয়াকরণ মহামঙ্গলের রচনা। মিলিন্দপঞ্হো এবং মহাবংসকে ভিত্তি করেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

বুদ্ধের নানা উক্তি ও উপদেশ সংগ্রহ করে সদ্ধম্মসংগহ রচিত। গ্রন্থটি গদ্য এবং পদ্যে ধম্মকিত্তি কর্তৃক রচিত এবং বৌদ্ধসঙ্গীতি থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এখানে বলা হয়েছে।

সন্দেস-কথার অধিকাংশই গদ্যে রচিত। এই গ্রন্থে অনুরুদ্ধ রচিত অভিধম্মত্থসংগহ, সুমঙ্গলসামী রচিত অভিধম্মত্থবিভাবিনী প্রভৃতি গ্রন্থের উপর আলোচনা আছে। এখানে চীন, ব্রহ্ম, সিংহল, কম্বোজ প্রভৃতি দেশের উল্লেখ আছে।

ছ-কেস-ধাতুবংস ব্রহ্মদেশের কোন অজ্ঞাতনামা বৌদ্ধাচার্যের রচনা। গদ্য এবং পদ্যে রচিত গ্রন্থটির ভাষা ও রচনাশৈলী উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধের

কেশ-ধাতুর (hair relics) উপর সক্ক (শক্র), বরুণ, নাগরাজ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত স্তূপগুলির কাহিনী এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

পাঁচ অধ্যায়ে রচিত 'গন্ধবংস বা গ্রন্থের বিবরণ ব্রহ্মদেশের একটি আধুনিক পালি গ্রন্থ। পালি সাহিত্যের পরিচয়লাভের পক্ষে গ্রন্থটি মূল্যবান। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে পালি গ্রন্থাবলীর একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। নন্দপঞ্ঞ্ঞ নামে কোন এক ভিক্ষু এটির রচয়িতা।

সাসনবংস বা বুদ্ধের 'শাসনে'র ইতিহাস ব্রহ্মদেশের একটি উল্লেখযোগ্য পালি গ্রন্থ। ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ের সঙ্ঘরাজ বিহারের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত থের পঞ্ঞ্ঞাসামি (প্রজ্ঞাস্বামী) ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনটি বৌদ্ধ সংগীতিই এতে আলোচিত। অশোকের সময় প্রেরিত ধর্মপ্রচারকরা নয়টি অঞ্চলে গিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে, এর মধ্যে পাঁচটি অঞ্চলকে গ্রন্থকার ইন্দো-চীন ভূখণ্ডে স্থাপন করেছেন। ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ও প্রসারই গ্রন্থটির প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য দেশ বিশেষ করে সিংহলের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও আলোচনা আছে।

(ঘ) সংকলন গ্রন্থ (Compendiums, manuals)

খুদ্দকপাঠ, পাতিমোক্খ, অভিধম্ম-গ্রন্থ, প্রভৃতিকে আমরা সংকলন গ্রন্থ, manual ইত্যাদি নামে অভিহিত করতে পারি। সাহিত্য যখন বিস্তার লাভ করে তখন প্রয়োজনীয় শিক্ষা বা উপদেশগুলি মনে রাখার জন্য এই রকম সংকলনগ্রন্থের প্রয়োজন হয়। পালি সাহিত্যের বিশেষ করে অভিধম্ম বা প্রজ্ঞাবিষয়ক শিক্ষার সাহায্যের জন্য বেশ কয়েকটি *manual* রচিত হয়। আমরা এর আগে বুদ্ধদত্তের *manual*গুলির পরিচয় দিয়েছি। এখানে অন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের কথা বলা হ'বে।

পাঁচ অধ্যায়ের সচ্চসংখেপ (সত্যসংক্ষেপ) থের ধম্মপালের রচনা। ৮ গাথায় রচিত এই গ্রন্থে 'সত্যে'র আলোচনা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হ'ল নিব্বান। 'সদ্ধম্মসংগহ' অনুসারে স্বয়ং আনন্দ এই গ্রন্থের রচয়িতা।

থের অনুরুদ্ধ রচিত অভিধম্মত্থসংগহ বৌদ্ধ মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের আলোচনার পক্ষে একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলে এই গ্রন্থটির বিশেষ সমাদর আছে এবং একে কেন্দ্র করে বহু টীকা, টিপ্পনী ও আলোচনা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অনুরুদ্ধ কাঞ্চীপুরে বাস করার সময় আরও দুটি দর্শনের গ্রন্থ রচনা করেন এই তথ্য ছাড়া গ্রন্থকার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না। তিনি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য থাকলেও বিসুদ্ধিমগ্‌গের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং গ্রন্থদু'টিকে পরস্পরের পরিপূরক বলা যায়। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে আগ্রহী সকলের পক্ষে গ্রন্থদু'টি অবশ্য পাঠ্য।

১৮৮৫টি শ্লোকে রচিত নামরূপপরিচ্ছেদ অনুরুদ্ধের আর একটি অভিধম্ম -বিষয়ক গ্রন্থ।

চিত্ত এবং চেতসিক নিয়ে আলোচনা করে থের খেমাচরিয় (ক্ষেমাচার্য) নামরূপপসংসা রচনা করেন।

নির্বাচিত কয়েকটি সুত্তের সংগ্রহ হ'ল সুত্তসংগহ। পালি শাস্ত্রগ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই সংগ্রহে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ উপাসকদের কাছে পরিত্ত বা মহাপরিত্ত সব থেকে বেশী পরিচিত পালি গ্রন্থ। সুত্তপিটকের কিছু অংশ এই গ্রন্থে সংক্ষেপে অন্তর্ভুক্ত। মিলিন্দপঞ্‌হ অনুসারে স্বয়ং বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের পরিত্ত সম্পর্কে উপদেশ দেন।

কম্মবাচা (কর্মবাক্য) একটি ক্ষুদ্র সংকলন গ্রন্থ। নানাবিধ সঙ্ঘকর্ম, সঙ্গীতির আহ্বান, উপসম্পদা দান প্রভৃতির জন্য কী 'বাক্য' ব্যবহৃত হ'বে তা' এই গ্রন্থে সংগৃহীত। বাক্যগুলি সাধারণভাবে মহাবগ্‌গ এবং চুল্লবগ্‌গ থেকে উদ্ধৃতি। প্রয়োজনীয় 'বাক্য'গুলি এক জায়গায় সংগৃহীত হওয়ার জন্যই গ্রন্থটির আকর্ষণ।

ব্রহ্মদেশের পেগু প্রদেশের কল্যাণী শিলালেখে প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির তালিকায় সামালঙ্কারপকরণের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ সংঘের পবিত্র সীমা গ্রন্থটির বিষয়বস্তু।

খুদ্দকসিক্‌খা এবং মূলসিক্‌খা বিনয়ের দুটি ছোট সংকলন। ধম্মসিরি নামে একজন সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষু খুদ্দকসিক্‌খা রচনা করেন। ব্রহ্মদেশের ঐতিহ্য মতে ধম্‌মসিরি হ'লেন মূলসিক্‌খার রচয়িতা এবং মহাসামি নামে অন্য একজন সিংহলী খুদ্দকসিক্‌খা রচনা করেন। গ্রন্থ দুইটির অধিকাংশই শ্লোকে রচিত।

(ঙ) কাব্যগ্রন্থ

পালি বৌদ্ধ সাহিত্য প্রধানতঃ ধর্মীয় সাহিত্য এবং থেরবাদী মতে কী ভাবে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় তার নির্দেশ এই সাহিত্যে আছে। সেইদিক থেকে কোন বিশুদ্ধ কাব্যগ্রন্থের অস্তিত্ব এই সাহিত্যে আশা করা যায় না। কিন্তু থেরগাথা, থেরীগাথা, উদান প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা করলে দেখা যায় যে এই সাহিত্যের প্রথম দিকের রচনাতেও উত্তম কবিপ্রতিভার প্রমাণ আছে। খৃঃ দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত কাব্যগুলি পালি লেখকদের প্রভাবিত করেছিল এবং সিংহলে ঐ সময়ের মধ্যে বেশ কিছু ভাল কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পালি কাব্যগ্রন্থগুলিতে সংস্কৃত কাব্যের বিশেষ করে কালিদাসের রচনার প্রভাব সুস্পষ্ট। অধিকাংশই অবশ্য বৌদ্ধধর্মের ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রচারের জন্যই লেখা হয়। এর মধ্যে সংস্কৃত 'শতকে'র অনুকরণে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে পালি কাব্যগ্রন্থগুলির সব কটিই সিংহলদেশে রচিত। পালি সাহিত্যের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অনাগতবংস, জিনচরিত, তেলকটাহগাথা, পজ্জমধু, রসবাহিনী, সদ্ধম্মোপায়ন, পঞ্চগতিদীপন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমরা এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

অনাগতবংস শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বুদ্ধবংসের পরিপূরক হিসেবেই বিবেচিত হয়। পুঁথিতে গ্রন্থটির অন্ততঃ চারটি সংস্করণ পাওয়া যায়। একটির সঙ্গে অপরটির মিল নেই। নিকায়ের গদ্য রীতিতে রচিত সংস্করণে মধ্যে মধ্যে কিছু গাথা আছে। সারিপুত্ত এবং বুদ্ধের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু উপস্থাপিত। এই আলোচনার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মহিমা, সাহিত্য, এই ধর্মের ভবিষ্যৎ প্রভাব ইত্যাদি নানা বিষয়ের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের

তিরোভাবের কথাও আছে। গদ্যে রচিত আর একটি সংস্করণে মেত্তেয় (মৈত্রেয়) সহ 'অনাগত' দশজন বুদ্ধের জীবন-বৃত্তান্ত এক একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে। অনাগতবংসের যে সংস্করণটি সাধারণভাবে আদৃত তা'তে ১৪২টি গাথায় ভবিষ্যৎ মেত্তেয় বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত বলা হয়েছে। গন্ধবংস অনুসারে মূল অনাগতবংস কস্‌সপ নামে একজন স্থবিরের রচনা। সারিপুত্ত ও বুদ্ধের কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচিত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বুদ্ধবংসের রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বুদ্ধরক্‌খিতের জিনালংকার দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত। কাব্যরীতির (ornate poetry) সাধারণ নিদর্শন এই গ্রন্থে আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় ২৫০টি শ্লোকে বুদ্ধ-কাহিনী বর্ণিত। মহাযানী ভাবধারা কাব্যটিতে লক্ষ্য করা যায় এবং পুরাণের মত অতিরঞ্জনে গ্রন্থটি পূর্ণ।

বুদ্ধচরিতে সংস্কৃত কাব্য-রীতির যে বিকাশ দেখা যায় পালি কাব্য জিনচরিতে পালি কাব্য-রীতির সেই রকম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ছন্দে ৪১০টি শ্লোকে এই কাব্যে বুদ্ধের জীবনী বলা হয়েছে এবং এই বুদ্ধ-কাহিনী জাতক-নিদানকথার কাহিনী অবলম্বনে বর্ণিত। গন্ধবংস এবং সদ্ধম্মসংগহ অনুসারে জিনচরিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বনরতন মেধংকর কর্তৃক রচিত। এটি একটি ভক্তিমূলক কাব্য। বুদ্ধ সম্বন্ধে কোন নতুন তথ্য অবশ্য এখানে পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে জিনচরিত পরিচিত ছিল না বলে মনে হয়।

পঞ্চগতিদীপন ১১৪টি গাথায় বিরচিত। কাব্যটির লেখক ও সময় অজ্ঞাত। কাব্যটিতে ছোট-বড় নরক এবং অন্যান্য 'লোকে'র বর্ণনা আছে। পুনর্জন্ম হওয়ার সময় নরক, তির্যক, প্রেত, অসুর এবং মনুষ্য প্রভৃতি যে পাঁচটি 'গতি' বা অবস্থা মানুষ পায় তার কথা এখানে আছে। একই বিষয়বস্তু নিয়ে চতুর্দশ শতাব্দীতে মেধংকর ব্রহ্মদেশে লোকদীপসার রচনা করেন। 'দশ পারমিতা' নিয়ে চতুর্দশ শতাব্দীতে ধম্‌মকিত্তি পারমি-মহাশতক রচনা করেন। বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ও নীতিধর্ম অবলম্বন করে বুদ্ধসোমপিয় ৬২৯টি গাথায় সদ্ধম্মোপায়ন নামে একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য রচনা করেন।

গ্রন্থটির ভাষা, রচনাশৈলী বিষয়বস্তুর আলোচনা পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বুদ্ধপ্পিয়-রচিত পজ্জমধু (পদ্যমধু) একটি ছোট কাব্যগ্রন্থ। ১০৪টি শ্লোকে কবি বুদ্ধের গুণকীর্তন করেছেন। সংস্কৃতানুগ পালিভাষায় রচিত গ্রন্থটির রচনারীতি কৃত্রিমতাপূর্ণ। বুদ্ধপ্পিয় আনন্দের শিষ্য এবং 'রূপসিদ্ধি' শীর্ষক ব্যাকরণের গ্রন্থকার বলে উল্লিখিত[১৬]।

৯৮টি গাথায় রচিত তেলকটাহগাথা বৌদ্ধধর্ম নিয়ে রচিত আর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মনুষ্যজীবনের অসারতা গ্রন্থটির মুখ্য বক্তব্য। বিষয় বস্তু নয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। গ্রন্থটি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা। সুন্দর ভাষা, ছন্দোমাধুর্য এবং অনুপ্রাসের নিপুণ প্রয়োগ গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। কল্যাণিয় নামে এক বিশিষ্ট স্থবিরের ধর্মসাধনা ও উপদেশের কথা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সিংহলের এক রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সহায়তা করার অভিযোগে কল্যাণিয় থেরকে তপ্ত তৈলের কটাহে নিক্ষেপ করা হয়। রসবাহিনী, মহাবংস প্রভৃতি গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শিক্ষার মূল তত্ত্বগুলি এখানে আলোচিত।

পরবর্তী যুগের পালি কাব্যের মধ্যে রসবাহিনী উল্লেখযোগ্য। এতে ১০৩টি কাহিনী আছে, এর মধ্যে প্রথম ৪০ টির ঘটনার স্থান ভারতবর্ষ এবং পরবর্তী ৬৩ টি সিংহলের। মূল গ্রন্থটি সিংহলী ভাষায় রচিত এবং ভিক্ষু রট্‌ঠপাল (রাষ্ট্রপাল) এটির পালি অনুবাদ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে থের বেদেহ পালি অনুবাদটি সংশোধন করলেও গ্রন্থটির ভাষা দুষ্ট থেকে গেছে। গাথা এবং গদ্যে মিশ্রিত এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে একটি উপদেশাবলীর সংকলন। এই উপদেশগুলি বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে প্রচারিত। এই গ্রন্থের অনেকগুলি কাহিনী বুদ্ধঘোষের অট্‌ঠকথা, মহাবংস প্রভৃতি পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ ও সিংহলদেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক উপাদান থাকার জন্য গ্রন্থটি সিংহলে বহুল প্রচারিত।

প্রাচীন কাল থেকেই জাতকের অফুরন্ত কাহিনীর ভাণ্ডার পালি ভাষার কবি ও সাহিত্যিকদের উপাদান জুগিয়ে এসেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে

নিদান-কথার সুমেধ-কথা অবলম্বনে কবি সীলবংস (শীলবংশ) বুদ্ধালংকার নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। প্রায় ঐ সময়েই কবি রট্‌ঠসার (রাষ্ট্রসার) কয়েকটি জাতকের কাব্যরূপ দেন।

(চ) ব্যাকরণ

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে পালিভাষায় ক্রমে ক্রমে যে বিপুল গ্রন্থাবলী লেখা হ'ল তার সুগমতার জন্য ব্যাকরণ গ্রন্থও লেখা হ'তে থাকল। সংস্কৃত ব্যাকরণের মত পালিভাষার ব্যাকরণও পালি ভাষায় লেখা হ'ল। পালি ব্যাকরণগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের বিশেষ করে পাণিনির পদ্ধতি অনুসরণ করেই লেখা হয়েছে।

পালি-ব্যাকরণের সংখ্যা কম নয়, সুভূতি তাঁর 'নামমালা'র ভূমিকায় পঞ্চাশটিরও বেশী পালি-ব্যাকরণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। তার মধ্যে কচ্চায়ন, মোগ্‌গল্লান ও সদ্দনীতি এই তিনখানি ব্যাকরণই প্রধান। কচ্চায়ন-ব্যাকরণ অবলম্বন করে রূপসিদ্ধি মহানিরুত্তি, চূলনিরুত্তি, নিরুত্তিপিটক, বালাবতার প্রভৃতি, মোগ্‌গল্লান অবলম্বনে মোগ্‌গল্লান বুত্তি, পয়োগসিদ্ধি, পদ-সাধনী, সুসদ্দসিদ্ধি প্রভৃতি এবং সদ্দনীতিকে ভিত্তি করে চূলসদ্দনীতি লেখা হয়। সমস্ত পালি ব্যাকরণের মধ্যে কচ্চায়ন প্রাচীনতম, কিন্তু ব্যাকরণ হিসেবে রূপসিদ্ধি, মোগ্‌গল্লানবুত্তি, পয়োগসিদ্ধি বেশী উপযোগী, আর সদ্দনীতি শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ রূপে সমাদৃত।

খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের পূর্বে পালি ব্যাকরণের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল বলে মনে হয় না[১৭]। কচ্চায়ন-ব্যাকরণ বুদ্ধের সমসাময়িক ও তাঁর শিষ্য কচ্চায়ন রচনা করেন বলে উল্লিখিত হলেও কচ্চায়ন-ব্যাকরণ এত প্রাচীন বলে স্বীকার করা সম্ভব নয়। বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়ন ও বৈয়াকরণ কচ্চায়ন একই ব্যক্তি বলে মনে করা যায় না [১৮]। বুদ্ধঘোষ, ধম্মপাল প্রমুখ টীকাকারগণ স্পষ্টতঃই পাণিনি ব্যাকরণকে অনুসরণ করেছেন। কচ্চায়ন ব্যাকরণের বহু সূত্র অষ্টাধ্যায়ী ও কাতন্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। কচ্চায়ন ব্যাকরণ সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও কম্বোজে বহুকাল থেকে প্রচলিত। সন্ধিকপ্প, নামকপ্প আখ্যাতকপ্প ও কৃৎবিধানকপ্প এই চার অধ্যায়ে বিভক্ত কচ্চায়ন ব্যাকরণ

অবশ্যই সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে রচিত, কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে পালির যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক সে দিকে এই ব্যাকরণে বিশেষ আলোকপাত করা হয়নি। কচ্চায়ন মহানিরুত্তিগন্ধ ও চুল্লনিরুত্তিগন্ধ নামে আর দুইটি ব্যাকরণ রচনা করেন বলে উল্লেখ আছে। বিমলবুদ্ধি কচ্চায়ন ব্যাকরণের উপর ন্যাস বা মুখমত্থদীপনী নামে একটি টীকা রচনা করেন।

কচ্চায়ন-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যাকরণ রূপসিদ্ধি বা পদরূপসিদ্ধির গ্রন্থকর্তা বুদ্ধপ্রিয় দীপংকর। পজ্জমধুর রচয়িতা ত্রয়োদশ শতাব্দীর বুদ্ধপ্রিয় ও বৈয়াকরণ বুদ্ধপ্রিয় সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। এই ব্যাকরণ সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কচ্চায়ন ব্যাকরণের আদর্শে রচিত বালাবতার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ[১৯]। পালি ঐতিহ্যমতে ব্যাকরণটি সদ্ধম্মসংগহের গ্রন্থকার ধম্মকিত্তির রচনা, আবার গন্ধবংসে বাচিস্‌সরকে এই ব্যাকরণের রচয়িতা বলে উল্লেখ করা আছে। কচ্চায়ন অবলম্বনে রচিত অন্য কয়েকটি ব্যাকরণ হ'ল কচ্চায়নভেদ, বালপ্‌পবোধন, সদ্দবিন্দু, সদ্দমালা, সদ্দত্থভেদচিন্তা, সম্বন্ধচিন্তা ইত্যাদি।

দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহলরাজ প্রথম পরক্কমবাহুর সময় মোগ্‌গল্লান তাঁর মোগ্‌গল্‌লায়ন-ব্যাকরণ বা সদ্দলক্‌খণ রচনা করেন। গ্রন্থটির একটি বৃত্তি ছাড়া তিনি মোগ্‌গল্‌লায়ন পঞ্চিকা নামে একটি টীকাও রচনা করেন। ব্যাকরণ হিসেবে কচ্চায়ন অপেক্ষা মোগ্‌গল্‌লান শ্রেষ্ঠ। পূর্ববর্তী পালি ব্যাকরণ, পাণিনি ও কাতন্ত্র ছাড়া মোগ্‌গল্‌লান সংস্কৃত চান্দ্র ব্যাকরণের বহুল ব্যবহার করেছেন।

মোগ্‌গল্‌লান-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যাকরণের মধ্যে মোগ্‌গল্‌লান শিষ্য পিয়দস্‌সির পদসাধনা, রাহুল রচিত পদসাধনটীকা প্রভৃতির নাম করা যায়। বনরতন মেধংকর রচিত পয়োগসিদ্ধি এই সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট ব্যাকরণ।

অগ্‌গবংস রচিত সদ্দনীতি নিঃসন্দেহে পালি ব্যাকরণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করতে পারে। পণ্ডিতদের মতে সদ্দনীতি কচ্চায়নের গ্রন্থকে ভিত্তি করেই রচিত। গ্রন্থকার ব্রহ্মদেশের অরিমদ্‌দন অঞ্চলের দ্বাদশ শতাব্দীর লোক এবং তাঁর ব্যাকরণ চর্চায় সিংহলী বৈয়াকরণদের কোন প্রভাব ছিল না বলে মনে করা হয়। ২৭ অধ্যায়ে বিভক্ত সদ্দনীতির প্রথম

১৮টিকে মহাসদ্দনীতি এবং পরবর্তী ৯টিকে চুল্লসদ্দনীতি বলা হয়। ব্রহ্মদেশে এই ব্যাকরণের বিশেষ সমাদর ও প্রভাব আছে[২০]।

(ছ) বিবিধগ্রন্থ—অভিধান, ছন্দঃ, অলঙ্কার

পালি ব্যাকরণের মত পালি অভিধান, ছন্দঃ ও অলঙ্কার গ্রন্থ প্রভৃতি সংস্কৃত অভিধান ইত্যাদির অনুকরণে বা আদর্শেই রচিত[২১]।

যাস্ক রচিত নিরুক্তের নিঘন্টু অংশকে যেমন প্রাচীনতম অভিধান শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থ বলে মনে করা হয়, সেইরকম 'নেত্তি'-র বেবচনহার-কে পালি অভিধানের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যায়। পালি অভিধান শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে অভিধানপ্‌পদীপিকা শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত অমরকোষের আদর্শেই গ্রন্থটি সিংহলে রচিত। গ্রন্থকর্তা মোগ্‌গল্লান বৈয়াকরণ মোগ্‌গল্লান নন এবং সম্ভবতঃ ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক। গ্রন্থটি প্রতিশব্দ, সমশব্দ ও নিপাত এই তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে এই অভিধান বিশেষ সমাদৃত।

ব্রহ্মদেশের সদ্ধম্মকিত্তি রচিত একক্‌খর-কোস একটি উল্লেখযোগ্য কোষগ্রন্থ। এই গ্রন্থটিও সংস্কৃত গ্রন্থের আদর্শে রচিত। রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী।

অভিধানের মত ছন্দঃ ও অলঙ্কার শাস্ত্রেও পালিগ্রন্থ খুবই কম লেখা হয়েছিল। থের সঙ্ঘরক্খিতের বুত্তোদয় পালি ছন্দঃ শাস্ত্রের একমাত্র গ্রন্থ হিসেবেই বর্তমানে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহলে বৈয়াকরণ মোগ্‌গল্লান তাঁর সন্ন্যাস নাম সঙ্ঘরক্‌খিত দিয়েই বুত্তোদয় রচনা করেন। কেদার ভট্টের সংস্কৃত 'বৃত্তারত্নাকর' অবলম্বন করে এই গ্রন্থ রচিত। ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটিতে ১৩৬টি গাথা আছে। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কামন্দকী ও ছন্দোবিচিতির নাম করা যায়। অলঙ্কার শাস্ত্রেও থের সঙ্ঘরক্‌খিতের সুবোধালংকার শ্রেষ্ঠ পালি গ্রন্থ। বুত্তোদয়, সুবোধালংকার ছাড়া সঙ্ঘরক্খিত পালি ব্যাকরণ ও অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করেন।

১। Winternitz, HIL, II, p 174

২। ঐ, 175

৩। Law, HPL. II, 353

৪। Winternitz, ঐ, p 176

৫। ঐ

৬। ঐ

৭। Law, ঐ, 355

৮। Winternitz, ঐ, 176

৯। ঐ, 183

১০। JRAS. 1925, p 111

১১। Winternitz, ঐ, 189

১২। ঐ, 184

১৩। ঐ

১৪। বুদ্ধঘোষের জীবনী সম্বন্ধে B. C. Law এর Life of Buddhaghoṣa দ্রষ্টব্য

১৫। B. C. Law, HPL. II, 561 ; Winternitz, HIL, II, 218

১৬। B. C. Law, HPL, II, 624

১৭। ঐ, 637

১৮। W. Geiger, PLL, p 37

১৯। ঐ, p 51

২০। ঐ, p 55

২১। পালি ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি সম্বন্ধে W. Geiger, PLL, pp 49-58 দ্রষ্টব্য

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাকৃত সাহিত্য

উপক্রমণিকা

প্রাকৃত ভাষা সাধারণভাবে জনগণের ভাষা[১] বলে চিহ্নিত হ'লেও প্রাকৃত সাহিত্যকে কোনরকমেই গণ সাহিত্য (Folk Literature) বলা যায় না। ব্যাপক অর্থে পালিও এক প্রকারের প্রাকৃত ভাষা কিন্তু প্রাকৃত সাহিত্যের আলোচনায় পালি সাহিত্যকে ধরা হয় না। বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও বিপুলতার সাহায্যে পালি সাহিত্য তার স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত।

সাহিত্যে প্রাকৃত ভাষার প্রথম ব্যবহার

প্রাকৃত সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। সাহিত্যে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা' নির্ণয় করা দুরূহ। সম্রাট অশোকের সময়েই সম্ভবতঃ প্রথম প্রাকৃত ভাষায় জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তবে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার সংস্কৃত নাটকে যেভাবে করা হয়েছে তা'তে মনে হয় নাটকের মাধ্যমেই প্রাকৃত ভাষা প্রথম 'শিষ্ট-সাহিত্যে প্রবেশ করার'[২] সুযোগ পেয়েছিল।

প্রাকৃত ভাষা ও প্রাকৃত সাহিত্যের উৎকর্ষ

প্রত্নলেখ বা Inscriptionকে সাধারণতঃ সাহিত্যের আলোচনার মধ্যে স্থান দেওয়া হয় না। সে বিচারে "খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত 'ধ্রুবা' গানগুলিকেই আপাততঃ প্রাকৃত সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বলে"[৩] কেউ কেউ মনে করেন। প্রাকৃত ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রাচীনত্ব যাই হোক্ প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য কিন্তু কম নয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকারেরা প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যের

উৎকর্ষ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহারের বিধান সংস্কৃত নাট্যকারেরা সম্ভবতঃ দু'টি প্রয়োজনে মেনে নিয়েছিলেন। কথ্য ভাষা হিসেবে নাটকের সাধারণ ও অশিক্ষিত চরিত্রগুলির মুখে প্রাকৃত ভাষাই শোভা পায় এবং দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃত ভাষার মাধুর্য বিশেষ করে প্রাকৃতে রচিত গানের আকর্ষণী শক্তি উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি। কোন কোন গ্রন্থে[৪] প্রাকৃত ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করা হলেও বহু বিশিষ্ট সংস্কৃত কবি ও সাহিত্যিক মুক্তকণ্ঠে প্রাকৃত ভাষার প্রশংসা করেছেন।

গাথা সপ্তশতীতে[৫] সাতবাহন বা হাল প্রাকৃত কাব্যের বিরুদ্ধবাদীদের নিন্দা করে বলেছেন,

অমিঅং পাউঅ-কব্বং পঢিউং সোউং অ জে ণ আণন্তি।
কামস্স তত্ততন্তিং কুণন্তি তে কহঁ ণ লজ্জন্তি॥

[প্রাকৃত কাব্য অমৃত স্বরূপ, এই কাব্য যাঁরা পাঠ করতে বা শুনতে জানেন না, কামশাস্ত্রের তত্ত্বচিন্তা করতে প্রবৃত্ত তাঁরা কেন লজ্জিত হ'ন না।]

বাণভট্টের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ সাহিত্যিক তাঁর হর্ষচরিতের ভূমিকায় গাথা সপ্তশতীর ও সেতুবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

রাজশেখর প্রাকৃত ভাষার উৎকর্ষ নিরূপণ করে বলেছেন[৬],

পরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরুসমহিলাণং জেত্তিয়মিহন্তরং তেত্তিয়মিমাণং॥

[সংস্কৃতভাষা পরুষ, প্রাকৃতরচনা সুকোমল; পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে প্রভেদ এদের মধ্যেও সেই প্রভেদ।]

প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে বাক্‌পতিরাজের[৭] মন্তব্য উল্লেখযোগ্য,

সয়লাওো ইমং বায়া বিসন্তি এত্তো য ণেন্তি বায়াওো।
এন্তি সমুদ্দং চিয় ণেন্তি সায়রা সোচ্চিয় জলাইং॥

[সকল ভাষা প্রাকৃতে প্রবেশ করে, প্রাকৃত থেকেই সকল ভাষার উৎপত্তি; যেমন, সকল জল সমুদ্রে প্রবেশ করে আবার সমুদ্র থেকেই তার উৎপত্তি।]

বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা

আমরা পূর্বেই বলেছি[৮] যে জৈনদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ ছাড়া আরও বহুপ্রকারের

রচনা প্রাকৃতে হয়েছিল। এই সমস্ত রচনা বিভিন্ন প্রাকৃতে হয়েছিল এবং প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রদেশগত ভাবে বহুপ্রকারের প্রাকৃত প্রচলিত ছিল। অশোকের অনুশাসন, তাম্রপট্ট ও শিলাখণ্ডের বিভিন্ন প্রত্নলেখ, জৈনধর্মগ্রন্থ এবং নাটক ও অন্যান্য সাহিত্যগ্রন্থে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষাগুলিকে আলোচনা করলে আমরা প্রাকৃত ভাষাগুলিকে মোটামুটি এই ভাবে ভাগ করতে পারি,—

(i) ব্যাকরণে উল্লিখিত প্রাকৃত ভাষা সমূহ :

মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, চূলিকা পৈশাচী, অপভ্রংশ, প্রাচ্যা, আবন্তী, শাকারী, চাণ্ডালী, শাবরী, আভীরিকা, ঢক্কী, নাগর, ব্রাচড়, কৈকেয়, পাঞ্চাল, উপনাগর প্রভৃতি।

বররুচি, হেমচন্দ্র ও মার্কণ্ডেয় তাঁদের প্রাকৃত ব্যাকরণে এই প্রাকৃতগুলিকে আলোচনা করেছেন।

(ii) প্রত্নলেখের প্রাকৃত (Inscriptional Prakrit) : অশোকের অনুশাসনে ব্যবহৃত প্রাকৃত (Aśokan Prakrit), খরোষ্ঠী, নীয়া ও খোটান প্রাকৃত, প্রাকৃত ধম্মপদ।

(iii) সঙ্কর প্রাকৃত : পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃতের প্রভাবযুক্ত এক প্রকার সঙ্কর প্রাকৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায়।

(iv) গাথা-প্রাকৃত : ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে এই জাতীয় প্রাকৃত পাওয়া যায়।

Literary ও Dramatic Prakrit

সাহিত্য রচনার জন্য যে প্রাকৃতগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের আমরা সাহিত্যিক প্রাকৃত বা Literary Prakrit নামে অভিহিত করতে পারি[৯]। এই শ্রেণীর প্রাকৃতের মধ্যে প্রধান হ'ল মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, অপভ্রংশ ইত্যাদি। সংস্কৃত নাটকে বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য প্রথম তিনটিকে আবার নাটকের প্রাকৃত বা Dramatic Prakrit বলা যায়।

প্রাকৃত সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ

পালি ছাড়া প্রাকৃত ভাষায় আমরা যে সমস্ত গ্রন্থ পাই সেগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়,—(ক) জৈন আগম বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ; (খ) আগম বহির্ভূত বা সিদ্ধান্তেতর গ্রন্থ ; (গ) প্রত্ন-লেখ মালা।

আগম বহির্ভূত গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে আমরা এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে মোটামুটি এই ভাবে ভাগ করতে পারি,—(i) জৈন-ধর্মীয়-দার্শনিক গ্রন্থ (ii) মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য (iii) গীতি-কাব্য ও নীতিকবিতা (iv) নাটক (v) ব্যাকরণ (vi) বিবিধ—কোষ, ছন্দঃশাস্ত্র প্রভৃতি (vii) অপভ্রংশ সাহিত্য।

প্রাকৃত সাহিত্যের উপর্যুক্ত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করেই আমরা প্রাকৃত সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে পারি।

প্রাকৃত সাহিত্যের প্রধান ও বৃহত্তর অংশ হ'ল জৈন-শাস্ত্র বা সিদ্ধান্ত। প্রাকৃত সাহিত্য প্রধানতঃ জৈন সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিপুষ্ট ও আলোচিত। জৈনসম্প্রদায়-বহির্ভূত কম পণ্ডিতই প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। জৈনদের ধর্মগ্রন্থেই প্রাকৃত সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য এই সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অমূল্য সম্পদকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানোর বিশেষ চেষ্টা এদেশে হয়নি। বস্তুতঃ পশ্চিমভারতের কিছু নিষ্ঠাবান জৈন পণ্ডিত ছাড়া জৈন শাস্ত্রের আলোচনায় ভারতীয় পণ্ডিতদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে জৈনধর্ম ও সাহিত্যের চর্চা

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে Mackenzie, Buchanan, Colebrooke, Wilson-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জৈনধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন১০। এঁদের আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে Böthlingk এবং Rieu ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জার্মাণ অনুবাদ সহ হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি প্রকাশ করেন, আর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কল্পসূত্র ও

নবতত্ত্ব-প্রকরণের ইংরাজী অনুবাদ করেন Stevenson[১১]। ১৮৭৩—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে Bühler বার্লিনের গ্রন্থাগারের জন্য বহু জৈনশাস্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করে জৈন ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করেন[১২]। পুঁথিগুলির উপর Bühler যে বিবরণ লেখেন তার মূল্য অপরিসীম এবং মূলতঃ Bühler এর আদর্শেই Weber ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জৈন সাহিত্যের উপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Über die heiligen Schriften der Jaina* (On the sacred literatures of the Jains) প্রকাশ করেন। Bühler এবং Weber কে অনুসরণ করে যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত জৈনধর্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তাঁদের মধ্যে জার্মাণ পণ্ডিত Jacobiর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কল্পসূত্রের সংস্করণে Jacobi যে 'ভূমিকা' লেখেন পরবর্তীকালের জৈন ধর্ম ও তত্ত্বের আলোচনায় তা' বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেছে[১৩]। জৈনধর্মের আলোচনায় অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে Leumann. Hoernle, Pischel, Hertel, Schubring, von Glasenapp, Winternitz, Alsdorf প্রমুখের নাম ও কৃতিত্ব স্মরণীয়।

তুলনামূলক ভাবে ভারতবর্ষে জৈনশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক নয়, যদিও ১৮৭৪-১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ৪৫ খণ্ডে জৈন শাস্ত্রের সংকলন "আগম সংগ্রহ" প্রকাশিত হয়। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য বিজয়ধর্ম সূরি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের জৈনধর্ম-আলোচনায় বিশেষ সাহায্য করেন[১৪] এবং শ্রী জৈন-যশো-বিজয় গ্রন্থমালায় স্বয়ং বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মুনিরাজ পুণ্যবিজয়, মুনি জিনবিজয়, মুনি রত্নচন্দ্র, বিজয়রাজেন্দ্র সূরি, বিজয়ানন্দ সূরি প্রমুখ জৈন-পণ্ডিতগণ জৈনধর্মের আলোচনার প্রসারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। অন্যান্য যাঁরা এই বিষয়ে কৃতিত্বের অধিকারী তাঁদের মধ্যে R. G. Bhandarkar, S. R. Bhandarkar, H. Kapadia. Velankar. G. L. Jaini, P. C. Nahar, K. C. Ghosh, H. L. Jain প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। জৈন এবং অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার আলোচনার জন্য পণ্ডিত হরগোবিন্দ দাস শেঠ কৃত পাইঅ-সদ্দ-মহণ্ণবো (প্রাকৃত-হিন্দী অভিধান) এবং ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ মুনি রত্নচন্দ্রের অর্ধমাগধী অভিধান বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী!

জৈন ধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় কয়েকটি গবেষণা-পত্রিকা ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যায়। অনেকান্ত, জৈন হিতৈষী, Jain Antiquary প্রমুখ গবেষণা-পত্রিকা জৈন সাহিত্য ও জৈন লেখকদের সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছেন। যশোবিজয় গ্রন্থমালার নাম পূর্বেই বলা হয়েছে; তা ছাড়া আত্মানন্দ গ্রন্থরত্নমালা, সনাতন জৈন গ্রন্থমালা ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। আগমোদয় সমিতি, জৈন ধর্ম প্রসারক সভা, জৈন বিদ্যাপ্রসারক বর্গ, জৈন জ্ঞান প্রসারক বর্গ, জৈন বিদ্যাশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

জৈনধর্ম ও মহাবীর

জৈনধর্ম অতি বিস্তীর্ণ এবং সম্প্রদায় হিসেবে খুব প্রাচীন। বৌদ্ধ সাহিত্যে নিগণ্‌ঠ নাতপুত্তকে অনেক জায়গায় গৌতম বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন জৈনশাস্ত্রে এবং অশোকের শিলা-লিপিতে সে যুগের জৈনদের নির্গ্রন্থ (নিগণ্‌ঠ) অর্থাৎ গ্রন্থি বা বন্ধনহীন শ্রমণরূপে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। নিগণ্‌ঠ নাতপুত্তই জৈনধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা মহাবীর এবং তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন বলে মনে করা হয়[১৫]। মহাবীর জৈন ধর্মের প্রবর্তক নন, তাঁকে আমরা জৈনধর্মের প্রধান সংস্কারক ও শক্তিমান প্রচারক বলতে পারি। প্রাচীনতর 'নিগণ্‌ঠ' সম্প্রদায় থেকেই গৌতম বুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে জৈনধর্ম উদ্ভূত হয় এমন কথা অনেকে বলেন[১৬]। জৈনদের অবশ্য বিশ্বাস তাঁদের ধর্ম অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণ বিচার করে দেখলে মনে হয় মহাবীর গৌতম বুদ্ধের পূর্বেই প্রচারজীবন আরম্ভ করেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময়ের মত মহাবীরের দেহাবসানের সময় নির্ণয় করাও সহজসাধ্য নয়। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে নিগণ্‌ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা পার্শ্ব মহাবীরের ২৫১ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হন। মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক কালে ধর্ম-বিষয়ক সত্য উপলব্ধি করার জন্য লোকের মনে একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল। 'ক্রিয়াকাণ্ডময় বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে চিন্তাশীল লোকের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত'[১৭] হতে পারেনি।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিক-ধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে প্রচারিত হয়ে সে যুগের লোককে সহজেই আকৃষ্ট করে ছিল ।

'বুদ্ধ' ও 'জিন'

'বুদ্ধ' অর্থাৎ 'বোধি' বা জ্ঞানপ্রাপ্ত এবং 'জিন' অর্থাৎ 'বিজয়ী' প্রথম প্রথম গৌতম ও মহাবীর উভয়ের বিশেষণ হিসেবেই ব্যবহৃত হোত। কালক্রমে 'বুদ্ধ' গৌতমের সংজ্ঞা এবং 'জিন' মহাবীরের পরিচয় রূপে স্বীকৃত হ'ল এবং মহাবীরের শিষ্যদের 'জৈন' বলে অভিহিত করা হ'ল।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম

জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এত বেশী সাদৃশ্য ও সাধারণ লক্ষণ আছে যে বহুদিন পর্যন্ত জৈনদের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি শাখা (Sect) বলে মনে করা হোত। Weber এর মত পণ্ডিতও এই মত পোষণ করতেন[১৮]।

বহু সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মৌলিক শিক্ষার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। জৈনরা সন্ন্যাস ও অন্যান্য চর্যার উপর বৌদ্ধদের থেকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। বৌদ্ধরা 'আত্মা-র' (Soul) অস্তিত্বে বিশ্বাসী ন'ন কিন্তু জৈনদের 'আত্মা' সম্বন্ধে বিশেষ বিশ্বাস আছে। 'অহিংসা'-কে ধর্ম ও নীতি হিসেবে পালনের ব্যাপারেও জৈনরা অন্যান্যদের থেকে বেশী তৎপর ও অগ্রসর। জৈনরা বলেন যে তাঁদের ধর্ম কেবল মানুষ নয় বিশ্বের তাবৎ প্রাণী, এমন কী দেবতা ও নরকের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যেও প্রচারিত। বৌদ্ধধর্মও মানুষের মুক্তির পথ বলে বৌদ্ধরা মনে করেন। বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মের প্রসার কিন্তু ভারতের বাইরে হয়নি। বৌদ্ধধর্ম একপ্রকার বিশ্বধর্মে (World Religion) পরিণত হয়। হিন্দুসমাজের বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা জৈনদের মধ্যেও দেখা যায় কিন্তু বুদ্ধ এই প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। ব্রাহ্মণ্য তথা হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রবণতা বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈনদের মধ্যেই বেশী লক্ষ্য করা যায়।

জৈনধর্মের মূল প্রাক্‌-বৌদ্ধ যুগের হলেও প্রাচীন কোন জৈনশাস্ত্র আমাদের হস্তগত হয়নি। বর্তমানে প্রচারিত জৈনশাস্ত্র অনেক পরবর্তী কালের রচনা বলেই মনে হয়, যদিও খণ্ডাকারে প্রাচীন শাস্ত্রের কিছু অংশ সংরক্ষিত আছে। অধিকাংশ জৈন-শাস্ত্রগ্রন্থই নীরস ও শুষ্ক এবং বৌদ্ধগ্রন্থগুলির বর্ণনা বা বক্তব্যের মধ্যে যে সজীবতা ও মানবিক আকর্ষণ উপলব্ধি করা যায় এই গ্রন্থগুলিতে তা' একরকম নেই বললেই হয়। বিশেষজ্ঞদের পক্ষে গ্রন্থগুলির মূল্য যাই হোক্‌ না কেন, সাধারণ পাঠক এইগুলির পাঠে কোন আনন্দ বা আকর্ষণ অনুভব করেন না।

জৈনশাস্ত্র ও ভারতীয় ভাষা

ভারতীয় ভাষাগুলির ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের আলোচনার পক্ষে এই গ্রন্থগুলির অবশ্য মূল্য আছে। জৈন গ্রন্থকার ও আচার্যগণ চাইতেন যে সাধারণ লোকে যেন তাঁদের বক্তব্য সহজেই বুঝতে ও আলোচনা করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা সাধারণের বোধগম্য প্রাকৃত ভাষায়, মাগধী ও মাহারাষ্ট্রীতে, তাঁদের বক্তব্য ও নিবন্ধাদি প্রকাশ করতেন। আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী থেকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় এবং তার কিছু পূর্ব থেকে দিগম্বর সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারে এই সব জৈন গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই সুন্দর সাবলীল ভাষায় ও কাব্যরীতিতে গ্রন্থ রচনা করেন। কারো কারো সংস্কৃত ভাষায় আবার প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। খৃষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে জৈন গ্রন্থকারগণ অপভ্রংশ প্রাকৃতের ব্যবহার প্রচলন করেন। পরবর্তী যুগে জৈনগণ আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিকে তাঁদের বক্তব্যের বাহন হিসেবে বেছে নেন এবং বিশেষ করে হিন্দী, গুজরাটি, তামিল ও কানাড়ী সাহিত্য জৈনদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে[১৯]।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে মহাবীর জৈনধর্মের বিশিষ্ট প্রবক্তা ছিলেন, প্রবর্তক ন'ন। জৈনদের বিশ্বাস মহাবীরের পূর্বে আদিনাথ বা ঋষভ থেকে আরম্ভ করে পার্শ্বনাথ পর্যন্ত তেইশ জন তীর্থংকর আচার্য জৈনধর্ম

প্রচার করেন। জগতের দুঃখ থেকে মুক্ত হ'বার 'তীর্থ' যিনি নির্মাণ করেছেন, তিনি হলেন তীর্থংকর। পার্শ্বনাথ ছাড়া অন্যান্য তীর্থংকরদের সম্বন্ধে আমরা নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ পাই না।[২০] এঁদের অতিমানব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পার্শ্বনাথ ও মহাবীর

জৈনধর্মের প্রাচীনত্বের দাবী যাই হোক্ এই ধর্মের উৎপত্তির প্রথম লক্ষণ আমরা পার্শ্বনাথের শিক্ষায় পাই। জৈনশাস্ত্রে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে পার্শ্বনাথ মহাবীরের আড়াইশ' বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ নবম শতকে আবির্ভূত হন। কাশীর এক ক্ষত্রিয় রাজবংশে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম অশ্বসেন, মা ছিলেন বামা এবং পত্নী অযোধ্যার রাজকন্যা প্রভাবতী। ত্রিশ বৎসর বয়সে পার্শ্বনাথ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হ'ন এবং তিন মাস কঠোর সাধনার পর 'কেবল' জ্ঞান বা সিদ্ধি লাভ করেন। বলা হয় যে, তিনি প্রায় সত্তর বৎসর ধরে ধর্মপ্রচার করেন এবং তাঁর বহু শিষ্য ছিল। পার্শ্বনাথের শিক্ষার মূল ছিল চারটি ব্রত, যথা, অহিংসা বা প্রাণীহিংসা না করা, সত্যভাষণ, অচৌর্য বা অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করা, এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ বিষয় সম্পত্তিতে অনাসক্তি। মহাবীর একটি পঞ্চম ব্রতের প্রবর্তন করেন,—ব্রহ্মচর্য। অনেকের মতে ব্রহ্মচর্য হ'ল পার্শ্বপ্রবর্তিত চতুর্থব্রত এবং মহাবীর পঞ্চম ব্রতরূপে অপরিগ্রহ যোগ করেন।

মহাবীরের সময় নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক থাকলেও মোটামুটিভাবে আমরা খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক তাঁর আবির্ভাবকাল বলে মনে করতে পারি। বৈশালীর এক জ্ঞাতৃবংশীয় ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থ ছিলেন মহাবীরের পিতা। বংশের পরিচয়ে বুদ্ধকে যেমন শাক্যপুত্র বলা হত মহাবীর সেইরকম জ্ঞাতৃপুত্র নামে পরিচিত ছিলেন। মহাবীরের মার নাম ছিল ত্রিশলা। মহাবীরের জন্ম সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর মা স্বপ্নে শ্বেতহস্তী, শ্বেতবৃষ, শ্বেতসিংহ প্রভৃতি দেখেন। এমন বৃত্তান্তও পাওয়া যায় যে মহাবীর জন্মগ্রহণ করার জন্য প্রথম এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে আসেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়বংশে তাঁর জন্ম হওয়া

অধিকতর কাম্য মনে করে দেবতারা তাঁকে ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত করেন। মনে হয়, সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'বার পরই মহাবীরের এই গর্ভপরিবর্তন কাহিনী প্রচলিত হয়। জৈনরা সম্ভবতঃ এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে ক্ষত্রিয় রূপে জন্ম নিলেও মহাবীর প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণই ছিলেন। Winternitz এর মতে এই কাহিনী কৃষ্ণজন্মের পৌরাণিক উপাখ্যান থেকেই নেওয়া হয়েছে[২১]। মহাবীরের অপর নাম 'বর্ধমান'। তাঁর নিজের ও বংশের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় এই নাম রাখা হয়ে থাকতে পারে।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে মহাবীর যশোদাকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের অনুজা বা প্রিয়দর্শনা নামে এক কন্যা ছিল। মহাবীরের ভাগিনেয় জমালির সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ হয়। জমালি মহাবীরের শিষ্য হ'ন এবং পরে মহাবীরের সংঘে ভেদ সৃষ্টি করে পৃথক হন। এই মতে মাতাপিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে মহাবীর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

দিগম্বর-দের মতে মহাবীর দার-পরিগ্রহ করেন নি এবং মাতাপিতার জীবিতাবস্থাতেই সন্ন্যাসী হ'ন। সন্ন্যাসজীবনের প্রথম এক বৎসর তিনি পার্শ্বনাথের নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরে তিনি একাকী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করেন। বারো বৎসর কঠোর তপশ্চর্যা ও সাধনার ফলে তিনি পরেশনাথ পাহাড়ের নিকটবর্তী নদীর ধারে একটি শালগাছের মূলে 'কেবলজ্ঞান' বা সিদ্ধিলাভ করেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পর তিনি কেবলী, জিন, তীর্থংকর, বুদ্ধ, অর্হত, বীর প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত হ'ন। দিগম্বর-মতে মহাবীর সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই বস্ত্র পরিত্যাগ করে নগ্ন-ব্রত গ্রহণ করেন, আর শ্বেতাম্বর মতে সন্ন্যাসের ১৩ মাস পরে তিনি নগ্নতা অবলম্বন করেন।

জৈনধর্ম ও মহাবীর

সিদ্ধিলাভের পর মহাবীর তাঁর ধর্মমত প্রচারে ব্রতী হ'ন। তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল নালন্দা-রাজগৃহ অঞ্চল। রাজগৃহ অঞ্চলে সে সময় নানা

ধর্ম-দর্শন চিন্তার আলোচনা প্রচলিত ছিল। নতুন নতুন সম্প্রদায়গুলি সব সময় চেষ্টা করতেন অন্যকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে শিষ্যসংখ্যা বাড়াতে। বুদ্ধও এই অঞ্চলে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেন। ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে পর্যটনের সময় মহাবীর কোন গ্রামে এক রাত্রির ও নগরে পাঁচ রাত্রির অধিক বাস করতেন না। বর্ষাকালে তিনি পর্যটন স্থগিত রাখতেন এবং রাজগৃহ অঞ্চলে তিনি চৌদ্দটি বর্ষা যাপন করেন। বুদ্ধও 'বর্ষাবাসে'র অনুমোদন করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। জৈনরা বলেন যে বর্ষাকালে উদ্ভিদ ও কীট প্রভৃতির বংশবৃদ্ধি হয় এবং এই সময় পর্যটন করলে এদের মধ্যে অনেকের প্রাণনাশ সম্ভব, এই জন্যই মহাবীর বর্ষার সময় তাঁর পর্যটন স্থগিত রাখতেন। কারণ যাই হোক রীতিটি যে জৈনদের পূর্বেও প্রচলিত ছিল এ বিষয় সন্দেহ নেই।

মহাবীরের শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে বহু রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ব্যবসায়ী তাঁর ভক্ত ও শিষ্য হ'ন। বিদেহ, অঙ্গদ, মগধ, কৌশাম্বী প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরা তাঁর ভক্ত ছিলেন এবং দিগম্বরদের বিশ্বাস মগধ সম্রাট বিম্বিসার তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে ছিলেন।

মহাবীর অতি সরল ভাষায় সাধারণের মধ্যে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ প্রচার করতেন। সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় থেকে উপমা ও দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে তিনি সমাজের সর্বস্তরের লোককে শিক্ষা দিতেন। বক্তব্য বিষয়কে বিশ্লেষণ করে প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া তাঁর ব্যাখ্যা-রীতির প্রধান অঙ্গ ছিল। কালক্রমে জৈনাচার্য ও টীকাকারগণ মহাবীরের বক্তৃতা ও উপদেশ থেকে উপমা প্রভৃতি বাদ দিয়ে দিলেন এবং বিশ্লেষণরীতি অবলম্বন করে বিষয়গুলিকে বহুসংখ্যক ভাগ, বিভাগ ও উপবিভাগে ভারাক্রান্ত করলেন। এর ফলেই জৈন-শাস্ত্র সাহিত্যগুণ-বিবর্জিত শুষ্ক ও নীরস তালিকামাত্রে পরিণত হয়। এই ভাবে শাস্ত্ররচনার পরিবর্তে, জৈনাচার্যরা যদি মহাবীরের উপদেশ ও বাণী সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করতেন তবে জৈনশাস্ত্র সাহিত্যগুণে বৌদ্ধশাস্ত্রের চেয়ে কোন অংশে কম হত না বলে মনে করা হয়।

পার্শ্বনাথের নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের অনেকে মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, অনেকে আবার করেন নি। মহাবীর-শিষ্যরা নগ্ন ছিলেন, অন্যান্যরা ছিলেন অ-নগ্ন এবং এই বিভিন্নতা কালক্রমে বেড়ে গিয়ে জৈন সম্প্রদায় দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুই শাখায় বিভক্ত হ'ল।

মহাবীর তাঁর শিষ্যসংঘকে এগার জন 'গণধর' বা দলপতির অধীনে ভাগ করে দেন। ইন্দ্রভূতি গৌতম ও আরো দশজন ছিলেন মহাবীরের প্রধান শিষ্য এবং এঁরাই ছিলেন 'গণধর'। মহাবীর প্রথম থেকেই তাঁর সংঘসম্বন্ধে কঠোর নিয়মকানুনের প্রবর্তন করেন। শ্রমণদের আচার-শৈথিল্য যাতে না ঘটে তিনি সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন এবং এইভাবে তিনি তাঁর সংঘকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন। সংঘমধ্যে নারীদের প্রবেশে মহাবীরের কোন আপত্তি ছিল না। নারীদের পৃথক্ সংঘ ছিল এবং শ্বেতাম্বর মতে শ্রমণা চন্দনা ছিলেন জৈন সন্ন্যাসিনী-সংঘের 'সাধ্বী' বা নায়িকা। বৌদ্ধদের মত জৈনদেরও গৃহী ভক্ত বা উপাসক-উপাসিকা ছিলেন। এগার জন গণধরের মধ্যে ন'জনেরই মৃত্যু মহাবীরের আগে হয় এবং মহাবীর ৭২ বৎসর বয়সে বিহারের পাবা নামক স্থানে দেহরক্ষা করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

মহাবীরের পর 'গণধর' ইন্দ্রভূতি গৌতম বারো বৎসর জৈন সংঘের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বারো বৎসর সংঘনায়ক ছিলেন শেষ 'গণধর' সুধর্মা। সুধর্মার পর তাঁর শিষ্য জম্বু ২৪ বৎসর সংঘনায়কত্ব করেন। জৈনদের মতে ২৪ জন তীর্থংকর ও ১১ জন গণধরের পর একমাত্র জম্বুই 'কেবল'জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সংঘনায়কেদের পরম্পরা সম্বন্ধে জৈনদের বিভিন্ন মত আছে। জম্বুর পর পঞ্চম নায়ক ছিলেন ভদ্রবাহু।

পাটলিপুত্রের সভা

ভদ্রবাহু সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কয়েকটি 'নির্যুক্তি' বা শাস্ত্রটীকা এবং

শাস্ত্রগ্রন্থ 'কল্পসূত্র' রচনা করেন। কথিত আছে যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে মগধে দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে একদল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক জৈন-শ্রমণ দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটদেশে চলে যান। যাঁরা মগধেই অবস্থান করলেন তাঁদের নেতা ছিলেন স্থূলভদ্র[২২]। মগধের সন্ন্যাসীরা যে কোন কারণেই হোক বস্ত্র পরিধান করতে আরম্ভ করেন। দুর্ভিক্ষের জন্য বা অন্য কারণে শাস্ত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে পাটলিপুত্রে জৈন-শ্রমণদের এক সভা আহ্বান করা হয়[২৩]। ঐ সভায় কয়েকটি শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলিত হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে শাস্ত্রগ্রন্থের ১১টি 'অঙ্গ' এই সময় সংকলিত হয়। 'দৃষ্টিবাদ' নামে আর একটি গ্রন্থের সংকলনও নাকি ঐ সভায় হয়, কিন্তু বর্তমানে ঐ গ্রন্থটি পাওয়া যায় না।

সংঘে ভেদ : দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর

বারো বৎসর পর দুর্ভিক্ষের অবসান হলে ভদ্রবাহু ও তাঁর সঙ্গীরা দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে প্রবীণ সন্ন্যাসীদের নগ্নতা ত্যাগ ও বস্ত্রগ্রহন অনুমোদন করলেন না এবং তাঁদের সংকলিত শাস্ত্র অপ্রামাণিক বলে ঘোষণা করে অগ্রাহ্য করলেন। নগ্নতা ও বস্ত্রধারণ নিয়ে মহাবীরের সময় থেকেই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদের যে বীজ উপ্ত ছিল, এই সময় তা' মূর্ত হয়ে উঠল এবং সে সময়কার মত ভদ্রবাহুর মত-ই প্রাধান্য লাভ করে। ভদ্রবাহুর মৃত্যুর পর স্থূলভদ্র সংঘনায়ক হ'লে বিরোধ আরো প্রকট হয়ে দেখা দিল। দলভেদ বাড়তে বাড়তে অবশেষে আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম শতকে জৈন সম্প্রদায় 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

ধর্মমত, দার্শনিক চিন্তা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বহু বিষয়েই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ আছে। দিগম্বর শাখা মহাবীরের মূর্তি অবশ্যই নগ্ন করে তৈরী করে থাকে। দিগম্বর মতে মহাবীর দারপরিগ্রহ করেন নি এবং মোক্ষলাভের জন্য পুরুষজন্ম প্রয়োজন।

বহু মতভেদ সৃষ্টির ফলে কালক্রমে জৈনদের মধ্যে নানা সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। জৈনধর্ম ধীরে ধীরে কেবল পশ্চিম ভারতের কোন কোন অংশ এবং দাক্ষিণাত্যে আশ্রয়লাভ করে, ভারতের আর কোথাও ঐ ধর্মের বিশেষ প্রভাব রইল না। পরবর্তী যুগের বৌদ্ধদের মত জৈনরাও হিন্দুধর্মের অনেক বিষয় ও প্রথা গ্রহণ করেন, এবং এ ব্যাপারে জৈনরা শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধদের ছাড়িয়ে যান। মূর্তিপূজা, মন্দির নির্মাণ, জাতিভেদ, পৌরোহিত্য প্রথা প্রভৃতি ধীরে ধীরে জৈনদের মধ্যে স্থান করে নেয়। অবশ্য মূর্তিপূজা-বিরোধী শাখাও জৈনদের মধ্যে আছে। জৈনধর্ম যে এখনও ভারতবর্ষে টিঁকে আছে তার প্রধান কারণ বোধহয় এই সম্প্রদায়ের গৃহী ভক্তদের পৃষ্ঠপোষকতা। গৃহস্থ ভক্তদের জৈন সংঘে সম্মানজনক স্থান দেওয়া হয়ে থাকে।

বহির্ভারতে জৈনধর্মের প্রসার হ'তে পারেনি একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব এবং সম্রাট অশোকের মত পৃষ্ঠপোষকের অভাবই বোধহয় জৈনধর্মের প্রসার ও বিস্তৃতির পথে অন্তরায় ছিল। অশোক, কণিষ্ক প্রভৃতির মত প্রভাবশালী উৎসাহী পৃষ্ঠা-পোষক না থাকলেও ভারতীয় অনেক রাজাই জৈনধর্মের আনুকূল্য করেছেন। এঁদের মধ্যে কলিঙ্গরাজ খারবেল, গুজরাটের অধিপতি জয়সিংহ, কুমারপাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বল্লভীর সভা ও জৈনশাস্ত্র সংকলন

শ্বেতাম্বর-দিগম্বর সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে জৈনশাস্ত্রের অবলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়[২৪] খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের অন্তর্বর্তী কোন সময়ে গুজরাটের বল্লভীতে স্থবির দেবর্ধি ক্ষমাশ্রমণের নেতৃত্বে জৈনশাস্ত্র সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শ্বেতাম্বর সম্পদায় এক সভা আহ্বান করেন। জৈনশাস্ত্র-সংগ্রহ এই কারণে খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর থেকে প্রাচীন হ'তে পারে না। জৈনদের অবশ্য বিশ্বাস যে বল্লভীতে সংগৃহীত জৈন-শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ পাটলিপুত্রের সভায় সংকলিত শাস্ত্রগ্রন্থের ভিত্তিতেই রচিত এবং পাটলিপুত্রের সংকলন স্বয়ং মহাবীর ও তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের সঙ্গে

সম্বন্ধযুক্ত। এই সভায় সংগৃহীত শাস্ত্রই বর্তমানে জৈন-আগম বা জৈন-সিদ্ধান্ত নামে প্রসিদ্ধ এবং এই শাস্ত্র সংগ্রহ শ্বেতাম্বরপন্থী জৈন-শাস্ত্র।

খৃঃ পঞ্চম শতকের সংকলন হলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই 'সিদ্ধান্ত' কোন একটি সময়ের রচনা নয়। বহুদিন ধরে এই শাস্ত্ররচনার কাজ চলেছিল এবং জৈন-সংঘ ও সন্ন্যাসধর্ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই কাজ শুরু হয়েছিল। সূচনা হয়েছিল সম্ভবতঃ মহাবীরের দেহরক্ষার পরই। এই ভাবে বিচার করে দেখলে জৈন-আগমের প্রাচীন অংশ মহাবীর ও তাঁর শিষ্যদের সমকালীন রচনা এবং পরবর্তী অংশ দেবর্ধি ও তাঁর অব্যবহিত আগেকার সময়ের রচনা বলে আমরা মনে করতে পারি[২৫]।

দিগম্বর-সম্প্রদায় মনে করেন প্রাচীন জৈনশাস্ত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে এবং শ্বেতাম্বর-সিদ্ধান্ত প্রামাণিক নয়। প্রাচীন জৈন শাস্ত্র যে ভাবে বিভক্ত ছিল এবং যে গ্রন্থগুলি ঐ সব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমানের 'সিদ্ধান্ত' সেই ভাবেই বিভক্ত এবং অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির নাম পূর্বের মত হলেও এই 'সিদ্ধান্ত' প্রকৃত প্রাচীন শাস্ত্র বলে তাঁরা স্বীকার করেন না। এই সম্প্রদায় অবশ্য কয়েকটি গ্রন্থকে শাস্ত্রতুল্য প্রামাণিক বলে মনে করেন এবং গ্রন্থগুলি দিগম্বরপন্থী আচার্যদের দ্বারা পরবর্তী কালেই রচিত।

জৈন-আগম অঙ্গ, উপাঙ্গ প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে অনেকগুলি করে গ্রন্থ আছে। শাস্ত্র-গ্রন্থগুলির উপর আচার্যদের বড় বড় টীকাগ্রন্থও পাওয়া যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা জৈন-আগমের পরিচয় পাব।

১। মনোমোহন ঘোষ, প্রাকৃত সাহিত্য, পৃঃ ১

২। ঐ, পৃঃ ২

৩। ঐ, পৃঃ ৩

৪। গরুড় পুরাণ, পূর্বখণ্ড, ৯৮।১৭

লোকায়তং কুতর্কং চ প্রাকৃতং ম্লেচ্ছভাষিতম্।
ন শ্রোতব্যং দ্বিজেনৈতদধো নয়তি তদ্দ্বিজম্॥

৫। ১/২

৬। কর্পূরমঞ্জরী, ১/৮
৭। গৌড়বহো, ৯৩
৮। পৃঃ ৫
৯। বিশদ আলোচনার জন্য :—Woolner, Intro. to Prakrit, pp 4-10 ; পরেশচন্দ্র মজুমদার, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, পৃঃ ৩৩৫-৩৫৭
১০। Schubring (*Eng. Tr.* W. Beurlen), Doctrine of the Jainas, p 1
১১। ঐ, পৃঃ ২
১২। ঐ, পৃঃ ৪
১৩। ঐ, পৃঃ ৫
১৪। ঐ, পৃঃ ১৩
১৫। Winternitz, HIL, II, p 424 f. n. 2
১৬। ঐ
১৭। অমূল্যচন্দ্র সেন, জৈনধর্ম, পৃঃ ১
১৮। Jacobi, SBE XXII, Intro.
১৯। Winternitz, ঐ 427
২০। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য অমূল্যচন্দ্র সেন, ঐ, পৃঃ ২
২১। Winternitz, ঐ, p 463 f. n. 2
২২। ঐ, p 431
২৩। ঐ
২৪। ঐ
২৫। ঐ
২৬। অমূল্যচন্দ্র সেন, ঐ, পৃঃ ২২

প্রথম পরিচ্ছেদ

জৈন-সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্তের ভাষা

বৌদ্ধদের শাস্ত্রগ্রন্থ যেমন ত্রিপিটক নামে পরিচিত, জৈনদের শাস্ত্রসংগ্রহ সেই রকম জৈন-সিদ্ধান্ত বা জৈন-আগম নামে অভিহিত। মাগধী প্রাকৃতের একটি বিশিষ্ট রূপ 'অর্ধমাগধী' এই শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষা। জৈনরা এই ভাষাকে 'আর্ষ' অর্থাৎ শাস্ত্রকর্তা ঋষিদের ভাষা বলেন, জৈন-প্রাকৃত রূপেও এই ভাষা পরিচিত। মহাবীর এই ভাষাতেই শিক্ষা দিতেন বলে মনে করা হয়[১]। গ্রন্থগুলির গদ্য অংশের ভাষার সঙ্গে গাথা অংশের ভাষার বেশ পার্থক্য আছে। পালি সাহিত্যের মত এই গ্রন্থগুলিরও গাথা অংশের ভাষাতে প্রাচীনত্বের চিহ্ন বেশী।

সিদ্ধান্তের ভিত্তি ও সংকলন

খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে অনুষ্ঠিত বল্লভীর সভার পূর্বের কোন জৈনশাস্ত্র সংকলনের প্রমাণ আমরা এখনও পাইনি, একথা আগেই বলা হয়েছে। গবেষক পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত, এই শাস্ত্রের অনেক অংশ প্রাচীন, আবার অনেক অংশ প্রাচীন নয়। 'চতুর্দশ পূর্ব' (পুব্‌ব) বলে পরিচিত যে প্রাচীনশাস্ত্রের কথা জৈনরা বলেন, তার কিছু কিছু অংশ সম্ভবতঃ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল। স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত পাটলিপুত্রের সভায় যে 'অঙ্গ'-গ্রন্থগুলির সংকলন করা হয় বলে জৈন-ঐতিহ্যে প্রসিদ্ধি আছে, এই 'পুব্‌ব'শাস্ত্রের পরম্পরা প্রচলিত কিছু অংশ ঐ সময় সেই 'অঙ্গ' গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়ে থাকতে পারে। পাটলিপুত্রের সভায়

শাস্ত্র-সংকলনের কোন সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রমাণ আমাদের নেই। ঐ সভায় 'অঙ্গ' গ্রন্থগুলি সংগৃহীত হ'লেও ঐগুলি লিপিবদ্ধ করে সংকলিত হয়েছিল বলে মনে করা যায় না[২]। সম্ভবতঃ মৌখিক পরম্পরায় বহুদিন প্রচলিত থাকবার পর কালক্রমে শাস্ত্রান্তর্গত গ্রন্থগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। মৌখিক ভাবে প্রচলিত পরম্পরা ও কিছু লিপিবদ্ধ গ্রন্থই ছিল বল্লভীর সভায় সংকলিত ও সম্পাদিত জৈন-সিদ্ধান্তের ভিত্তি।

প্রাচীন ও অপ্রাচীন অংশ

মহাবীর ও তাঁর শিষ্যদের সময় থেকে বল্লভীর সভা পর্যন্ত এই হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে প্রাচীন জৈনশাস্ত্রের ভাষা, বিষয়বস্তু প্রভৃতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ইত্যাদি করা হয়েছিল সেগুলিও বল্লভীর সভায় প্রাচীনশাস্ত্রের অঙ্গরূপে স্বীকৃত হয়ে যায়। এই সংকলনের মধ্যে বল্লভী-সভার অধিনায়ক দেবর্ধির সমসাময়িক কালের রচনাও অন্তর্ভুক্ত হয় বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। স্বয়ং দেবর্ধি 'নন্দী'র রচয়িতা বলে প্রসিদ্ধি আছে। পরবর্তী সময়ের কিছু রচনাও কালক্রমে বর্তমানে প্রচলিত জৈন সিদ্ধান্তের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে[৩]। কখনও কখনও এমন দেখা যায় যে জৈনশাস্ত্রের প্রাচীন তালিকা থেকে আগমের অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পাই, বর্তমানে প্রচলিত সেই নামের গ্রন্থের বিষয়বস্তু তা' থেকে ভিন্ন। এই সব ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বল্লভী-সভার আগে বা পরে অথবা সমসাময়িককালে পুরোনো নামে নতুন গ্রন্থ রচনা করে শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে[৪]।

প্রাচীন ও অপ্রাচীন অংশের সমন্বয়ে জৈন-সিদ্ধান্ত গঠিত হলেও অপ্রাচীন অংশ প্রাচীন ভিত্তির উপর রচিত এবং প্রাচীন অংশেও পরিণতির লক্ষণ বিদ্যমান। এই রকম অপ্রাচীন অংশ থেকেও আমরা মহাবীরের যুগের আভাস পেতে পারি। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় নগ্ন না হলেও তাঁদের শাস্ত্রে মহাবীর ও তাঁর শিষ্যদের সর্বত্র নগ্নরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে।

জৈন-সিদ্ধান্ত যে কোন এক সময়ে রচিত ও সৃষ্ট হয়নি এ বিষয়ে

সন্দেহ নেই। বল্লভীর সভায় সম্পাদিত ও সংকলিত শাস্ত্রগ্রন্থ বহু শতাব্দীর নিরলস প্রচেষ্টারই পরিণতি। এই প্রচেষ্টা মহাবীরের তিরোধানের অব্যবহিত পরেই শুরু হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ সে সময় সংঘ ও সন্ন্যাস জীবন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দিক থেকে বিচার করে দেখলে মনে হয় প্রাচীন অংশ মহাবীর ও তাঁর শিষ্যদের সময়ের রচনা এবং অপ্রাচীন অংশ দেবর্ধির সমসাময়িক।

জৈন-সিদ্ধান্ত

জৈনদের উভয় সম্প্রদায়েরই পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম জৈন সিদ্ধান্ত বা আগম। উভয় সম্প্রদায়ই 'দ্বাদশ অঙ্গ' গ্রন্থগুলিকে শাস্ত্রের প্রথম ও প্রধান অংশ হিসেবে স্বীকার করেন। আমরা বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত পাই তা' শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়েরই শাস্ত্রগ্রন্থ এবং এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, যে দিগম্বর সম্প্রদায় শ্বেতাম্বর-সিদ্ধান্তকে অপ্রামাণিক মনে করেন কারণ তাঁদের মতে প্রাচীন জৈনশাস্ত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।

উৎকর্ষ ও মূল্য

শ্বেতাম্বর শাস্ত্র প্রধানতঃ সন্ন্যাসপন্থীদের শাস্ত্র। সন্ন্যাসজীবনের ও ধর্মের বিবিধ শিক্ষা ও নিয়ম এই শাস্ত্রের মূল বিষয়। সন্ন্যাসবাদ ও কঠিন কৃচ্ছ্র-মার্গের নির্দেশক এই শাস্ত্র নীরস ও নিষ্প্রাণ। এই শাস্ত্রে আমরা বর্তমানে যে বিশ্লেষণ প্রণালী ও বিষয়বস্তুর বিন্যাস দেখতে পাই তা' কৃত্রিম, পালি শাস্ত্রের সরলতা ও সজীবতা এই সংগ্রহে অনুপস্থিত। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সমাজ ও লোকজীবনের ইতিহাস রচনায় এই শাস্ত্রসংগ্রহের বিশেষ ভূমিকা আছে। দুঃখের বিষয় এই কাজে জৈন সিদ্ধান্তকে এখনও আমরা ভালভাবে ব্যবহার করি না। সন্ন্যাসজীবনের নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই শাস্ত্রে প্রাচীন যুগের সমাজ-জীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। মহাবীরের জীবনী আলোচনার মাধ্যমে সে যুগের ভারতবর্ষের ধর্ম ও সমাজ জীবনের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তা' ঐতিহাসিকের পক্ষে এক বিশেষ মূল্যবান উপাদান। জৈনশাস্ত্র যে

সাহিত্যগুণবিবর্জিত এক শুষ্ক ও নীরস তালিকামাত্রে পরিণত হয়েছে[৬] তার অন্যতম প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে প্রধানতঃ দার্শনিক মতপ্রচারক পণ্ডিত সম্প্রদায়ের হাতেই এই শাস্ত্র বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে, ধর্মপ্রচারকদের হাতে নয়। জৈনদর্শনের বক্তব্যকে এঁরা নানা ভাগ-বিভাগ-উপবিভাগের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে সাজাতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের এই কাজে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিমতার এবং অতিবাহুল্যের আশ্রয় নিয়ে শাস্ত্রটিকে বিশ্লেষণ-সমষ্টির সমাবেশে জটিল করে তুলেছেন[৭]।

শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রের অন্তর্ভু'ক্ত গ্রন্থগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিন্যাস করা হয়েছে :

(ক) বারো 'অঙ্গ' : ১। আয়ারংগসুত্ত ২। সূয়গডংগ ৩। ঠাণংগ ৪। সমবায়ংগ ৫। ভগবতী বিয়াহপন্নত্তি ৬। নায়াধম্মকহাও ৭। উবাসগদসাও ৮। অংতগডদসাও ৯। অণুত্তরোববায়ি-অদসাও ১০। পণ্হাবাগরণাইঁ ১১। বিবাগসুয়ং ১২। দিট্ঠিবায়

(খ) বারো 'উবংগ' (উপাঙ্গ) : ১। উববায়িঅ ২। রায়পসেণইজ্জ ৩। জীবাভিগম ৪। পন্নবণা ৫। সূরপন্নত্তি ৬। জংবুদ্দীবপন্নত্তি ৭। চংদপন্নত্তি ৮। নিরয়াবলী ৯। কপ্পাবদংসিআও ১০। পুপ্ফিআও ১১। পুপ্ফচূলিআও ১২। বণ্হিদসাও

(গ) দশটি পইণ্ণ (প্রকীর্ণ) : ১। চউসরণ ২। আউরপচ্চক্খাণ ৩। ভত্তপরিন্না ৪। সংথার ৫। তংডুল-বেয়ালিয় ৬। চংদাবিজ্ঝয় ৭। দেবিং-দত্থঅ ৮। গণিবিজ্জা ৯। মহাপচ্চক্খাণ ১০। বীরত্থঅ

(ঘ) ছয়টি ছেঅ সুত্ত : ১। নিসীহ ২। মহানিসীহ ৩। ববহার ৪। আয়ারদসাও ৫। কপ্প ৬। পংচকপ্প

পংচকপ্পের পরিবর্তে কোন কোন সূত্রে জিনভদ্র রচিত জীয়কপ্প উল্লিখিত হয়।

(ঙ) চারটি মূলসুত্ত : ১। উত্তরজ্ঝায়া বা উত্তরজ্ঝয়ণ ২। আবস্সয় ৩। দসবেয়ালিয় ৪। পিংডনিজ্জুত্তি

তৃতীয় এবং চতুর্থ মূল সুত্ত দুইটিকে কখন কখন যথাক্রমে ওহ নিজ্জুত্তি (ওঘনির্যুক্তি) এবং পকৃখি (পাক্ষিক সূত্র) নামে উল্লেখ করা হয়। পিংডনিজ্জুত্তি এবং ওহনিজ্জুত্তি আবার কখন ছেয়-সুত্তের অন্তর্ভুক্ত।

(চ) দুইটি বিশেষ গ্রন্থ : ১। নন্দী বা নন্দিসুত্ত ২। অণুওগদার।

আরও কয়েকটি গ্রন্থকে কখনও কখনও শাস্ত্রের মধ্যে ধরা হয়েছে, যথা, ইসিভাসিয়াই, অংগচূলিয়া, বগ্গচূলিয়া, বিয়াহচূলিয়া, অংগবিজ্জা প্রভৃতি। গ্রন্থগুলি প্রায় পরিশিষ্টরূপেই উল্লিখিত। বর্তমান রূপে গ্রন্থগুলিকে প্রাচীন রচনা বলা সম্ভব নয় এবং মনে করা যায় যে অধুনালুপ্ত প্রাচীন রচনার নামে নতুন গ্রন্থ রচনা করে প্রচার করা হয়েছে।

'অঙ্গ' গ্রন্থগুলি ছাড়া শাস্ত্রের (canon) অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থগুলির তালিকা ঠিক একই ভাবে সর্বত্র উল্লিখিত হয় না৮। 'পইণ্ণ' গ্রন্থগুলির তালিকা এই দিক থেকে বিশেষরূপে অনির্দিষ্ট। নন্দী, অণুওগদার এবং অন্যতম 'ছেয়'সুত্ত গ্রন্থ পংচকপ্পকে কখন কখন 'পইণ্ণ' গ্রন্থের তালিকার প্রথমে দেখা যায়।

জৈন-ঐতিহ্যমতে 'সিদ্ধান্ত'-গ্রন্থ সমূহের সংখ্যা ৪৫, কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা এই সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০ পর্যন্ত পাই। শাস্ত্রান্তর্গত গ্রন্থ ঠাণংগ, নন্দী ও পকৃখি সুত্তে সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের তালিকা পাওয়া যায়।

এখন আমরা 'সিদ্ধান্ত'-গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করতে পারি।

(ক) অঙ্গ

জৈনদের মতে মহাবীরের উপদেশসমূহ চতুর্দশ 'পুব্ব' (পূর্ব অর্থাৎ প্রাচীন) গ্রন্থে সর্বপ্রথম সংকলিত হয়। এই 'পুব্ব' গ্রন্থগুলি বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। 'পুব্ব' গ্রন্থগুলিকে ভিত্তি করেই সম্ভবতঃ 'অঙ্গ' গ্রন্থগুলির সৃষ্টি হয়[৯]।

১। আয়ারংগ সুত্ত

'অঙ্গ' গ্রন্থগুলির তালিকায় প্রথম গ্রন্থ হ'ল আয়ারংগ সুত্ত (আচারাঙ্গ সূত্র)। 'আয়ার' শব্দের অর্থ 'আচার'। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ গ্রন্থের নামের সঙ্গে 'অঙ্গ' যুক্ত এবং প্রায় সব শাস্ত্রগ্রন্থকেই 'সুত্ত' (সূত্র) বলা হয়। এই বিচারেই গ্রন্থটির নামকরণ এবং এর বিষয়বস্তু হ'ল সন্ন্যাসজীবনের 'আচার' বা বিধিনিষেধসমূহ। দুইটি বিস্তৃত অংশে সন্ন্যাসজীবনের এই বিধিনিষেধগুলি আলোচিত। প্রথম অংশটি নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রাচীন রচনা কিন্তু তবুও ঐ অংশে পরবর্তী কালের কিছু সংযোজন লক্ষ্য করা যায়[১০]। গদ্যাংশ ও গাথার সংমিশ্রণে গ্রন্থটি রচিত।

প্রথম অংশে সন্ন্যাসীদের জন্য নানাবিধ উপদেশ ও সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে। যে কোন রকম প্রাণী হিংসা থেকে সন্ন্যাসীদের বিরত থাকতে হ'বে। কোন ব্রত পালন করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করতে হলেও সন্ন্যাসী তাঁর ব্রত ভঙ্গ করবেন না। শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনে জৈন সন্ন্যাসীর কখনও পরাঙ্‌মুখ হওয়া উচিত নয়, প্রয়োজন হলে সংকল্প সাধনের জন্য আত্মহত্যাও বিধেয়।

দ্বিতীয় অংশটি কয়েকটি 'চূড়া' বা পরিশিষ্টে বিভক্ত। এই বিভাগ থেকেও অংশটিকে পরবর্তীকালের রচনা ও সংযোজন বলে ধরা যায়। প্রথম 'চূড়া' দুইটিতে ভিক্ষা ও পরিক্রমার নীরস নিয়মাবলী দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র সেইরকম খাদ্যই গ্রহণ করা বিধেয় যার ফলে কোন রকম প্রাণী হিংসার অবকাশ থাকবে না। সন্ন্যাসীর মিথ্যা ও পরুষ

বাক্য ব্যবহার উচিত নয়। মহাবীরের জীবনীরচনার কিছু উপাদান তৃতীয় চূড়ায় পাওয়া যায় এবং ভদ্রবাহু রচিত 'কল্পসূত্রে' সম্ভবতঃ এই উপাদানই ব্যবহৃত হয়েছে।

২। সূয়গড়ংগ

দ্বিতীয় 'অঙ্গ'-গ্রন্থ সূয়গডঙ্গ সুত্তে সন্ন্যাসীদের পবিত্র ধর্মীয় জীবন আলোচনা এবং অ-জৈন তীর্থিক সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করা হয়েছে। জৈন মতে গ্রন্থটির সংস্কৃত নাম 'সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্র', কিন্তু আধুনিক সমালোচকের মতে 'সূত্র' প্রাকৃতে 'সূয়' হ'তে পারে না. 'সূচী' বা 'সূচা' শব্দের সঙ্গে প্রাকৃত 'সূয়' শব্দের সম্বন্ধ থাকতে পারে[১১]। 'সূচী' শব্দের অর্থ 'দৃষ্টি' বা বিভিন্ন মত, তার বিবরণ ও নিরসন হ'তে পারে। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হ'ল জৈন-দৃষ্টিতে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি বিরুদ্ধ মতের সমালোচনা। 'যে অঙ্গে সত্য ও মিথ্যা মতবাদের পার্থক্য দেখানো হয়েছে' এই অর্থে গ্রন্থটির নামকরণ সার্থক হতে পারে।

এই অঙ্গের মুখ্য উদ্দেশ্য হল অন্যান্য অ-জৈন শিক্ষকদের মতামত থেকে নবীন জৈন-সন্ন্যাসীদের দূরে রাখা। সন্ন্যাসজীবনের পথে কী ভাবে বাধার সৃষ্টি হ'তে পারে সে সম্বন্ধে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে সব কিছুর বিরুদ্ধে সাহস করে দাঁড়িয়ে অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কর্তব্য করে যেতে হবে।

এই গ্রন্থেও দুটি অংশ আছে এবং প্রথম অঙ্গের মত এইখানেও প্রথম অংশটি প্রাচীন এবং দ্বিতীয় অংশটি পরবর্তীকালের রচনা। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদ আলোচনার পক্ষে সূয়গড়ংগ সুত্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৩। ঠাণংগ

তৃতীয় 'অঙ্গ' ঠাণংগে (স্থানাঙ্গ) পালি অঙ্গুত্তর নিকায়ের মত ধর্মসম্বন্ধীয় বিষয়গুলিকে সংখ্যা দিয়ে গণনা করে আলোচনা করা হয়েছে।

এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যায় ধর্মের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে গণনা করা হয়েছে। এই গণনায় অনেক সময় সংক্ষিপ্ত আকারে রূপক কাহিনীর (parable) প্রয়োগ দেখা যায়। চার প্রকারের ঝুড়ি ও শিক্ষক, চার প্রকারের মাছ ও সন্ন্যাসী ইত্যাদির কথা এখানে আলোচিত। অনেক সময় ধর্মশিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের অবতারণাও করা হয়েছে। 'সিদ্ধান্ত' সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান উপাদান এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। অধুনালুপ্ত প্রাচীন গ্রন্থ 'দিট্‌ঠিবায়'-এর বিষয় বস্তুর একটি সূচীপত্র এই গ্রন্থে আছে।

৪। সমবায়ংগ

চতুর্থ গ্রন্থ সমবায়ংগে মোটামুটি তৃতীয় অঙ্গেরই অনুবৃত্তি। এই গ্রন্থে গণনাসংখ্যা 'দশে' সীমাবদ্ধ নয়, দশলক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। আধুনিক মতে এই অঙ্গের অধিকাংশ ভাগ বেশ পরবর্তীযুগের রচনা। 'সমবায়' অর্থাৎ 'বর্গ', 'সমষ্টি' ইত্যাদি। সংখ্যার মাধ্যমে বর্গ বা বিভাগ করে গ্রন্থটির মূলবস্তু উপস্থাপিত হওয়ার জন্যই গ্রন্থটির এইরূপ নামকরণ।

দ্বাদশ 'অঙ্গে'র উল্লেখ এবং চতুর্দশ 'পুব্বে'র বিষয়সূচী দিয়ে গ্রন্থটির আরম্ভ।

৫। ভগবতী সূত্র

ভগবতী বিয়াহপন্নত্তি (ভগবতী-ব্যাখ্যা-প্রজ্ঞপ্তি) শীর্ষক পঞ্চম অঙ্গকে অনেক সময় সংক্ষেপে কেবল ভগবতী সূত্র নামেও উল্লেখ করা হয়। জৈন-মতবাদের দীর্ঘ এই সংকলনগ্রন্থে মহাবীর-যুগের নানা ঘটনারও উল্লেখ দেখা যায়। 'ইতিহাস-সংবাদ' আকারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই গ্রন্থে জৈন-মতবাদ ব্যাখ্যাত। মহাবীর তাঁর প্রধান শিষ্য গোয়ম ইন্দভূতির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জৈন-মতবাদের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

মহাবীরের জীবনী, তাঁর ব্যক্তিত্ব, শিষ্য এবং সমসাময়িক ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে এই গ্রন্থে বহু মূল্যবান উপাদান আছে। মহাবীর সম্বন্ধে এত তথ্য অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিস্তরে নেমে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাকে ভিত্তি

করে মহাবীর কীভাবে লোকশিক্ষা দিতেন, তার একটি সুন্দর চিত্র এই 'ভগবতী সূত্রে' পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে অনেক উপকথা বা legends এর সমাবেশ দেখা যায়। এই সব উপকথার মাধ্যমে প্রাক্-মহাবীরযুগের শ্রেষ্ঠ সাধকদের কথা, পুণ্যবানদের স্বর্গসুখ-ভোগ এবং পাপীদের নরকযন্ত্রণা-ভোগ বর্ণনা করা হয়েছে।

৬। নায়াধম্মকহাও

নায়াধম্মকহাও (জ্ঞাতধর্মকথা) শীর্ষক ষষ্ঠ 'অঙ্গ'-গ্রন্থে ধর্মশিক্ষামূলক কাহিনী ও উপাখ্যান বিবৃত করা হয়েছে। গ্রন্থটির শিরোনামের অর্থ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে[১২]। 'দৃষ্টান্ত এবং ধর্মশিক্ষামূলক কাহিনী' অর্থে জৈনরা এই শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। এক প্রকার উপাখ্যান-বিশেষকে 'নায়' (জ্ঞাত) বলা হয় এবং পূর্বোক্ত 'ঠাণংগে' 'নায়'-কাহিনীর শ্রেণীবিভাগ করা আছে।

নানা কাহিনী, উপকথা ও রূপক প্রভৃতির সমাবেশে গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। কখনও মূল কাহিনীর চেয়েও রূপকের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। ধর্মশিক্ষামূলক এই সমস্ত কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে সাধারণ উপন্যাস-কাহিনী, পথিকের দুঃসাহসিক অভিযান, নাবিকের রূপকথা, দস্যুর কাহিনী প্রভৃতি। প্রত্যেকটি উপাখ্যানের শেষে নীতি-ধর্ম (moral) রূপে একটি রূপক (parable)-কে কোনরকমে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র মহিলা তীর্থঙ্কর মল্লীর[১৩] কাহিনী এই গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে বিবৃত। এই গ্রন্থটিও দুই খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু বিষয়গত ও রূপগত ভাবে প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশের কোন মিল দেখা যায় না। দ্বিতীয় অংশটি যেন সপ্তম ও নবম অঙ্গের মধ্যেই বেশী খাপ খায়। দেবী কালীর কাহিনী এই দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে একটি 'ধর্মকথা' রূপে।

৭। উবাসগদসাও

ব্রতপালন, কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতির সাহায্যে দশজন উপাসক বা গৃহীভক্তের

সুফল লাভের দশটি উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে উবাসগদসাও (উপাসকদশাঃ) শীর্ষক সপ্তম অঙ্গ-গ্রন্থে। মহাবীর প্রদর্শিত পথে ব্রতপালন ইত্যাদির সাহায্যে এই উপাসকগণ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। জৈন সাধকদের মতই তাঁরা উপবাসে দেহত্যাগ করেন এবং স্বর্গে দেবতারূপে পুনর্জন্মলাভ করেন। পুরাণ-কাহিনী এবং বৌদ্ধ মহাযান সূত্রের উপাখ্যানগুলির মত এই দশটি কাহিনীই একটি আখ্যানের রূপে বলা হয়েছে। সুহম্ম বক্তা জম্বূ শ্রোতা। এই গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে বিবৃত ধনী কুম্ভকার সদ্দালপুত্তের কাহিনী আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম জীবনে মক্‌খলিপুত্ত গোসালের শিষ্য সদ্দালপুত্ত মহাবীরের উপদেশে আকৃষ্ট হন এবং জৈন-মতের সারবত্তা উপলব্ধি করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সমস্ত গ্রন্থটি ভক্তি ও বিশ্বাসের উদ্দেশ্যেই রচিত বলে মনে করা হয়।[১৪]

৮। অংতগডদসাও

৯। অণুত্তরোববাইয়দসাও

সন্ন্যাস, কৃচ্ছ্রসাধন ও অনশন-মৃত্যুর গরিমাকীর্তন করেছে অষ্টম ও নবম অঙ্গ দুইটি। বর্তমানে আমরা অষ্টম অঙ্গ অংতগডদসাও (অন্তঃকৃদ্দশাঃ) আট অধ্যায়সমন্বিত এবং নবম অঙ্গ অণুত্তরোববাইয়দসাও (অনুত্তরোপপাদিকদশাঃ) তিনটি অধ্যায়যুক্ত অবস্থায় পাই। দুইটি গ্রন্থেরই সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু ভারতীয় পুরাণ (mythology) এবং ধর্মের ইতিহাসের পক্ষে অষ্টম অঙ্গটি বিশেষ মূল্যবান। এই গ্রন্থে কৃষ্ণ-উপাখ্যান জৈন-মতাদর্শে রূপান্তরিত করে বলা হয়েছে। মহাভারতের কাহিনী অনুসারেই এখানে দ্বারাবতীর পতন ও শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ এখানে জৈন-সাধক রূপে আবির্ভূত।

ঠাণংগের দশম অধ্যায়ে আমরা এই দুইটি অঙ্গের বিষয়বস্তুর যে পরিচয় পাই বর্তমান গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই। মূল গ্রন্থ দুইটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ঐ নামে নতুন গ্রন্থ রচনা করে শাস্ত্রের অন্তর্গত করা হয়ে থাকতে পারে।

এই দুইটি গ্রন্থে বর্ণিত উপাখ্যানগুলির মধ্যে কোন মৌলিকত্বই নেই বরঞ্চ স্থানে স্থানে সাধারণ গতানুগতিক ভাবে উপস্থাপিত কাহিনীগুলি আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে। নবম অঙ্গটিতে বার বার একই ভাবে অনশন মৃত্যুর শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করা হয়েছে।

১০। পণ্‌হাবাগরণাইঁ

পণ্‌হাবাগরণাইঁ (প্রশ্নব্যাকরণানি) শীর্ষক দশম অঙ্গে অহিংসা প্রভৃতি ব্রতগুলি পালনের সুফল এবং অ-পালনের কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য অনেক অঙ্গের মত প্রাচীন তালিকায় উল্লিখিত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের কোন মিল নেই। অহিংসা, অচৌর্য, সত্যভাষণ, ইন্দ্রিয়সংযম এবং বিষয়ে অনাসক্তি এই পাঁচটি ব্রত পালন আমাদের বহু সুফল দান করে, এই কথাই এই গ্রন্থে বলা হয়েছে। গ্রন্থটি পরবর্তীকালেরই সংযোজন বলে মনে হয়।

১১। বিবাগসুয়

পুণ্যকর্মের সুফল এবং পাপকার্যের কুফলের কথা বিবাগসূয় (বিপাকশ্রুত) শীর্ষক একাদশতম অঙ্গে বলা হয়েছে। অবদানশতক প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত বৌদ্ধ কর্মবাদের সঙ্গে এই গ্রন্থের বক্তব্যের বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলেই মানুষ বর্তমান জন্মে দুঃখভোগ করে। মহাবীর তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য গোয়ম ইন্দভূতিকে ব্যাখ্যা করে বলছেন যে জনৈক উম্বরদত্ত নানারকম ব্যাধিতে ভুগছে কারণ পূর্বজন্মে ঐ ব্যক্তি চিকিৎসক ছিল এবং তার চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তিকে সে মাংস খেতে বিধান দিয়েছিল। এই বিধান দেওয়ার ফলে সে প্রাণীহত্যার কারণ হয়েছিল এবং তার ফলেই বর্তমানে তার এই দুর্ভোগ।

এই অঙ্গটিতে এখন দশের পরিবর্তে কুড়িটি অধ্যায় পাওয়া যায়।

১২। দিট্ঠিবায়

প্রাচীন দিট্‌ঠিবায় (দৃষ্টিবাদ) সম্পূর্ণ লুপ্ত। এই শেষ 'অঙ্গ' গ্রন্থটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অন্যান্য গ্রন্থে প্রাপ্ত উপাদানের উপর নির্ভরশীল। সমবায়ংগ, নন্দী এবং ছেয়-সূত্রগুলিতে আমরা 'দৃষ্টিবাদে'র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাই। কথিত আছে এই অঙ্গে প্রাচীন চতুর্দশ 'পুব্বের' অংশ বিশেষ রক্ষিত হয়।

'দৃষ্টিবাদ' পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা (১) পরিকম্মং (পরিকর্মাণি)—সূত্র সমূহের যথাযথ অর্থগ্রহণের জন্য ১৬ প্রকার প্রস্তুতি ; (২) সুত্তাই (সূত্রাণি)—যেখানে অ-জৈন সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডিত ; (৩) পুব্বগএ (পূর্বগতম্)—১৪ পুব্ব ; (৪) অনুযোগ—তীর্থঙ্কর ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সাধকদের উপাখ্যান ; (৫) চূলিয়া (চূলিকাঃ)—সংযোজন।

(খ) উবংগ (উপাঙ্গ)

উবংগ

'অঙ্গ' গ্রন্থ যে বারো-টিই ছিল তার অন্যতম সমর্থন হল 'উবংগ' বা উপাঙ্গের সংখ্যা। প্রতি অঙ্গের একটি করে উপাঙ্গ আছে। উভয়ের মধ্যে বিষয়গত বা অন্য কোন সম্বন্ধ কিন্তু বিশেষ পাওয়া যায় না। বারোটি উপাঙ্গই জৈন-মতবাদের নীরস আলোচনা ও পৌরাণিক উপাখ্যানে সমাকীর্ণ। গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নেই।

১। উববাইয়

উবংগের তালিকায় প্রথম নাম হ'ল উববাইয় (উপপাদিক)। গ্রন্থটির প্রথম অংশে মহাবীরের পুণ্‌ণভদ্দ মন্দিরে গমন এবং সেখানে মহাবীরের উপদেশ শোনবার জন্য রাজা কুণিয় ভিংভসারপুত্তের আগমনের কথা বলা হয়েছে। মহাবীর তাঁর ঐ উপদেশে সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ

স্বর্গসুখ ও নরকযন্ত্রণাভোগ এবং উপাসক ও সন্ন্যাসীর পালনীয় কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় অংশে আমরা গোয়ম ইন্দভূতিকে মহাবীরের কাছে যেতে এবং পুনর্জন্মের বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে দেখি। প্রত্যেকটি পাপকার্যের অনুষ্ঠানকারীকে কীভাবে তার দুষ্কর্মের ফলভোগ করতে হয় এবং পুণ্য-কর্মকারী কীভাবে দেবলোকে স্থানলাভ করেন তা' এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বলা হয়েছে। এখানেও সেই কর্মবাদের আলোচনা। প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশের কোন যোগসম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায় না।

গ্রন্থটির শিরোনামের সংস্কৃত রূপ অনেক জায়গায় 'ঔপপাতিক' করা হয়েছে[১৫], কিন্তু তা' যুক্তিসঙ্গত নয়।

২য় উবংগ

সাহিত্যরচনা হিসেবে দ্বিতীয় 'উবংগ'-গ্রন্থ রায়পসেণইজ্জ্ অধিকতর মূল্যবান্। এই গ্রন্থটির শিরোনামের সংস্কৃত রূপ সাধারণতঃ 'রাজপ্রশ্নীয়' করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে রাজা পএসিব প্রশ্নে জৈনশ্রমণ কেশীর উত্তর-দানের মাধ্যমে। কিন্তু সংস্কৃত 'প্রশ্ন' শব্দ প্রাকৃতে 'পসেণ' হয় না। সম্ভবতঃ রাজা পএসির নামই প্রসেন বা প্রসেনজিৎ এবং প্রাকৃতে ঐ শব্দই 'পসেণ' রূপে গৃহীত। এই বিচারে গ্রন্থটির সংস্কৃত নাম হওয়া উচিত 'রাজপ্রসেনকীয়'[১৬]—এই প্রসেনজিৎ অবশ্য বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক কোশলরাজ প্রসেনজিৎ নন।

গ্রন্থটির প্রথমেই পুরাণ কাহিনীর রীতিতে মহাবীরের নিকট দেবতা সূরিয়াভের গমনরূপ দীর্ঘ কাহিনী স্থান পেলেও রাজা পএসির প্রশ্নের উত্তরে জৈনশ্রমণ কেশী কর্তৃক আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের কথাই গ্রন্থটির মুখ্য আলোচ্য বিষয়। রাজা পএসি ও জৈনশ্রমণের মধ্যে শাস্ত্র-আলোচনার একটি সজীব ও আকর্ষণীয় কথোপকথন গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। জৈন-শিক্ষক রাজাকে বোঝাতে চাইছেন দেহ-নিরপেক্ষ আত্মার অস্তিত্ব আর রাজা নানা উদাহরণ (experiment) ও যুক্তিতর্কের দ্বারা তার বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট। পরিশেষে আমরা রাজাকে জৈনধর্ম গ্রহণ করতে দেখি।

৩। জীবাভিগম

তৃতীয় 'উবংগ' জীবাভিগম-কে জৈনগণ জীবাজীবাভিগম নামেও অভিহিত করে থাকেন। গোয়ম ও মহাবীরের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কুড়িটি পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থে যাবতীয় জীবন্ত এবং প্রাণহীন (জীব ও অজীব) পদার্থের শ্রেণীভেদ এবং সমুদ্র-দ্বীপ সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের বিবরণ আছে। দ্বীপ এবং সাগর সম্পর্কিত আলোচনার পরিচ্ছেদটির ষষ্ঠ উবংগ 'জম্বুদ্দীব-পন্নত্তি'র সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। নন্দী এবং ঠাণংগে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে 'দীবসাগরপন্নত্তি' নামে একটি গ্রন্থ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল; বর্তমান গ্রন্থের এই পরিচ্ছেদটি বোধ হয় প্রক্ষিপ্ত অংশ।

৪। পন্নবণা

চতুর্থ 'উবংগ' পণ্ণবণার (প্রজ্ঞাপনা) বিষয়বস্তু হল প্রাণিবৃন্দের শ্রেণী-বিভাগ। গ্রন্থটি অয্য সাম (আর্যশ্যাম)-এর রচনা বলে উল্লিখিত। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুও গোয়ম এবং মহাবীরের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপিত।

৫-৭ উবংগ

পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম এই তিনটি গ্রন্থেরই আলোচ্য বিষয় হ'ল ভূগোল, জ্যোতিষ, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, সময়-বিভাগ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। আশ্চর্যের বিষয় যে চন্দ্রের ভিত্তিতে রচিত জ্যোতির্বিদ্যা সমন্বিত সপ্তম গ্রন্থ চংদপন্নত্তির (চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি) বিষয়বস্তু এবং পঞ্চম গ্রন্থ সূরপন্নত্তি-র (সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি) অর্থাৎ সূর্যের ভিত্তিতে রচিত স্বর্গের বিবরণ সমন্বিত গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রাপ্ত সকল পুঁথিতেই অভিন্ন। সপ্তম উবংগ হয়ত প্রথমে ভিন্ন গ্রন্থই ছিল এবং পরে সূরপন্নত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়।[১৭] জৈনদের জ্যোতির্বিদ্যার একটি সুসংবদ্ধ রূপ আমরা সূরপন্নত্তিতে দেখতে পাই। ষষ্ঠ উবংগ জম্বুদ্দীব পন্নত্তিতে ভারতবর্ষের বিবরণ আছে। এই

বিবরণে রাজা ভরতের যে উপাখ্যান পাওয়া যায় তার সঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ (২য়) এবং ভাগবতে (৫ম) বর্ণিত ঐ কাহিনীর সাদৃশ্য আছে।

৮-১২ উবংগ

অষ্টম থেকে দ্বাদশতম এই পাঁচটি উবংগকে কখন কখন নিরয়াবলী-সুত্তম্ নামক একটি গ্রন্থের পাঁচটি ভাগরূপেও বর্ণনা করা হয়। সম্ভবতঃ আদিতে এই পাঁচটি একটি গ্রন্থেরই পাঁচটি অংশস্বরূপ ছিল কিন্তু পরে অঙ্গের হিসাবে উবংগের সংখ্যাও বারো করার জন্যই এগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়। পুণ্যকর্মে স্বর্গবাস এবং পাপকর্মে নরকবাসের বর্ণনাই গ্রন্থ পাঁচটির মূল আখ্যানবস্তু। বৌদ্ধসূত্রে রাজা অজাতশত্রু পিতৃহন্তা এবং নিষ্ঠুর রাজা রূপে বর্ণিত। কিন্তু অষ্টম উবংগে তিনি জৈনদের দ্বারা অনেক ভাল রাজা রূপে চিত্রিত। দ্বাদশতম উবংগ বণ্হিদাসাও-তে (বৃষ্ণিদশাঃ) জৈনসাধক অরিট্ঠনেমির কাছে বৃষ্ণিবংশের বারোজন রাজপুত্রের ধর্মান্তর গ্রহণের কাহিনী বর্ণিত। এইখানেও আমরা কৃষ্ণ-উপাখ্যানের সঙ্গে জৈন সাহিত্যের সংযোগ দেখতে পাই।

(গ) পইণ্ণ (প্রকীর্ণ)

জৈনশাস্ত্রের তৃতীয় বিভাগের নাম হ'ল পইণ্ণ অর্থাৎ যা ছড়ানো আছে বা বিধিবদ্ধভাবে সাজানো নয়। এই বিভাগের অন্তর্গত গ্রন্থের সংখ্যা ও নাম সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। এখন আমরা যে সব গ্রন্থকে অন্যান্য বিভাগের মধ্যে ধরে থাকি তার মধ্যেও কোন কোনটিকে কখন কখন 'পইণ্ণ' পর্যায়ের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ যে গ্রন্থগুলিকে এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, তালিকায় তাদের নামের পৌর্বাপর্যও সব সময় একরূপ হয় না। সাধারণভাবে স্বীকৃত পইণ্ণ-পর্যায়ের গ্রন্থগুলিকেই পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখন সেইগুলি সম্বন্ধেই মোটামুটিভাবে আলোচনা করা যায়।

পইণ্ণ পর্যায়ের দশখানি গ্রন্থকে আমরা সাধারণভাবে বৈদিক 'পরিশিষ্ট'

গ্রন্থগুলির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। 'পরিশিষ্ট'গুলির মত পইণ্ণ-গ্রন্থাবলীরও অধিকাংশ ছন্দে রচিত এবং জৈনধর্মের নানা বিষয় এখানে আলোচিত।

১। চউসরণ

এই পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ **চউসরণ** (চতুঃশরণ)। এই গ্রন্থে অর্হৎ, সিদ্ধ, সাধু এবং ধর্ম এই চতুষ্টয়ের শরণ নেওয়ার প্রার্থনা ৬৩টি শ্লোকে বলা হয়েছে। প্রথম কয়েকটি শ্লোকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারাকে শুদ্ধ করার উপায়স্বরূপ ছয়টি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য উল্লিখিত। এই ছয়টি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হ'ল :

(i) সামাইয়ং (সামায়িকম্) বা সর্বপ্রকার অশুভ কর্ম থেকে সমতা অর্জন ;

(ii) চউবীসইথয় (চতুর্বিংশতিস্তব) বা ২৪ জন তীর্থঙ্করের মহিমা কীর্তন ;

(iii) বংদনা বা গুরুবন্দনা ;

(iv) পডিক্কমণং (প্রতিক্রমণ) বা অপরাধ স্বীকার ;

(v) কাউস্সগ্গ (কায়োৎসর্গ) বা বিশেষ কায়সাধনা ; এবং

(vi) পচ্চক্খাণং (প্রত্যাখ্যান) বা বিষয়সুখের প্রত্যাখ্যান। বিরভদ্দ (বীরভদ্র) এই গ্রন্থের রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তাঁর সময় সম্বন্ধে আমাদের কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই।

কয়েকটি পইণ্ণ গ্রন্থে সাধকের অনশনে স্বেচ্ছামৃত্যুর বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে।

অন্যান্য পইণ্ণ-গ্রন্থ

আউরপচ্চক্খাণ (আতুরপ্রত্যাখ্যান) : এই গ্রন্থে আতুর কর্তৃক জাগতিক সুখের প্রত্যাখ্যান আলোচিত।

ভত্তপরিন্না (ভক্তপরিজ্ঞা) : ১৭২টি শ্লোকে খাদ্যবস্তু পরিত্যাগের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

সংথার (সংস্তার): ধ্যানের উদ্দেশ্যে সাধকের আমৃত্যু কুশশয্যা গ্রহণের কথা এই গ্রন্থের ১২২টি শ্লোকে বলা আছে।

মহাপচ্ চক্খাণ (মহাপ্রত্যাখ্যান): এই গ্রন্থের ১৪৩টি শ্লোকে অপরাধ স্বীকারের ও সংসার পরিত্যাগের প্রণালীর কথা বলা হয়েছে।

গ্রন্থগুলিতে অনশনের মাধ্যমে মৃত্যুবরণের নিয়মাবলী ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। জৈনধর্মে অনভিজ্ঞ মূর্খদের মৃত্যু হয় নানা কারণে এবং মৃত্যু তাদের অনভিপ্রেত। গৃহী বা উপাসক-জৈনদের মৃত্যু অনশনে হয় না, যদিও তাঁরা মৃত্যুশয্যায় তাঁদের যাবতীয় অপরাধ স্বীকার করেন। আর, সমস্ত ব্রত ও কর্তব্য পালন সম্পূর্ণ করে সাধক অনশনে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

অবশিষ্ট পইণ্ণগুলির আলোচনায় বিষয়বৈচিত্র্য দেখা যায়। গদ্য-পদ্যে রচিত তংদুলবেয়ালিয় (তণ্ডুলবৈতালিক, বৈকালিক বা বৈচারিক) মহাবীর ও গোয়মের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে দেহতত্ত্ব, শারীরবিদ্যা, ভ্রূণের জীবন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছে। চংদাবিজ্ঝয় বা চংদাবেজ্ঝগা (চন্দ্রকবেধ্যকা) শীর্ষক গ্রন্থে ১৭৪টি শ্লোকে সংঘের নিয়মাবলী উল্লিখিত। ৩০০ শ্লোকসমন্বিত দেবিংদথয়-তে (দেবেন্দ্রস্তব) দেবরাজগণের শ্রেণীবিভাগ, বাসস্থান ইত্যাদির আলোচনা উপস্থাপিত। জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর ৮৬ শ্লোকে রচিত গণিবিজ্জা (গণিবিদ্যা) হ'ল শুভাশুভ তিথি-নক্ষত্রাদি নিরূপণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। মহাবীরের বিভিন্ন নামের উল্লেখ ও গুণবর্ণনা করা হয়েছে বীরথয় (বীরস্তব) গ্রন্থে।

প্রকৃতপক্ষে পইণ্ণ গ্রন্থের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা যে সম্ভব নয় তা' পূর্বেই বলা হয়েছে। কখনও কখনও আরো কুড়ি বা ততোধিক গ্রন্থকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে[১৮]।

(ঘ) ছেয়সুত্ত (ছেদসূত্র)

জৈনশাস্ত্র সংগ্রহের চতুর্থ পর্যায়ের নাম ছেয়সুত্ত। ঠিক কী অর্থে 'ছেয়' শব্দ ব্যবহৃত তা সুস্পষ্ট নয়। জৈনশাস্ত্রে 'ছেয়' এবং 'মূল' দুই প্রকার সাধনার নাম। 'ছেয়' শব্দের সাধারণ অর্থ 'কাটা'।

ছেয়সুত্ত ছয়খানি। সম্ভবতঃ এই শ্রেণী পরবর্তী যুগেই শাস্ত্রের একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। সব সময় একই গ্রন্থ এই শ্রেণীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় না এবং নামের পৌর্বাপর্যেও বিভিন্নতা আছে।

প্রথম ছেদসূত্র নিসীহ (নিসীথ)-এর বিষয়বস্তু দৈনন্দিন জীবন ধারণের বিধিভঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থা। প্রথম 'অঙ্গ'-গ্রন্থ এবং তৃতীয় 'ছেয়সুত্তে'র কিছু অংশ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থটি বেশ পরবর্তীকালের রচনা বলেই মনে করা হয়।

মহানিসীহ শীর্ষক দ্বিতীয় ছেয়সুত্তটিকে কখন কখনও ষষ্ঠ সূত্ররূপেও উল্লেখ করা হয়। পাপস্বীকার, প্রায়শ্চিত্ত, পাপকর্মের কুফল ইত্যাদি এই গ্রন্থের আলোচ্যবিষয়। বর্তমানে প্রাপ্ত গ্রন্থটি বেশ পরবর্তীযুগেরই রচনা এবং প্রাচীন নামের একটি নবীন গ্রন্থ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন [১৯]।

তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সুত্তগুলিকে আমরা 'ছেয়সুত্তে'র সার বা প্রধান অংশ হিসেবে ধরতে পারি এবং এই সূত্রগুলি শাস্ত্রের প্রাচীন অংশ বলেই মনে হয়। জৈন-ঐতিহ্যে তিনটি গ্রন্থই একটি গ্রন্থ (শ্রুতস্কন্ধ)-রূপে পরিগণিত এবং 'দসা-কপ্প-ববহার' নামে অভিহিত। এই ছেয়সুত্তগুলিতে নানা ধরণের উপাখ্যান আছে ; সেই সঙ্গে বৌদ্ধদের 'বিনয়'-এর মত জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য বিহিত নানা বিধি-নিষেধ ও নিয়মাবলী এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। এইগুলিকে জৈন সংঘের 'বিনয়' বলে মনে করা যেতে পারে। চতুর্থ গ্রন্থ আয়ারদসাও (আচারদশাঃ) ঐতিহ্যানুসারে ভদ্রবাহুর রচনা এবং এই গ্রন্থেরই অষ্টম পরিচ্ছেদটি ভদ্রবাহু-কল্পসূত্র নামে অভিহিত।

যাঁরা প্রাচীন 'পুব্ব'শাস্ত্র জানতেন তাঁদের মধ্যে ভদ্রবাহুই শেষ ব্যক্তি বলে প্রসিদ্ধি আছে এবং তিনিই নবম 'পুব্ব' থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ ছেদসূত্র দুইটি সংকলন করেন বলে উল্লেখ করা হয়। 'ভদ্রবাহু-কল্পসূত্র' গ্রন্থটি তিনটি বিভিন্ন রচনার সমষ্টি কিন্তু এই তিনটি রচনাই ভদ্রবাহুর বলে মনে হয় না[২০]। প্রথম অংশটির নাম 'জিন চরিত্র' বা 'জিন'দিগের জীবনী। এর প্রধান অংশ হ'ল মহাবীরের জীবনী। ঠিক আয়ারংগ সুত্তের রীতিতেই এখানে মহাবীরের জীবনী বর্ণিত। গ্রন্থটির অলঙ্কারবহুল

বর্ণনারীতি এবং আতিশয্যপূর্ণ বর্ণনা আমাদের বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তরের কথা মনে করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় রচনাটি হল 'স্থবিরাবলী'। এই অংশে বিভিন্ন শাখা, সম্প্রদায় ও গণধর বা গুরুদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। ভদ্রবাহুর পরবর্তী সময়ের অনেক ঘটনা এই রচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে এটি ভদ্রবাহুর রচনা কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। প্রাচীন বিভিন্ন প্রত্নলেখের ভিত্তিতে তালিকার নামগুলিকে ঐতিহাসিক বলে জানা যায়[২১]। 'সামাচারী' শীর্ষক তৃতীয় অংশটি কল্পসূত্রের প্রাচীনতম অংশ। 'পজ্জুসন' (পর্যুষণ) বা বর্ষাবাসের সময় জৈন-সন্ন্যাসীদের পালনীয় নিয়মাবলী এই অংশের বিষয়বস্তু। সমগ্র ভদ্রবাহু-কল্পসূত্রকে 'পজ্জোসবণাকপ্প' (পর্যুষণাকল্প)ও বলা হয়। এই বিকল্প নামটিই এই অংশের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ। প্রসিদ্ধি আছে যে এই তিনটি অংশকে আদিতে শাস্ত্রান্তর্গত বলে মনে করা হ'ত না, দেবর্দ্ধি এদের 'সিদ্ধান্তে'র অঙ্গীভূত করেন। প্রাচীনতম ও প্রকৃত 'কল্পসূত্র' হ'ল পঞ্চম ছেদসূত্রটি। 'বৃহৎ কল্প সূত্র' বা 'বৃহৎ-সাধু-কল্পসূত্র' নামেও এই সূত্রটি পরিচিত। তৃতীয় ছেদসূত্রটিকে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয় পরিপূরক বলে মনে করা যায়। সন্ন্যাস জীবনের নিয়মাবলী সম্বন্ধে এই 'কল্পসূত্র'ই হ'ল শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ। ষষ্ঠ ছেদসূত্র পংচকপ্প (পঞ্চকল্প) বর্তমানে লুপ্ত। এর পরিবর্তে জিনভদ্র রচিত জীয়কপ্প (জীতকল্প) গ্রন্থটিকে কখনও কখনও ষষ্ঠ ছেদসূত্ররূপে ধরা হয়। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুও সন্ন্যাসজীবনের নিয়মাবলী। গ্রন্থকার জিনভদ্র অষ্টম শতকের বিখ্যাত জৈনপণ্ডিত হরিভদ্রের গুরু ছিলেন। 'মূলসূত্র'শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং সন্ন্যাসজীবনের নিয়মাবলী নিয়ে রচিত 'পিণ্ডনিজ্জুত্তি' ও 'ওহনিজ্জুত্তি'কেও কখনও কখনও ষষ্ঠ ছেদসূত্র রূপে গণনা করা হয়।

ছেদসূত্রের ছয়খানি গ্রন্থের মধ্যে কোন মূলগত বন্ধন বা ঐক্য লক্ষ্য করা যায় না এবং অনেকদিন পর্যন্ত গ্রন্থগুলিকে সিদ্ধান্তের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়নি।

(ঙ) মূলসুত্ত (মূলসূত্র)

জৈনসিদ্ধান্তের পঞ্চম অংশের নাম মূলসুত্ত। পূর্ববর্তী বিভাগে 'ছেয়' শব্দের মতই ঠিক কী অর্থে 'মূল' শব্দ ব্যবহৃত তা স্পষ্ট নয়। টীকা-গ্রন্থের সঙ্গে 'আদি'গ্রন্থের উল্লেখ করতে হ'লে 'আদি' গ্রন্থটিকে সাধারণতঃ 'মূল' বলা হয়। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির প্রাচীন ও মূল্যবান টীকা থাকার জন্য গ্রন্থগুলির এই রকম বিশেষণ দেওয়া হয়ে থাকতে পারে[২২]। সন্ন্যাসজীবনের প্রারম্ভেই বা 'মূলে' গ্রন্থগুলি পঠনীয় হওয়ার জন্যও এইরূপ নামকরণ হতে পারে। 'মূল' একপ্রকার জৈন-সাধনা কিন্তু ঐ অর্থেই যে শব্দটি এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে এমন ধারণা সঙ্গত নয়। 'মূলসুত্তে' চারখানি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত, তন্মধ্যে প্রথম তিনখানির সাহিত্যিক মূল্যও কম নয়।

জৈন সিদ্ধান্তের অন্যতম মূল্যবান অংশ হ'ল উত্তরজ্ঝয়ণ (উত্তরাধ্যয়ন সূত্র) শীর্ষক প্রথম 'মূলসূত্র'টি। বিভিন্ন কালে রচিত ৩৬টি অধ্যায় সমম্বিত এই 'সূত্র' একটি ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থ। এর প্রাচীন অংশগুলি বিশেষ মূল্যবান্ ও আকর্ষণীয় এবং অনেকাংশে পালি কাব্যগ্রন্থ 'সুত্তনিপাতে'র সহিত তুলনীয়। সুত্তনিপাতের মতই এই সূত্রটিতে কতকগুলি সুন্দর প্রাচীন ইতিহাস-সম্বাদ ও *ballad* কবিতা আছে। রাজা নমির উপাখ্যানে সাধক এবং তাঁর সাধনাকে শাসক ও যোদ্ধার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। রাজা হরিকেশের সুন্দর ও সাবলীল উপাখ্যানে জিতেন্দ্রিয় সাধকদের উন্নত জীবনের কথা বলা হয়েছে। চতুর্দশ অধ্যায়ের পুরোহিত ও তাঁর পুত্রদের মধ্যে যে সুন্দর 'সম্বাদ'-কবিতা পাই তাতে সন্ন্যাসীর জীবন ও আদর্শকে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। মহাভারত, পুরাণ ও জাতকেও আমরা এই উপাখ্যানটি পাওয়াতে মনে হয় এটি জৈনদের নিজস্ব সৃষ্টি নয়, প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় কবিতার অংশবিশেষ। মহাবীর স্বয়ং এই সূত্রটির উপদেষ্টা বলে প্রসিদ্ধি থাকলেও সপ্তম অধ্যায়টির রচয়িতা হিসেবে কপিল নামক এক ব্যক্তির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে এই 'মূল' সূত্রটির বিষয়বস্তু হ'ল ধর্ম, আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ।

দ্বিতীয় 'মূল'সূত্র আবস্সয় বা আবস্সগ (অভাবশ্যক সূত্র) বর্তমানে ভদ্রবাহু বিরচিত 'নিজ্জুত্তি'র সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। পাপ থেকে নিবৃত্তি, তীর্থঙ্করদের মহিমা কীর্তন ইত্যাদি পূর্বোক্ত ছয়টি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যই সূত্রটির ছয়টি অধ্যায়ের আলোচ্য বস্তু। কর্তব্যগুলি পালনের পদ্ধতি নির্দেশ প্রসঙ্গে প্রাচীন টীকা অংশে কিছু উপাখ্যান অন্তর্ভুক্ত।

সন্ন্যাসজীবনের নিয়মাবলী সমন্বিত এই পর্যায়ের তৃতীয় গ্রন্থ দসবেয়ালিয় (দশবৈকালিক) কোন একজন সেজ্জংভব (শয্যম্ভব) কর্তৃক রচিত এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে গ্রন্থকর্তা সেজ্জংভব 'জিনে'র ছবি দেখেই 'জ্ঞান'লাভ করেন এবং তাঁর অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে রেখে গৃহত্যাগ করেন। কালক্রমে তাঁর মানক নামে একটি পুত্রসন্তান হয়। আটবৎসর বয়সে মানক যখন জানতে পারল যে তার পিতা সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেছেন তখন সে পিতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। মানকের আয়ুঃ আর মাত্র ছয় মাস আছে বুঝতে পেরে তার পিতা তাকে 'দসবেয়ালিয়' সূত্র উপদেশ দেন। মহাবীরের প্রায় একশত বৎসর পরে যে সেজ্জংভব সঙ্ঘনায়ক হয়েছিলেন, এই গ্রন্থকর্তা ও তিনি একই ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন। এই মূলসূত্রের টীকাতেও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিছু আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে।

পিংডনিজ্জুত্তি-ই (পিণ্ডনির্যুক্তি) সাধারণতঃ চতুর্থ মূলসূত্ররূপে উল্লিখিত হয়। সন্ন্যাসজীবন, সন্ন্যাসিগণের আহার, ভিক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত এই সূত্রটিকে ভদ্রবাহুর রচনা বলা হয়। এই গ্রন্থের পরিবর্তে কখনও কখনও ভদ্রবাহুবিরচিত ওহনিজ্জুত্তিকে (ওঘনির্যুক্তি) চতুর্থ মূলসূত্র বলা হয়। সন্ন্যাসজীবনে'র 'ওঘ' অর্থাৎ প্রবাহ বা সাধারণ নিয়মাবলীর বিবরণ এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। কখনও কখনও সূত্রটিকে তৃতীয় মূলসূত্ররূপেও ধরা হয়। পিংড-এবং ওহ-কখনও কখনও আবার 'ছেয় সুত্তে'র অন্তর্গত হয়। পক্খি বা পাক্ষিক সূত্রকেও আবার চতুর্থ মূলসূত্র

বলা হয়ে থাকে[২৪]। এক 'পক্ষে'র অপরাধ স্বীকার সম্পর্কিত নিয়মাবলী এই সূত্রটির বিষয়বস্তু।

(চ) দুইটি বিশেষ গ্রন্থ

নন্দী এবং অণুওগদার গ্রন্থ দুইটিকে কখনও কখনও 'পইণ্ণ' পর্যায়ের মধ্যে ধরা হয়, কিন্তু, সাধারণতঃ গ্রন্থ দুইটিকে যে কোন পর্যায় বা শ্রেণী বহির্ভূত দুইটি বিশেষ গ্রন্থরূপে 'মূলসুত্তে'র আগে বা পরেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এই দুইটি গ্রন্থ জৈনশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয়ের বৃহৎ কোষস্বরূপ। মূলতঃ গদ্যে রচিত হলেও গ্রন্থদু'টিতে মধ্যে মধ্যে গাথা আছে। 'অণুওগদার প্রশ্নোত্তরের আকারে রচিত। 'নন্দী'র রচয়িতা স্বয়ং দেবর্ধি এই রকম প্রসিদ্ধি আছে। গ্রন্থ দু'টিতে 'সিদ্ধান্তে'র একটি অনুবৃত্তি (survey) আছে। এই অনুবৃত্তি ছাড়াও গ্রন্থদুটিতে নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্যরস প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক ও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া শ্বেতাম্বর-সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত বলে ইসিভাসিয়াই ইত্যাদি আরও যে গ্রন্থগুলিকে দেখানো হয়ে থাকে তা' আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নেই।

পূর্বেই[২৫] বলা হয়েছে যে দিগম্বর-সম্প্রদায় প্রাচীন শাস্ত্র সম্পূর্ণ লুপ্ত বলে মনে করলেও কতকগুলি গ্রন্থকে তাঁরা শাস্ত্রতুল্য প্রামাণিক বলে মনে করেন এবং এই গ্রন্থগুলি পরবর্তীকালে তাঁদেরই রচনা। বল্লভী-সভার পর প্রচারিত শ্বেতাম্বর-সিদ্ধান্তকে তাঁরা স্বীকার করেন নি, কিন্তু তাঁরা বোধহয় কালক্রমে বুঝতে পারেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকে অপ্রামাণিক বলে অগ্রাহ্য করাই বোধ হয় যথেষ্ট নয়, শাস্ত্ররূপে নিজেদেরও কিছু সংগ্রহ থাকা উচিত। এই জন্যই সম্ভবতঃ তাঁরা স্বসম্প্রদায় রচিত কতকগুলি গ্রন্থকে শাস্ত্রের মর্যাদা দেন।

দিগম্বর-শাস্ত্র

এখন দিগম্বর-সম্প্রদায় কর্তৃক শাস্ত্রতুল্য প্রামাণিক বলে স্বীকৃত গ্রন্থগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিতে পারি।

দিগম্বর-সম্প্রদায় দ্বাদশ 'অঙ্গ' স্বীকার করেন। তাঁদের ষষ্ঠ 'অঙ্গে'র নাম 'জ্ঞাতৃ-ধর্ম-কথাঙ্গ'। তাঁদের দ্বাদশতম 'অঙ্গে'ও চতুর্দশ 'পুব্ব' অন্তর্ভুক্ত। চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তি, সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি এবং জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি—শ্বেতাম্বরশাস্ত্রের 'উপাঙ্গ' হিসাবে উল্লিখিত এই তিনটি গ্রন্থ দিগম্বরদের 'দৃষ্টিবাদে'র প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যে গ্রন্থগুলি 'অঙ্গে'র অন্তর্ভুক্ত নয়, সেগুলিকে দিগম্বর সম্প্রদায় 'অঙ্গবাহ্য' রূপে অভিহিত করেন। 'সামায়িক', 'চতুর্বিংশ-তিস্তব', 'বন্দন' এবং 'প্রতিক্রমণ' এই চারটি 'অঙ্গবাহ্য' দ্বিতীয় 'মূলসূত্রে'র অধ্যায়গুলির অনুরূপ। এই চারটি গ্রন্থ ছাড়া 'দশবৈকালিক', 'উত্তরাধ্যয়ন' এবং 'কল্পব্যবহার' অঙ্গবাহ্যের এই তিনটি গ্রন্থই কেবল শ্বেতাম্বর-শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। দুই সম্প্রদায়ের শাস্ত্র-সংগ্রহেই পাওয়া যায় এমন গ্রন্থ বা অংশই যে 'সিদ্ধান্তে'র প্রাচীনতম অংশ তা' অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

'চতুর্বেদ'

অধুনা প্রচলিত দিগম্বর-শাস্ত্রে দ্বিতীয় একটি 'সংগ্রহ' (canon) দেখা যায়, এটিকে 'পরিবর্ত-সংগ্রহ'ও বলা হয়। পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি মূল্যবান জৈন-গ্রন্থ এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমানুযোগ, করণানুযোগ, দ্রব্যানুযোগ. এবং চরণানুযোগ এই চারভাগে গ্রন্থগুলি বিভক্ত। চারভাগে বিভক্ত এই সংগ্রহকে দিগম্বর সম্প্রদায়ের 'চতুর্বেদ' রূপেও অভিহিত করা হয়।

'চতুর্বেদ' এবং তার অন্তর্গত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের বিবরণ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে চতুর্বেদের গ্রন্থগুলিকে এই ভাবে ভাগ করা হয় :

(i) প্রথমানুযোগ—আখ্যানমূলক গ্রন্থাবলী। এর মধ্যে আছে, রবিষেণ রচিত পদ্ম. পুরাণ (৮ম শতক), জিনসেন রচিত হরিবংশ পুরাণ

(৮ম শতক), এবং অপর একজন ও তদীয় শিষ্য গুণভদ্র রচিত ত্রিষষ্টিলক্ষণ-মহাপুরাণ। শেষোক্ত গ্রন্থটি আদিপুরাণ ও উত্তরপুরাণ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত।

(ii) করণানুযোগ—ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী। সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি এবং জয়ধবলা এই ভাগের অন্তর্গত।

(iii) দ্রব্যানুযোগ—আনুমানিক প্রথম শতকে রচিত কুন্দকুন্দ রচিত দার্শনিক গ্রন্থাবলী, কুন্দকুন্দ-শিষ্য উমাস্বাতি রচিত সটীক তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র, এবং সমন্তভদ্ররচিত সটীক আপ্তমীমাংসা। (৮ম শতক) এই ভাগে অন্তর্ভুক্ত।

(iv) চরণানুযোগ—এই ভাগে পাওয়া যায় বট্টকের-রচিত মূলাচার ও ত্রিবর্ণাচার (১ম শতক) এবং সমন্তভদ্ররচিত রত্নকরণ্ডশ্রাবকাচার (৮ম শতক)।

এই গ্রন্থগুলিকে দিগম্বর সম্প্রদায় শাস্ত্রতুল্য প্রামাণিক বলে মনে করেন।

১। Winternitz, HIL. II, 430

২। অমূল্যচন্দ্র সেন, জৈনধর্ম, ২০

৩। ঐ, ২১

৪। ঐ

৫। পৃঃ ১৩৪

৬। পৃঃ ১৩০

৭। পৃঃ ১৩৪

৮। Winternitz, ঐ, 430

৯। দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৩৫

১০। Winternitz, ঐ, 436

১১। অমূল্যচন্দ্র সেন, ঐ, ২৬ ; Winternitz, ঐ, 438 f. n. 1

১২। Winternitz, ঐ, 446

১৩। দিগম্বর-মতে ১৯শ-তম তীর্থঙ্কর মল্লি পুরুষ ছিলেন, মহিলা নন; শ্বেতাম্বর মতে ১৯শ-তম তীর্থঙ্কর একজন মহিলা, নাম মল্লী। দ্রঃ Winternitz, ঐ, 447, f. n. 2

১৪। Winternitz, ঐ, 449, f. n. 3

১৫। ঐ, 454, f. n. 1

১৬। অ. চ. স, ঐ, ২৮

১৭। Winternitz, ঐ, 457

১৮। ঐ, 461, f. n. 3

১৯। দ্রঃ W. Schubring, Das Mahānisīha Sutta

২০। Winternitz, ঐ, 462

২১। ঐ, 463

২২। ঐ, 466, f, n. 1

২৩। পৃঃ ১৫১

২৪। পৃঃ ১৪০

২৫। পৃঃ ১৩৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আগম-বহির্ভূত সাহিত্য

আগম-বহির্ভূত গ্রন্থ রচনার কাজ সম্ভবতঃ আগম রচনা বা সংকলন শেষ হওয়ার আগেই শুরু হয়েছিল।[১] আগম-পরবর্তী যুগের জৈন সাহিত্য অংশতঃ সংস্কৃত এবং অংশতঃ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। ঐ প্রাকৃত জৈন-মাহারাষ্ট্রী নামেও পরিচিত। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে আদিপর্বে গ্রন্থ রচনায় প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহৃত হোত, পরে খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকেই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়। সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনায় কোন কোন জৈন লেখক বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অপভ্রংশ এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেও জৈন পণ্ডিতগণ তাঁদের বক্তব্য প্রচার করেছেন।

শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য নানা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় জৈন লেখকরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ভারতীয় সাহিত্যের এমন কোন শাখা বোধ হয় নেই যা' জৈনদের দানে সমৃদ্ধ হয়নি! বস্তুতঃ প্রাকৃত সাহিত্যের অধিকাংশই জৈনদের সৃষ্টি!

পূর্বোল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ[২] অনুসারে আমরা এখন আগম-বহির্ভূত প্রাকৃত সাহিত্যের আলোচনা করতে পারি।

(ক) জৈন-ধর্মীয়-দার্শনিক গ্রন্থ

নিজ্জুত্তি

জৈন আগম সাহিত্যের আলোচনা থেকে একথা সহজেই বোঝা যায় যে শাস্ত্রগ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থের টীকা রচনার কাজ প্রায় একসঙ্গেই চলেছিল। শ্বেতাম্বর শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে যেসব টীকা লেখা হয়েছিল তার সংখ্যা বড়

কম নয়, এবং এই ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলিই পরবর্তী কালে এক ভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যে পরিণত হয়। জৈন সাহিত্যের এই অংশের নাম নিজ্জুত্তি। বেদের অর্থবোধের জন্য যেমন নিরুক্তের উদ্ভব, আগম-সাহিত্যের জন্য তেমনই 'নিজ্জুত্তি'র সৃষ্টি। আর্যা-ছন্দে ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত 'নিজ্জুত্তি'গুলি বোধহয় প্রথম দিকে জৈন শিক্ষকদের ব্যাখ্যামূলক উপদেশ ও শিক্ষাদানের সহায়করূপেই ব্যবহৃত হোত এবং পরবর্তী সময়ে ঐগুলিই বিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থের রূপ ধারণ করে। খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত টীকা, বৃত্তি, অবচূর্ণী প্রভৃতির উদ্ভবের মূলেও এই 'নিজ্জুত্তি'।

'নিজ্জুত্তি' ভারতীয় সাহিত্যে জৈন-পণ্ডিতদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। জাতক, মহাভারত, রামায়ণ, পঞ্চতন্ত্র বা এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থের মত নিজ্জুত্তি ও অন্যান্য টীকা-গ্রন্থ যথা, চুণ্ণী, বৃত্তি, অবচূর্ণী ইত্যাদিতে পশু-পক্ষীর এবং অন্যান্য বিষয়ের গল্প-উপাখ্যানের সাহায্যে সম্প্রদায়গত শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় কথা-উপাখ্যানের সাহায্যে বক্তব্য উপস্থাপিত করার ব্যাপারে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষকদের যে স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল তার পূর্ণ প্রতিফলন আমরা এই টীকা-গ্রন্থগুলিতে প্রত্যক্ষ করি। আখ্যান-উপাখ্যানের এক বিশাল ভাণ্ডার এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিতে বিদ্যমান: ভারতীয়-অভারতীয় নানা সূত্র থেকে এই উপাখ্যানগুলি সংগৃহীত।

ভদ্রবাহু রচিত 'নিজ্জুত্তি'গুলিই এই শ্রেণীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। জৈন-ঐতিহ্য অনুসারে ভদ্রবাহু দশখানি 'নিজ্জুত্তি' রচনা করেন এবং তার মধ্যে দু'টি 'নিজ্জুত্তি' সিদ্ধান্তের অঙ্গীভূত হয়েছিল[৩]। শ্বেতাম্বর-সিদ্ধান্তের নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির 'নিজ্জুত্তি' পাওয়া যায়,—আয়ারঙ্গ সুত্ত, সূয়গডঙ্গ, সূরপন্নত্তি, আবস্সয়, উত্তরজ্‌ঝয়ণ, আয়ারদসাও, কপ্‌পসুত্ত, দসবেয়ালিয়, ববহার প্রভৃতি।

চুণ্ণী

'নিজ্জুত্তি'র ধারা অনুসরণ করেই পরে চুণ্ণী (চূর্ণী) নামে আর এক শ্রেণীর সাহিত্যের উদ্ভব হয়। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতই আপন শাস্ত্রগ্রন্থের

ব্যাখ্যা করতে গিয়েই দিগম্বর-সম্প্রদায় 'চুণ্ণী'-র সৃষ্টি করেন। কঠিন, পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা হ'ল 'নিজ্জুত্তি', আর, শব্দ ও সূত্র উভয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় চুণ্ণী-তে। 'নিজ্জুত্তি' ছন্দোবদ্ধ রচনা, চুণ্ণী গদ্যে লেখা।

দিগম্বর-সম্প্রদায়ের যে কয়টি চুণ্ণী বর্তমানে পাওয়া যায়, তার মধ্যে কসায়পাহুড়-চুণ্ণী, কম্মপয়ডী-চুণ্ণী, সিওরীচুণ্ণী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শ্বেতাম্বরদেরও কয়েকটি চুণ্ণী আছে, যেমন, নিসীহ-চুণ্ণী, আবস্সয়-চুণ্ণী, দসবেয়ালিয়-চুণ্ণী ইত্যাদি।

চুণ্ণী-গুলিকে অবলম্বন করেই পরে ভাষ্য, টীকা, অবচূর্ণী প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

জৈন-পণ্ডিতগণ যে কেবল তাঁদের ধর্মগ্রন্থের টীকা ও ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত ছিলেন, তা নয়। জৈনধর্মের বিবিধ তত্ত্ব, দার্শনিক মতবাদ ও শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে উভয় সম্প্রদায়েরই বহু পণ্ডিত বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশই এখনও প্রকাশিত ও উত্তমরূপে আলোচিত হয়নি!

পট্টাবলী-থেরাবলী

খৃষ্টীয় প্রথম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত রচিত গ্রন্থ ও তাদের রচয়িতাদের ক্রম (chronology) নির্ণয় করা সহজ নয়। 'পট্টাবলী', 'থেরাবলী' জাতীয় বংশপরিচয়-মূলক-সাহিত্য কখনও কখনও এই ক্রম নির্ণয়ে আমাদের বিশেষ সাহায্য করে, কিন্তু তালিকাগুলির মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরবিরোধী তথ্য বিদ্যমান।

জৈনশাস্ত্রে আমরা যে সমস্ত আচার্য, গণধর ও শিষ্যদের নাম পাই, তাঁদেরই পরিচয় আছে পট্টাবলী-থেরাবলী জাতীয় গ্রন্থগুলিতে। কোন্ আচার্যের কতজন শিষ্য ও গণধর-শিষ্য ছিলেন, তাঁদের নাম এবং কে কার পূর্বে বা পরে আবির্ভূত হ'ন তা'র একটা মোটামুটি পরিচয় এই গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। বহু ঐতিহাসিক তথ্য অবশ্য এই গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নানা পরস্পরবিরোধী উক্তির জন্য এই গ্রন্থগুলির সাক্ষ্য

সর্বত্র অভ্রান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে নংদীসুত্ত-পট্টাবলী, কপ্পসুত্ত-থেরাবলী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কুন্দকুন্দ[4] রচিত সাতখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। দিগম্বরদের 'পট্টাবলী' অনুসারে ইনি খৃঃ প্রথম শতকের লোক। পবয়ণসার (প্রবচনসার), পংচথিকায় (পঞ্চাস্তিকায়) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

উমাস্বাতি[5] জৈনধর্মের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে উভয় সম্প্রদায়েরই সম্মানার্হ। দিগম্বর মতে তিনি কুন্দকুন্দের শিষ্য, আর শ্বেতাম্বরমতে তাঁর গুরু ছিলেন ঘোষানন্দী ক্ষমাশ্রমণ। প্রায় পাঁচশত গ্রন্থের রচয়িতা বলে তাঁকে উল্লেখ করা হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং অদ্যাবধি উভয় জৈনসম্প্রদায়ের কাছেই গ্রন্থটির মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সমভাবে স্বীকৃত।

১২ অধ্যায়ে বিভক্ত কার্ত্তিকেয় স্বামীর (খৃ: ১ম শতক) 'কত্তিকেয়গেয়ানু-পেকৃখা' গ্রন্থে কর্মবন্ধন ছিন্ন করার জন্য গৃহী ও শ্রমণদের করণীয় ধ্যান-ধ্যারণা বর্ণিত হয়েছে। কমবাদ, আত্মার স্বাতন্ত্র্য, কৃচ্ছ্রতার সাহায্যে আত্মার শোধন ইত্যাদি জৈন-তত্ত্ব এই গ্রন্থে আলোচিত। জৈনদের দ্বারা এই গ্রন্থ বিশেষরূপে সমাদৃত।

কুন্দকুন্দ এবং উমাস্বাতির মতই উভয় সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃতি পান সিদ্ধসেন দিবাকর[6]। তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রের একটি মূল্যবান টীকা ছাড়াও তিনি জৈন-ন্যায়শাস্ত্রের উপর বত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। ন্যায়াবতার তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অন্যান্য ধর্মীয় ও দার্শনিক গ্রন্থকর্তাদের মধ্যে সমন্তভদ্র, অকলঙ্ক, প্রভাচন্দ্র, বিদ্যানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রভাচন্দ্র ও বিদ্যানন্দ বিখ্যাত মীমাংসক কুমারিলভট্টের আক্রমণ থেকে স্ব-সম্প্রদায়কে রক্ষা করেন। কিন্তু, এই যুগের বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য জৈন পণ্ডিত এবং গ্রন্থকর্তা ছিলেন জিনভদ্র-শিষ্য আচার্য হরিভদ্র সূরি।

চিত্রকূটের (বর্তমান চিতোর) এক ব্রাহ্মণবংশে খৃ: অষ্টম শতাব্দীতে হরিভদ্র[7] জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ্যবিদ্যার সকল শাখায় পারদর্শিতার জন্য তাঁর মনে বিশেষ গর্ব ছিল।

তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, যদি কেউ এমন কোন বাক্য বলতে পারেন যার অর্থ তিনি জানেন না, তা' হলে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। জৈন শ্রমণা যাকিনীকে তিনি একদিন এমন একটি শ্লোক আবৃত্তি করতে শুনলেন যার অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন না! শ্লোকটির অর্থ জানতে চাইলে শ্রমণা যাকিনী তাঁকে জৈনাচার্য জিনভদ্র বা জিনভটের কাছে যেতে বললেন। জৈনসঙ্ঘে যোগ দিলে তবেই জিনভদ্র তাঁকে শিক্ষা দিতে পারেন শুনে হরিভদ্র জৈনসঙ্ঘে যোগ দেন এবং নিজেকে শ্রমণা যাকিনীর 'ধর্মপুত্র' বলে ঘোষণা করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি জৈনশাস্ত্রে এমনই জ্ঞান অর্জন করলেন যে তাঁকে বিশেষ সম্মানজনক 'সূরি' উপাধি দেওয়া হয় এবং তিনি তাঁর গুরুর উত্তরাধিকারী মনোনীত হ'ন। তাঁকে ১৪৪৪টি গ্রন্থের রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হলেও তাঁর ৮৮টি গ্রন্থের সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধদর্শনেও তিনি প্রাবীণ্য অর্জন করেন। সংস্কৃত ভাষায় জৈনশাস্ত্রের টীকা রচনা সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম করেন। হরিভদ্র 'সমরাইচ্চকহা' নামে একটি আখ্যানকাব্য রচনা করেন। জৈন মাহারাষ্ট্রীতে রচিত গ্রন্থটি 'ধর্মকথা' অর্থাৎ ধর্মসম্বন্ধীয় উপাখ্যানরূপে অভিহিত। সহজ ও সুন্দর গদ্যে রচিত এই কাব্যে মধ্যে মধ্যে আর্যা ছন্দের শ্লোক আছে। কাব্যের নায়ক-নায়িকারা নানা দুঃসাহসিক কাজের পর সংসার ত্যাগ করে তপশ্চর্যায় মন দেন।

হরিভদ্র নামে পরিচিত আরও অন্ততঃ আটজন জৈন লেখক ছিলেন। হরিভদ্র সূরির প্রায় একশ' বছর পর শীলাঙ্ক বা শীলাচার্য প্রথম দুইটি 'অঙ্গ' গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। তিনি একটি 'মহাপুরুষ চরিত'ও রচনা করেন। তাঁর নিজের রচনার জন্য তিনি যে সমস্ত প্রাকৃত গ্রন্থ বা আখ্যান ব্যবহার করেন তার সব কটিই তিনি সংস্কৃতে অনুবাদ করেন।

দশম শতাব্দীর দিগম্বর নেমিচন্দ্র জৈন সম্প্রদায়ের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নাম। সিদ্ধান্তে তাঁর বিশেষ পারংগমতার জন্য তাঁকে 'সিদ্ধান্ত-চক্রবর্তী' উপাধি দেওয়া হয়। প্রাকৃত ভাষায় তিনি দ্রব্যসংগ্রহ, গোম্মটসার, লব্ধিসার, ক্ষপণসার প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও দার্শনিক গ্রন্থ

রচনা করেন। 'গোম্মটসার' একটি বড় গ্রন্থ এবং বন্ধ, বধ্যমান, বন্ধস্বামী, বন্ধহেতু ও বন্ধভেদ জৈন-তত্ত্বের এই পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাওয়ায় গ্রন্থটি 'পঞ্চসংগ্রহ' নামেও পরিচিত।

একাদশ শতাব্দীর শান্তি সূরি এবং দেবেন্দ্রগণিন্ উত্তরজ্ঝয়ণের উপর তাঁদের বিস্তৃত টীকা রচনা করেন এবং প্রায় ঐ সময়েই নয়টি 'অঙ্গ'গ্রন্থের টীকা রচনা করেন অভয়দেব।

হরিভদ্র এবং শান্তি সূরির টীকাগ্রন্থগুলি ভারতের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। রচনাগুলির মধ্যে এমন বহু কথা ও আখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায় যা' উপনিষদ্ ও বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীগুলির অনুরূপ। যে কোন সূত্র থেকে প্রাপ্ত জনপ্রিয় শিক্ষামূলক কাহিনীগুলিকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ঐগুলিকে জৈন মতাদর্শের ছাঁচে রূপান্তরিত করে গ্রহণ করার ব্যাপারে জৈনরা বৌদ্ধদের চেয়ে বেশী তৎপর ছিলেন। এমনভাবে তাঁরা ঐ উপাদানগুলি ব্যবহার করেছেন যে ঐগুলিকে প্রকৃতই জৈন-কাহিনী বলে বোধহয়। কাহিনীগুলি এই ভাবে জৈনগ্রন্থে বিধৃত না থাকলে এর মধ্যে অনেকগুলিই হয়ত চিরতরে লুপ্ত হয়ে যেত।৮

অভয়দেবের শিষ্য মলধারি হেমচন্দ্র সূরি দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কয়েকটি টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কিছুদিন পরেই আবির্ভূত হ'ন বিখ্যাত পণ্ডিত 'কলিকালসর্বজ্ঞ' হেমচন্দ্র বা হেমচার্য। নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ লেখক হেমচন্দ্র ধর্মবিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রমাণ-মীমাংসা দর্শনবিষয়ে তাঁর অন্যতম গ্রন্থ। ত্রয়োদশ শতকের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দেবেন্দ্র সূরি অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা হলেও ছয়টি গ্রন্থের জন্যই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এই গ্রন্থগুলিতে তিনি জৈনধর্ম ও দর্শনের জটিল কর্মবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং গ্রন্থগুলিকে একসঙ্গে 'কর্মগ্রন্থ' বলেও উল্লেখ করা হয়। প্রাকৃত গাথায় রচিত এই ছয়টি গ্রন্থ হ'ল: কর্মবিপাক, কর্মস্তব, বন্ধস্বামিত্ব, ষড়শীতিকা, শতক এবং সপ্ততিকা। সমগ্র জৈনধর্মের উপর পঞ্চদশ শতকে দিগম্বর সকলকীর্তি দ্বাদশ অধ্যায়যুক্ত বিরাট গ্রন্থ তত্ত্বার্থসারদীপক রচনা করেন। প্রায় ঐ সময়েই শ্রুতসাগর

তত্ত্বার্থ-দীপিকা এবং আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। দিগম্বর সম্প্রদায়ের 'নগ্নতা'-বাদ এবং মোক্ষলাভে নারীর অযোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে ষোড়শ শতকে ধর্মসাগর প্রাকৃত ভাষায় 'কুপক্ষ কৌশিক সহস্রকিরণ' রচনা করেন। সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ জৈন শিক্ষক, সংস্কারক ও গ্রন্থকর্তা যশোবিজয় দিগম্বর-শ্বেতাম্বরের মিলনের জন্য চেষ্টা করেন। প্রাকৃত ভাষায় রচিত তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ হ'ল অধ্যাত্ম পরীক্ষা। তিনি নিজেই সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থটির একটি টীকা রচনা করেন।

(খ) মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য

ভাবে-ভাষায়, ছন্দে-অলঙ্কারে, ঘটনাবৈচিত্র্যে ও রচনাচাতুর্যে এবং কাব্য-সুষমায় প্রাকৃত-কাব্য কোন অংশেই সংস্কৃত কাব্যের চেয়ে দীন ছিল না। এমন কথাও বলা হয়েছে যে কোন এক সময় সমস্ত কাব্য-মহাকাব্যই প্রাকৃতে লেখা ছিল এবং তা' থেকেই পরে সব সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়। এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচারের স্থান এই গ্রন্থ নয় কিন্তু এর থেকে বোধ হয় ধরে নেওয়া যায় যে প্রাচীনকাল থেকেই প্রাকৃতে কাব্যগ্রন্থাদি লেখা হ'ত। প্রাচীন প্রাকৃত কাব্যের মাত্র কয়েকখানিই বর্তমান কাল পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আর সবই সম্ভবতঃ চিরতরে লুপ্ত! যেসব প্রাকৃত কাব্য এখন নামে মাত্র পর্যবসিত তাদের মধ্যে ভদ্রবাহুর বসুদেব-বিজয়, বাক্‌পতিরাজের মহুমহবিজয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বোধহয় গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎকথা'। গ্রন্থখানি লুপ্ত হওয়ায় ভারতীয় সাহিত্য ভাণ্ডার যে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত তা'তে আর সন্দেহ নেই! এই বিরাট কাব্যগ্রন্থটি খৃঃ প্রথম শতকে পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে আমরা একটা ধারণা করতে পারি তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে, যথা, বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্র-রচিত বৃহৎকথামঞ্জরী এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগর।

আমরা যে কয়খানি প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থ বর্তমানে পাই তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনা বিমলসূরির পউমচরিয় (পদ্মচরিত)। গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুসারে গ্রন্থটি মহাবীরের দেহাবসানের ৫৩০ বৎসর পর রচিত। রামায়ণের বিষয় অবলম্বনে আর্যা-ছন্দে জৈন মাহারাষ্ট্রীতে রচিত পউমচরিয় জৈন বা প্রাকৃত রামায়ণ নামেও পরিচিত। মহাবীরের নির্দেশে তাঁর প্রধান শিষ্য গোয়ম রাজা সেণিয় (বিম্বিসার)-কে এই চরিত কথা শুনিয়েছিলেন বলে কাব্যটির মুখবন্ধে বলা হয়েছে।

রামায়ণের কাহিনা বর্ণিত হ'লেও কাব্যটির ঘটনা-বর্ণনার মধ্যে সর্বত্র একটা জৈনভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং কবিও সর্বত্র বাল্মীকির অনুসরণ করেন নি। ১১৮ সর্গে এবং প্রায় ৯০০০ শ্লোকে কবি বিমলসূরি এই মহাকাব্যে 'পদ্মে'র জীবনচরিত বর্ণনা করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র এই কাব্যে 'পদ্ম' নামে পরিচিত, স্ব-নামেও অবশ্য তিনি অনেকবার উল্লিখিত। সীতা, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতিও পরিবর্তিত নামে চিত্রিত। রাবণ এবং তাঁর রাক্ষস অনুচরবর্গ জৈনমতের গোঁড়া ভক্ত রূপে বর্ণিত। রাজারা সাধারণতঃ ধার্মিক, জৈন-উপাসক এবং প্রবীণ বয়সে তাঁরা সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন। সীতা এই কাব্যে যজ্ঞভূমি থেকে জন্ম না নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রাজা জনকের আত্মজারূপে জন্ম নিয়েছেন। অর্ধ-বর্বর দেশের ম্লেচ্ছদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বিদেহরাজ জনক তাঁর কন্যা সীতাকে 'পদ্ম'-রামের প্রতি বাগ্‌দান করেন। এই সময় বিদ্যাধর-যুবরাজ চন্দ্রগতির সঙ্গে সীতার বিবাহ দেওয়ার দাবী করে বিদ্যাধরগণ রামের শক্তিপরীক্ষার উদ্দেশ্যে রামায়ণের 'হরধনু'র মতই একটি ধনু উপস্থিত করেন। রাম ছাড়া ঐ পরীক্ষায় আর কেউ সফল হন নি। শেষে 'পদ্ম' কেবল-জ্ঞান লাভ করেন ও নির্বাণ প্রাপ্ত হ'ন।

জৈনমতে জগৎ সৃষ্টির কাহিনী বিবৃত করার উদ্দেশ্য নিয়েই কবি এই মহাকাব্য রচনা করেন। প্রচলিত জনপ্রিয় কথা ও আখ্যানগুলিকে নিজেদের মতাদর্শের ছাঁচে ফেলে রূপান্তরিত করে বর্ণনা করার যে প্রবণতা জৈন

পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল এবং যার ফলে বহুল প্রচারিত কৃষ্ণ-উপাখ্যানটি এমন কি জৈন-আগমের মধ্যেই স্থান পেয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই জৈন পণ্ডিতগণ তাঁদের অনুবর্তিদের জন্য রামায়ণ-মহাভারতের ব্যবস্থা করেছিলেন।

বিমলসূরির অনুকরণ করে পরে আরও অনেক জৈন-কবি রাম-কাহিনীর পুনর্বিন্যাস করে কাব্যরচনা করেন। সম্পূর্ণভাবে পউমচরিয়ের আদর্শেই রবিষেণ ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃতে 'পদ্মপুরাণ' রচনা করেন। উত্তরপুরাণের ৬৮তম পর্বেও রাম-কাহিনী পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র রচিত ত্রিষষ্টিশলাকা-পুরুষ চরিত্রের ৭ম পর্বে আবার জৈন রাম-কাহিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই অংশটিকেও জৈন-রামায়ণ বলা হয়।

মহাভারত ও পুরাণ

রামায়ণ-কাহিনীর মত মহাভারতের কাহিনী নিয়েও জৈনরা নিজেদের মহাভারত রচনা করেন। জৈন-মহাভারতের অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত৯। প্রাকৃত-মহাভারতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল অপভ্রংশ ভাষায় রচিত ধবলকবির গ্রন্থখানি।

সংস্কৃত পুরাণ সাহিত্যের অনুকরণে জৈনরা তাঁদের মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বনে জৈন-পুরাণ বা চরিতাবলীর সৃষ্টি করেন। সংস্কৃত পুরাণের সংজ্ঞা অবশ্য এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই জাতীয় গ্রন্থকে জৈনরা 'মহাপুরাণ' বলে থাকেন। যে গ্রন্থে ৬৩ জন জৈন-মহাপুরুষের জীবনী বর্ণিত হয় তা' 'তিসট্ঠি-লক্খণ-মহাপুরাণ' নামে পরিচিত।

এতক্ষণ আমরা যে সব কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করেছি সেগুলি যে সাহিত্যসৃষ্টির তাগিদে রচিত হয় নি তা' সহজেই বোঝা যায়। গ্রন্থগুলি রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জৈন ধর্মের প্রচার এবং এই জন্যই উপযুক্ত সাহিত্যরস সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। কিন্তু, বিভিন্ন সময়ে এমন কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রাকৃত মহাকাব্য রচিত হয়েছিল যেগুলি পুরোপুরি সাহিত্যিক-প্রেরণা-জাত এবং সমালোচকদের দ্বারা বিশেষ সমাদৃত। এইরূপ প্রাকৃত-মহাকাব্যের মধ্যে প্রাচীনতম হ'ল প্রবরসেন রচিত সেতুবন্ধ। প্রাকৃত

সাহিত্যের উপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যে কতখানি তা' এই জাতীয় প্রাকৃত কাব্য আলোচনা করলেই বোঝা যায়।

সেতুবন্ধ

মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত সেতুবন্ধের বিকল্প নাম রাবণবহো এবং দহমুহবহো। এই প্রাচীন মহাকাব্যটির রচয়িতা প্রবরসেন বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু এই প্রবরসেন প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কারও মতে কাশ্মীর রাজ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রবরসেন এই মহাকাব্য রচনা করে বিতস্তা নদীর উপর 'সেতু' নির্মাণের ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখতে প্রয়াসী হ'ন। আর এক মতে বাকটক দ্বিতীয় প্রবরসেনই এই মহাকাব্যের রচয়িতা। প্রবরসেন-রচিত অন্য কোন গ্রন্থের সন্ধান আমরা এখন পর্যন্ত পাই নি, এ জন্য অনেকে মনে করেন যে কাব্যটি কোন সভাকবি রচনা করে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজার নামাঙ্কিত করে দেন।

প্রবরসেন যিনিই হোন না কেন বা গ্রন্থটি যাঁরই রচনা হোক, 'সেতুবন্ধ' যে প্রাচীন সাহিত্যিক-সমালোচকদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের প্রসঙ্গে বলেছেন,

মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্ ॥

'মহারাষ্ট্রদেশে ব্যবহৃত ভাষাই শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতরূপে পরিচিত। সুভাষিতরূপ রত্নসমূহের সাগরসদৃশ আকর যে সেতুবন্ধাদি মহাকাব্য সেগুলি এই প্রাকৃতেই রচিত।'

কবিকুলের প্রশংসা প্রসঙ্গে বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে বলেছেন,

"কীর্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা ॥"

'সেতু বন্ধন করে রামচন্দ্রের কপিসেনা যেমন সাগর পারে পৌঁছেছিল,

সেতুবন্ধ কাব্যের সাহায্যে প্রবরসেনের কুমুদোজ্জ্বলা কীর্তি তেমনই সাগরের পারে প্রসারিত হয়েছিল।'

বাণভট্টের উক্তি অনুসারে এমন ধারণা অসঙ্গত নয় যে, সে যুগে বহির্ভারতে যে সব দেশে সংস্কৃত তথা ভারতীয় সাহিত্যের চর্চা ছিল, যেমন লঙ্কা, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ প্রভৃতি, হয়ত সেই সব সাগরপারের দেশেও 'সেতুবন্ধে'র সমাদর হয়েছিল।

১৫ আশ্বাস বা সর্গের এই মহাকাব্যটি যে রামায়ণ অবলম্বনে রচিত তা' গ্রন্থটির নাম থেকেই বোঝা যায়। সীতার অন্বেষণ থেকে শুরু করে দশাননের সংহার পর্যন্ত রামায়ণের কাহিনী কবির নিপুণতা ও কবি প্রতিভার সাহায্যে বেশ সরস এবং আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণিত। পুরাতন কাহিনীও আধুনিক নতুন রসের আধার হয়েছে। পাঠকদের মনোরঞ্জন করবার মত উপাদানও এই কাব্যে আছে। কিন্তু মধ্যে-মধ্যে কবির শব্দাড়ম্বর প্রয়োগের মোহ কাব্যটিকে পাশ্চাত্য সমালোচকদের সমাদর লাভে বঞ্চিত করেছে। প্রত্যেক সর্গের অন্তিম শ্লোকে 'অনুরাগ' শব্দের প্রয়োগ, যমক-অনুপ্রাসের বাহুল্য, দীর্ঘ সমাস ও কষ্ট-কল্পনার একান্ত আধিক্যের ফলে শব্দাড়ম্বরের কাছে অর্থগৌরব ম্লান হয়ে গেছে। এই কাব্যের অঙ্গী বীররসের সঙ্গে শৃঙ্গাররসের মিশ্রণ কিন্তু কবির নিপুণতারই পরিচায়ক।

গউডবহো

অপর যে প্রাকৃত মহাকাব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে'টি হ'ল বাক্‌পতিরাজ বিরচিত **গউডবহো** (গৌড়বধ)। এই মহাকাব্য 'সর্গবন্ধ' কাব্য নয়, ১২০৯টি আর্যা ছন্দের শ্লোকে গ্রন্থটি রচিত।

কণৌজরাজ যশোবর্মণ দেবের সভাকবি বাক্‌পতিরাজ ৭৫০ খৃষ্টাব্দে কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যটির মুখ্য বিষয়বস্তু কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা যশোবর্মণের প্রশস্তি, কবির আত্মচরিত ও কাব্যরচনার ইতিহাসও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে কাব্যটিকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে মনে করা হলেও এতে

ইতিহাসের উপাদান কিছুই নেই। কাব্যের নামকরণ থেকে মনে করা অসঙ্গত নয় যে যশোবর্মণের হাতে গৌড়-রাজের মৃত্যুই হয়ত এই কাব্যের আলোচ্য বস্তু। কিন্তু এই গৌড়-রাজ কে, তাঁর রাজধানী কোথায়, যশোবর্মণের সঙ্গে তাঁর শত্রুতার কারণ কী ইত্যাদি কোন বিষয়ই এই কাব্য পাঠে পরিস্ফুট হয় না।

দেবদেবীর স্তুতি দিয়ে সাধারণ সংস্কৃত কাব্যের মতই এই কাব্যের সূচনা। প্রাকৃত ভাষাও যে উৎকৃষ্ট কাব্যরচনার বাহন হ'তে পারে তার আলোচনা করে কবি আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় যশোবর্মণ ও তাঁর দিগ্‌বিজয় যাত্রার বর্ণনা করেছেন। কবির কাছে বিষ্ণুসদৃশ এই রাজার বর্ণনা শেষ করে আত্মচরিতমূলক একটি অংশে কবি তাঁর এই কাব্যরচনার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। রাজসভার বিদ্বন্‌মণ্ডলী নাকি কবিকে যশোবর্মণের চরিত্র রচনার অনুরোধ জানান। এই খানেই কাব্যখানির পরিসমাপ্তি।

সমাপ্তির এই আকস্মিকতার জন্য মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হয় কবি গ্রন্থখানি শেষ করে যেতে পারেন নি, আর নয়ত সম্পূর্ণ গউডবহো আমাদের হস্তগত হয়নি। কাব্যটির নামকরণ যে বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দেয় তা'তে মনে হয় কবির কল্পনার এক বিরাট মহাকাব্যের ভূমিকাটুকু মাত্রই আমরা হাতে পেয়েছি।

সেতুবন্ধের তুলনায় এই কাব্যে কৃত্রিমতা অল্প এবং কাব্যগুণ হয়ত কিছু বেশী। দুর্বোধ্য পদ, কষ্টকল্পনা ও জটিল অলঙ্কারাদির প্রয়োগে কবি তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেবার প্রয়াস পাননি। অনর্থক শব্দাড়ম্বরে কাব্যটি ভারাক্রান্ত নয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় কবি তাঁর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। সে যুগের পল্লীজীবনের যে মনোজ্ঞ চিত্র এই কাব্যে প্রতিফলিত তার তুলনা সংস্কৃত কাব্যগুলিতেও পাওয়া যায় না।

কুমারপাল চরিত

আটখণ্ডে বিভক্ত কুমারপালচরিত প্রসিদ্ধ প্রাকৃত পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরি রচিত একটি প্রাকৃত কাব্য। বস্তুতঃ গ্রন্থটি হেমচন্দ্র রচনা করেন তাঁর প্রসিদ্ধ প্রাকৃত ব্যাকরণ 'সিদ্ধ-হেমচন্দ্রে'র প্রাকৃতাংশের দৃষ্টান্ত রূপে এবং

সে দিক থেকে গ্রন্থটি সংস্কৃত 'ভট্টিকাব্যে'র সঙ্গে তুলনীয়। ব্যাকরণের সূত্রের প্রয়োগ ও দৃষ্টান্ত হিসেবে রচিত হওয়ার জন্য কাব্যটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও উচ্চ সাহিত্য গুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে না পারলেও ছন্দে ব্যাকরণের দৃষ্টান্ত রচনা করার বিষয়ে গ্রন্থকারের বিদ্যাবত্তা ও রচনাকৌশল প্রশংসনীয়।

অণ্‌হিলওয়াড়া-র অধিপতি কুমারপালের কাহিনী এই কাব্যের বস্তু। রাজার এবং প্রজাদের জৈনধর্মে অনুরাগ, রাজধানীর ঐশ্বর্য, কুমারপালের সঙ্গে যুদ্ধে কোঙ্কনরাজ মল্লিকার্জুনের পরাজয় ও মৃত্যু ইত্যাদি প্রথম ছয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয়। শেষ দুই খণ্ডে নানা ধর্মোপদেশ ও জৈন-ধর্মতত্ত্ব বিবৃত।

কুমারপাল-প্রতিবোধ

কুমারপাল-প্রতিবোধ ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে রচিত পাঁচ প্রস্তাবের একটি আখ্যানকাব্য। গ্রন্থকার সোমপ্রভ রাজা কুমারপাল এবং হেমচন্দ্র সূরির সমসাময়িক। হেমচন্দ্র এই কাব্যে বক্তারূপে আবির্ভূত এবং তিনিই নাকি রাজা কুমারপালকে জৈন মতে বিশ্বাসী করে তোলেন। কাব্যটিতে জৈনধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৫৪টি গল্পের মাধ্যমে কবি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। এই গল্পগুলির অধিকাংশই অন্যান্য জৈন গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ প্রাকৃতে রচিত হলেও মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত এবং অপভ্রংশের প্রক্ষেপ আছে।

অন্যান্য প্রাকৃত-কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৮০০ খৃষ্টাব্দে কবি কোউহল (কুতূহল) রচিত লীলাবঈকহা। ১৩৩৩/১৩৩৪ শ্লোকে রচিত রোমান্টিক্ জাতীয় এই কাব্যটি কোন সর্গ, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত নয়। সিংহলরাজ শীলামেঘের কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা সাতবাহনের বিবাহ এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। বহু ঐতিহাসিক উপাদান সমন্বিত এই কাব্যের ভাষা ও রচনাশৈলী সরল ও সুন্দর। একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত ধনেশ্বরের সুরসুন্দরীচরিয়ম্ আর একটি বিশিষ্ট প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থ।

(গ) গীতিকাব্য ও নীতিকবিতা

ভারতীয় গীতিকাব্যের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। প্রাকৃত গীতিকাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন সম্ভবতঃ নাট্যশাস্ত্রের 'ধ্রুবা' গানগুলি। 'ধ্রুবা' গানগুলিতে কাব্যরসের অভাব ছিল না এবং পরবর্তী যুগের গীতিকাব্যের আদিরস-বহুলতা ধ্রুবা-গানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

ধর্মমূলক গীতিকাব্য-সাহিত্য জৈনদের দানে সমৃদ্ধ। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে তাঁরা এ জাতীয় বহু স্তব-স্তোত্র রচনা করেন। ভদ্রবাহুরচিত 'উবসগ্‌গহর স্তোত্র' এই শ্রেণীর প্রাচীনতম রচনা বলে পরিচিত।

প্রাকৃত গীতিকবিতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হ'ল হাল বা সাতবাহন রচিত সত্তসই বা গাথা-সপ্তশতী[১০]। গ্রন্থকার হাল ছিলেন দক্ষিণ ভারতের প্রতিষ্ঠানপুরের সাতবাহন বংশের রাজা। শিলালেখ সমূহে একাধিক সাতবাহনের উল্লেখ থাকায় এই সংকলনের রচয়িতা যে কে, সে সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারও মতে গ্রন্থকার হাল সাতবাহন খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক, আবার কোন মতে তাঁর সময় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের পূর্বে হ'তে পারে না। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বিচারে গাথা-সপ্তশতীর প্রাকৃত খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতকের শিলালেখগুলিতে ব্যবহৃত প্রাকৃতের তুলনায় বেশ পরবর্তীকালের।

গাথা-সপ্তশতী বস্তুতঃ আর্যা-ছন্দে রচিত সাতশ' প্রাকৃত গাথার একটি সংকলন। কোন কোন recension এ সাতশতের বেশী এমন কি এক হাজার গাথা পর্যন্ত পাওয়া গেছে। বিভিন্ন কবি বা রচয়িতার নামে গাথাগুলি চিহ্নিত না হ'লেও এগুলি যে একই ব্যক্তির রচনা নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একজন টীকাকার প্রায় একশ' জন রচয়িতার নাম উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়গুলি বিচার করলে গ্রন্থটিকে একটি কোশকাব্য বা anthology বলা যায়।

এই গ্রন্থের গাথাগুলি মুখ্যতঃ আদিরসাত্মক। অধিকাংশ প্রাকৃত গদ্য-পদ্য রচনার মূলে যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিল তার কোন আভাস এই সংকলনে পাওয়া যায় না। সহজ হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের জন্য

গাথাগুলি আকর্ষণীয়। অনবদ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঋতু পর্যায়ের বর্ণনা সংগ্রহটির একটি বিশেষ সম্পদ। সমসাময়িক ভারতবর্ষের জনগণের সাধারণ সুখ-দুঃখ এবং আনন্দ-বেদনার চিত্র হিসেবে গাথা-সপ্তশতী বিশেষ মূল্যবান। লোক-সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হ'লেও এই গাথা-কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য উচ্চ মানের।

সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম অনুভূতি, তাদের উদ্দাম বিলাসলীলা, হৃদয়াবেগের কারুণ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় গাথাগুলির মাধ্যমে পরিস্ফুট। কেবল বিষয়বস্তুর জন্য নয়, রচনাভঙ্গীর জন্যও গাথাগুলি সাহিত্যরসিকদের দ্বারা সমাদৃত। অনেকের মতে সংস্কৃত কবিদের গীতিকাব্য রচনার প্রেরণা হ'ল গাথা-সপ্তশতী। সাহিত্যে শ্রীরাধার প্রথম উল্লেখ সম্ভবতঃ এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়। ভাবের সুন্দর অভিব্যক্তির দৃষ্টান্ত রূপে গাথা-সপ্তশতীর কয়েকটি গাথার উল্লেখ করা হ'ল ঃ

তং মিত্তং কাঅব্বং জং কির বসণম্মি দেসআলম্মি।
আলিহিঅ-ভিত্তি-বাউল্লঅং ব ণ পরম্মুহং ঠাই ॥১১

'বন্ধু তাঁকেই করা উচিত যিনি বিপদে যথাসময়ে সাহায্য করেন, দেয়ালে আঁকা ছবির মত চুপ করে থাকেন না।'

সো অত্থো জো হত্থে তং মিত্তং জং ণিরন্তরং বসণে।
তং রূঅং জত্থ গুণা তং বিণ্ণাণং জহিং ধম্মো ॥১২

'যা' হাতে আছে তাই হ'ল অর্থ, বিপদের সময় যে কাছে থাকে সেই হ'ল মিত্র, যেখানে গুণ আছে, তাই হ'ল রূপ, আর, তাই হ'ল পাণ্ডিত্য যার মধ্যে ধর্ম আছে।'

বসণম্মি অণুব্বিগ্গা বিহবম্মি অগব্বিআ ভএ ধীরা।
হোন্তি অহিণ্ণসহাবা সমেসু বিসমেসু সপ্পুরিসা ॥১৩

'সৎপুরুষেরা বিপদে অনুদ্বিগ্ন, ঐশ্বর্যে অগর্বিত, ভয়ে ধীর, এবং সম ও বিষম উভয় অবস্থাতেই অভিন্নস্বভাব থাকেন।'

গাথা-সপ্তশতীর পরই উল্লেখযোগ্য শ্লোকসংগ্রহ বা কোশ-গ্রন্থ হ'ল জৈন-কবি জয়বল্লভ রচিত প্রাকৃত কবিতা-সংগ্রহ বজ্জালগ্গ। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ—চতুর্দশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। এই সংগ্রহে

৭৯৫টি শ্লোক পাওয়া যায়। মনে হয় গ্রন্থটি সপ্তশতীর আদর্শেই রচিত হয়েছিল এবং ৯৫টি শ্লোক পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত। আদিরসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হ'লেও এই গ্রন্থে উহাই একমাত্র রস নয়। এক একটি বিষয়ের শ্লোক এক একটি 'বজ্জা'-র (ব্রজ্যা) অন্তর্গত এবং বজ্জা-অনুসারে সাজানো হওয়ার জন্যই গ্রন্থটির নাম বজ্জালগ্‌গ। গাথা-সপ্তশতী সহ নানা পুস্তক থেকে নানা বিষয়ের বিচিত্র সুভাষিত সংগ্রহ করে এই সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে মুনিচন্দ্রের 'গাথাকোষ', সময়সুন্দরের 'গাথাসহস্রী' এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ভববৈরাগ্যশতক' ও 'প্রাকৃতসূক্তরত্নমালা' বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) নাটক

সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের গোড়া থেকেই চলে আসছে। সম্ভবতঃ নাটকের মধ্যমেই 'প্রাকৃত ভাষা সর্বপ্রথমে শিষ্ট-সাহিত্যে প্রবেশ করার'[১৪] সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর আগে সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃত ভাষায় রচিত কোন নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রাকৃতে নাটক রচনার ব্যাপারে মনে হয় রাজশেখরই পথিকৃৎ। রাজশেখরের পরেও প্রাকৃতে খুব বেশী নাট্যগ্রন্থ রচিত হয়নি।

রাজশেখরেব কর্পূরমঞ্জরী উচ্চশ্রেণীর নাটক না হ'লেও নাট্যসাহিত্যের সট্টক-জাতীয় রচনার দৃষ্টান্ত রূপে নাট্যরসিক ও সমালোচক মহলে সুবিদিত। সট্টকের অস্তিত্ব প্রাচীন কালেও সম্ভবতঃ ছিল কিন্তু প্রাচীনতর কোন সট্টকের কথা আমরা এখনও জানিনা, সট্টক-শ্রেণীর নাট্যরচনায় প্রাকৃত ভাষার আধিক্য বিহিত।[১৫] কর্পূরমঞ্জরীর প্রাকৃত মূলতঃ শৌরসেনী, কিন্তু কোন পণ্ডিতের মতে এই ভাষা আবন্তী, আবার কেউ বলেন এই ভাষা শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রীর সংমিশ্রণ।

চারটি জবনিকায় (অঙ্ক) বিভক্ত কর্পূরমঞ্জরীর বিষয়বস্তুতে কোন বৈচিত্র্য নেই। অতি রূপবতী অজ্ঞাতকুলশীলা এক কুমারীর প্রতি প্রেমে

রাজা চণ্ডপালের ব্যাকুলতা, রাণীর ঈর্ষা, প্রণয়ীযুগলের গোপন সাক্ষাৎ ও পরিণামে বিবাহ ইত্যাদি এই সট্টকে বর্ণিত। রাজশেখর তাঁর এই রচনায় অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে বৈদর্ভী, পাঞ্চালী ও গৌড়ী এই তিন রীতিই ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হলেও রাজশেখর কৃতিত্বের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে সংস্কৃত ছাড়া কেবল প্রাকৃতেই নাটক রচনা সম্ভব। প্রস্তাবনায় কবি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন কেন তিনি সংস্কৃত ছেড়ে প্রাকৃতে নাটক রচনা করলেন।

পরবর্তী সময়ে রচিত অপর যে কয়েকটি সট্টক পাওয়া যায় তা'দের মধ্যে নয়চন্দ্রের রম্ভামঞ্জরী (চতুর্দশ শতাব্দী), রুদ্রদাসের চন্দ্রলেখা (সপ্তদশ শতাব্দী), মার্কণ্ডেয়ের বিলাসবতী (সপ্তদশ শতাব্দী) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) ব্যাকরণ

প্রাকৃত ভাষার জন্য ব্যাকরণ রচনা বেশ প্রাচীনকালেই শুরু হয় এবং এই শ্রেণীর রচনায় প্রাকৃত সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রাকৃত ব্যাকরণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল পালি ব্যাকরণ যেমন পালি ভাষাতেই রচিত প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ কিন্তু সংস্কৃতে রচিত। সে দিক থেকে 'প্রাকৃত' ব্যাকরণের কোন অস্তিত্ব নেই এবং এই বিষয়ে প্রাকৃত সাহিত্যের অঙ্গীভূত কোন বিবরণ ও আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু, প্রাকৃত ভাষার জন্য রচিত ব্যাকরণ সম্পর্কে একটি ধারণা ছাড়া প্রাকৃত সাহিত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ।

প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। পরবর্তীকালে যে সমস্ত প্রাকৃত-ব্যাকরণ লেখা হয় পণ্ডিতেরা সেগুলিকে দু'টি বিভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায় হিসেবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন।[১৬] তাঁদের মতে সারা ভারতবর্ষে কখনও একই শ্রেণীর প্রাকৃত-ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল না, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য এই দুই শাখার অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেন।

প্রাচ্য শাখার অন্তর্ভুক্ত বৈয়াকরণরা মনে করেন যে শাকল্য, ভরত, কোহল প্রভৃতির অনুবর্তী হিসেবে তাঁরাই হলেন আদি ও প্রাচীনতম সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন বৈয়াকরণ হলেন বররুচি, ক্রমদীশ্বর, লঙ্কেশ্বর, রাম তর্কবাগীশ, মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র প্রমুখ। পাশ্চাত্য শাখার বৈয়াকরণরা বাল্মীকিকে তাঁদের পূর্বসূরী হিসেবে দাবী করেন। এই শাখার বৈয়াকরণদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ত্রিবিক্রম, লক্ষ্মীধর, সিংহরাজ প্রভৃতি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেমচন্দ্র পাশ্চাত্য শাখার অন্যতম প্রবক্তা রূপে পরিগণিত হলেও তিনি তাঁর গ্রন্থে নিজস্ব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

আমরা যে সমস্ত প্রাকৃত ব্যাকরণ ও বৈয়াকরণদের কথা জানি তার মধ্যে বররুচি প্রাচীনতম বৈয়াকরণ এবং তাঁর প্রাকৃত প্রকাশ প্রাচীনতম ব্যাকরণ। প্রাকৃত-বৈয়াকরণ বররুচি ও পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র বার্তিককার কাত্যায়ন অভিন্ন বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে কাত্যায়ন বররুচির গোত্রনাম।

প্রাকৃত প্রকাশে বারোটি পরিচ্ছেদ ও ৪৮টি সূত্র আছে। প্রথম নয়টি পরিচ্ছেদে মাহারাষ্ট্রী, (সূত্র সংখ্যা ৪২৪) দশম পরিচ্ছেদে পৈশাচী (সূত্র ১৪), একাদশে মাগধী (সূত্র ১৭), এবং দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শৌরসেনী (সূত্র ৩২) প্রাকৃতের আলোচনা করা হয়েছে। মনোরমা নামে ভামহ এই গ্রন্থের একটি টীকা রচনা করেন। প্রাকৃত মঞ্জরী নামে কাত্যায়ন রচিত একটি টীকাও পাওয়া যায়।

চণ্ডের প্রাকৃতলক্ষণ প্রাকৃত ভাষার অন্যতম প্রাচীন ব্যাকরণ। বিভক্তি বিধান, স্বরবিধান ও ব্যঞ্জনবিধান এই তিন ভাগে মোট ৯৯টি সূত্রে চণ্ড মাহারাষ্ট্রী, অর্ধমাগধী, জৈনমাহারাষ্ট্রী ও জৈনশৌরসেনী প্রাকৃতের আলোচনা করেছেন। একটি সংস্করণে ব্যঞ্জনবিধানের শেষ তিনটি সূত্র নিয়ে ভাষান্তর বিধান নামে এই গ্রন্থের একটি চতুর্থ বিভাগের উল্লেখ আছে। বিষয়বস্তু ও আলোচনার ধারা পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে আমরা বর্তমানে যে প্রাকৃতলক্ষণ পাই তা' অসম্পূর্ণ।

হেমচন্দ্র সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাতেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

তাঁর প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ সিদ্ধহেমচন্দ্র বা সিদ্ধহেমচন্দ্র-শব্দানুশাসন পাণিনিকৃত 'অষ্টাধ্যায়ী'র মত আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম সাতটি অধ্যায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের এবং অষ্টম অধ্যায়ে প্রাকৃত ব্যাকরণের আলোচনা আছে। প্রত্যেক অধ্যায় চারটি 'পাদে' বিভক্ত। অষ্টম অধ্যায়ে ১১১৯টি সূত্রের সাহায্যে হেমচন্দ্র মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, চূলিকা-পৈশাচী, এবং অপভ্রংশ প্রাকৃতের লক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণের এত বিস্তৃত আলোচনা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

হেমচন্দ্রের মত ক্রমদীশ্বরও তাঁর সংস্কৃত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের অষ্টম বা শেষ অধ্যায়ে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণের আলোচনা করেছেন। স্বরকার্য, হল্‌কার্য, সুবন্তকার্য, তিঙন্তকার্য, অপভ্রংশকার্য, ছন্দঃকার্য এই ছয়টি ভাগে গ্রন্থকার প্রাকৃত ভাষার আলোচনা করেছেন। ক্রমদীশ্বর তাঁর সূত্রগুলির জন্য একটি বৃত্তিও রচনা করেন।

ত্রিবিক্রমের প্রাকৃত ব্যাকরণ আসলে একটি টীকা গ্রন্থ। এই টীকা তিনি রচনা করেন বাল্মীকির তথাকথিত সূত্রগুলির উপর। সূত্রগুলি বিষয় অনুসারে সাজিয়ে সমগ্র গ্রন্থটিকে তিনি তিন অধ্যায়ে ভাগ করেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে আবার চারটি করে 'পাদ' আছে। ত্রিবিক্রম তাঁর ব্যাকরণে মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চূলিকা-পৈশাচী এবং অপভ্রংশের আলোচনা করেছেন।

ত্রিবিক্রমের গ্রন্থ অনুসরণ করে বাল্মীকি-সূত্রের ভিত্তিতে সিংহরাজ তাঁর প্রাকৃতরূপাবতার রচনা করেন।

বাল্মীকি-সূত্রের ভিত্তিতেই লক্ষ্মীধর তাঁর ষড্‌ভাষাচন্দ্রিকা রচনা করেন। অপ্পয়দীক্ষিতের প্রাকৃতমণিদীপ ও একই ভাবে রচিত।

বাল্মীকি-সূত্র প্রণেতা বাল্মীকি কে ছিলেন তা' নিরূপণ করা সহজ নয়, কিন্তু, ত্রিবিক্রম, সিংহরাজ, লক্ষ্মীধর ও অপ্পয়দীক্ষিত তাঁদের ব্যাকরণগুলি এই বাল্মীকি-সূত্রের টীকা-টিপ্পনী রূপেই রচনা করেন।

মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র একজন কবি ও বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনিই সম্ভবতঃ

সর্বপ্রথম পদ্যে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। কুড়ি অধ্যায়ে বিভক্ত তাঁর প্রাকৃত সর্বস্ব সম্পূর্ণরূপে আর্যা-ছন্দের শ্লোকে রচিত। তিনি প্রাকৃত ভাষাগুলির যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃত সর্বস্বে তিনি প্রাকৃত ভাষাগুলিকে এই ভাবে ভাগ করেছেন :

ক। ভাষা	খ। বিভাষা	গ। অপভ্রংশ	ঘ। পৈশাচী
১। মাহারাষ্ট্রী	১। শাকারী	১। নাগর	১। কেকয়-পৈশাচিকী
২। শৌরসেনী	২। চাণ্ডালী	২। ব্রাচড	২। শৌরসেন পৈশাচিকী
৩। প্রাচ্যা	৩। শাবরী	৩। উপনাগর	৩। পাঞ্চাল পৈশাচিকী
৪। আবন্তী	৪। আভীরিকা		
৫। মাগধী	৫। টাক্কী বা ঢক্কী		

এই ষোলটি প্রাকৃতেরই আলোচনা তিনি করেছেন, তার মধ্যে গ্রন্থের প্রথম আটটি পরিচ্ছেদই মাহারাষ্ট্রীর আলোচনা। মার্কণ্ডেয় তাঁর গ্রন্থে পূর্বসূরী হিসেবে ভরত, শাকল্য ও কোহলের উল্লেখ করেছেন।

রামশর্মাতর্কবাগীশের প্রাকৃতকল্পতরুও পদ্যে রচিত। গ্রন্থটিতে তিনটি 'শাখা' বা বিভাগ আছে। প্রত্যেকটি শাখা 'স্তবকে' এবং প্রত্যেকটি স্তবক আবার 'কুসুমে' বিভক্ত। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন যে লঙ্কেশ্বর কৃত প্রাচীনতর ব্যাকরণ 'প্রাকৃতকামধেনু' থেকে তিনি তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

উপর্যুক্ত প্রধান প্রধান প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি ছাড়া আরও অনেক বৈয়াকরণ ও ব্যাকরণের নাম পাওয়া যায়। ঐ ব্যাকরণগুলির মধ্যে সমন্তভদ্রের প্রাকৃতব্যাকরণ, নরচন্দ্রের প্রাকৃত প্রবোধ, কৃষ্ণপণ্ডিতের প্রাকৃত-চন্দ্রিকা, বামনাচার্যের প্রাকৃতচন্দ্রিকা, রঘুনাথশর্মার প্রাকৃতানন্দ, নরসিংহের প্রাকৃত-প্রদীপিকা, ভামকবির ষড্‌ভাষাচন্দ্রিকা, শুভচন্দ্রের প্রাকৃতব্যাকরণ, শ্রুতসাগরের ঔদার্যচিন্তামণি, পুরুষোত্তমের প্রাকৃতানুশাসন, ভোজের প্রাকৃতব্যাকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আরও অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণের নাম

বিভিন্ন সূত্র[১৭] থেকে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্র ছাড়া বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণেও প্রাকৃত ব্যাকরণের কিছু আলোচনা পাওয়া যায়।

(চ) বিবিধ—: কোষ, ছন্দঃশাস্ত্র প্রভৃতি

আধুনিক কালের বাচস্পত্য, শব্দকল্পদ্রুম জাতীয় কোষ বা অভিধানগ্রন্থ বাদ দিলেও যাস্ক থেকে মেদিনীকার পর্যন্ত অনেক সংস্কৃত কোষ রচিত হয়েছিল, সে তুলনায় পালি এবং প্রাকৃতে এই শ্রেণীর গ্রন্থ বিশেষ পাওয়া যায় না। আমরা এখন পর্যন্ত দুইখানি প্রাকৃত কোষের কথা জানি,—ধনপাল রচিত পাইয়লচ্ছীনামমালা এবং হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা। দেশীনামমালার টীকায় অবশ্য অন্য কয়েকজন প্রাকৃত অভিধান-প্রণেতার নাম পাওয়া যায় এবং ঐ ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে যে আরও কয়েকটি প্রাকৃত অভিধানের অস্তিত্ব ছিল।

ধনপালের পাইয়লচ্ছীনামমালা আর্যা ছন্দে রচিত একটি প্রাকৃত কোষ গ্রন্থ। সংস্কৃত অমরকোষের সঙ্গে এই গ্রন্থের তুলনা করা যেতে পারে। প্রাকৃত ভাষার এই কোষে ২৭৯টি গাথা আছে। কোনরূপ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ হিসেবে গ্রন্থটি বিভক্ত না হলেও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে এই অভিধান চারটি ভাগে বিভক্ত বলে মনে হয়।

গ্রন্থের শেষ চারটি গাথায় ধনপাল তাঁর নিজের কিছু পরিচয় দিয়েছেন। বিক্রমাব্দের ১০২৯ বৎসর পরে মালবরাজ কর্তৃক মান্যখেট লুণ্ঠিত হওয়ার পর ধনপাল এই অভিধান রচনা করেন বলে উল্লেখ করেছেন[১৮]। এই ঘোষণার ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি যে ধনপাল দশম-একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। অপর একটি গাথায়[১৯] বলা হয়েছে যে ধারা নগরীতে বাস কালে গ্রন্থকার তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনীর জন্য এই কোষটি রচনা করেন। মেরুতুঙ্গ রচিত 'প্রবন্ধচিন্তামণি'তেও ধনপালের জীবনচরিত পাওয়া যায়। কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ধনপাল উজ্জয়িনীর অধিবাসী ছিলেন এবং সাংসারিক মনোমালিন্যের জন্য তিনি ধারা নগরীতে বাস করতে যান বলে মেরুতুঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা আর্যা-ছন্দে রচিত প্রাকৃত ভাষার একটি বহুল প্রচারিত কোষগ্রন্থ। 'রত্নাবলী', দেশীশব্দসংগ্রহবৃত্তি' ইত্যাদি নামেও গ্রন্থটি অভিহিত হয়।

দেশীনামমালায় হেমচন্দ্র প্রাকৃত ভাষায় 'দেশী' শব্দ সংগ্রহ করেছেন। দেশভেদে দেশী শব্দের বিভিন্নতার জন্য সমস্ত 'দেশী' শব্দ সংগ্রহ করা যে সম্ভব নয় তা' স্বীকার করে হেমচন্দ্র এই কোষে কেবলমাত্র অতিপ্রসিদ্ধ 'দেশী' শব্দেরই উল্লেখ করেছেন[২০]।

এই অভিধানে ৭৮৩টি প্রাকৃত গাথা এবং গাথাগুলির সংস্কৃত টীকা আছে। মূল এবং টীকায় মোট ৩৯৭৮টি 'দেশী' শব্দ ধরা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি 'দেশী' শব্দের প্রয়োগ করে প্রাকৃতে গাথা রচনা করা হয়েছে। এই প্রকার উদাহরণ-গাথার সংখ্যা হ'ল ৭৮২। গাথাগুলি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় যোগ্য। গ্রন্থটি মোট আটটি বর্গে বিভক্ত।

প্রাকৃতে ছন্দোগ্রন্থও খুব বেশি রচিত হয়নি। প্রাকৃত ছন্দের সংখ্যা কিন্তু কম নয় এবং নব্য ভারতীয় ছন্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনে প্রাকৃত ছন্দঃ সমূহের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।

প্রাকৃত ছন্দের প্রাচীন লেখক হিসেবে হেমচন্দ্র স্বয়ম্ভূর উল্লেখ করেছেন। খৃঃ অষ্টম-নবম শতক তাঁর সময়কাল বলে অনুমান করা যায়। স্বয়ম্ভূ রচিত গ্রন্থে ৮টি অধ্যায় আছে। প্রথম তিন অধ্যায়ে 'অক্ষরবৃত্ত' পর্যন্ত ৬৩টি প্রাকৃত ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে অপভ্রংশ ছন্দের আলোচনা আছে। গ্রন্থকারের মতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রাকৃত গীতিকাব্য লেখা হয়। স্বয়ম্ভূ ৫৮ জন প্রাকৃত ছন্দের এবং ১০জন অপভ্রংশ ছন্দের লেখকের উল্লেখ করেছেন।

বিরহাঙ্ক তাঁর প্রাকৃত ছন্দের গ্রন্থ বৃত্তজাতিসমুচ্চয়ে অক্ষরবৃত্ত সম্বন্ধে স্বয়ম্ভূর অনুসরণ করেছেন। ছয় অধ্যায়ে রচিত এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় সংস্কৃত ভাষায় লেখা। প্রাকৃত ছন্দগুলিকে তিনি মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত হিসেবে ভাগ করেছেন এবং আলোচিত ছন্দগুলির উদাহরণ তাঁর নিজেরই রচনা। খৃঃ নবম-দশম শতকে গ্রন্থটি রচিত বলে অনুমান করা যায়।

কেবলমাত্র প্রাকৃত গাথার লক্ষণ নিয়ে রচিত নন্দিতাঢ্যের **গাথালক্ষণ** একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছন্দোগ্রন্থ। এই গ্রন্থে ৯৬টি গাথাছন্দে রচিত শ্লোক আছে; তার মধ্যে ৪৯টি হ'ল উদাহরণের জন্য এবং বাকিগুলিতে 'গাথার' বিবিধ বিষয় আলোচিত। পথ্যা, বিপুলা এবং চপলা এই তিন প্রধান ভাগে গাথালক্ষণ বিভক্ত। প্রাকৃতগাথা ছন্দটি প্রাচীনতম বলে অনেকে মনে করেন। নন্দিতাঢ্য সম্ভবতঃ খৃঃ নবম-একাদশ শতকের মধ্যে আবির্ভূ'ত হ'ন।

প্রাকৃত ছন্দের বিস্তৃত আলোচনা করে হেমচন্দ্র তাঁর **ছন্দোঽনুশাসন** রচনা করেন। প্রচলিত-অপ্রচলিত বহু ছন্দেরই আলোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ছয়টি উদ্দেশে বিভক্ত **কবিদর্পণে** ৫২টি প্রাকৃতছন্দের আলোচনা এবং ৬৯টি উদাহরণ পাওয়া যায়। উদাহরণগুলি গ্রন্থকর্তারই রচনা বলে মনে হয় কিন্তু গ্রন্থকারের পরিচয় অজ্ঞাত। ২৪টি সমবৃত্ত, ১৫টি অর্ধসমবৃত্ত এবং সাধারণতঃ কোন ছন্দের গ্রন্থে পাওয়া যায় না এমন ১১টি নতুন ধরণের ছন্দের আলোচনা এই গ্রন্থে করা হয়েছে। প্রাকৃত ছন্দঃশাস্ত্রের আলোচনায় কবিদর্পণের বিশেষ উপযোগিতা আছে।

কবিদর্পণে 'ছন্দঃ কন্দলী' নামে অন্য একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

কথানক

জৈন শিক্ষকগণ তাঁদের ধর্মোপদেশনার সময় নানা গল্প, উপাখ্যান, উপদেশমূলক কাহিনী প্রভৃতির সাহায্য নিতেন একথা আমরা আলোচনা[২১] করেছি। পরবর্তীকালে ঐ সব গল্প-কাহিনীর সংকলনের সাহায্যে এক শ্রেণীর লোক-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। কথা ও চম্পূ জাতীয় গদ্য রচনাতেও প্রাকৃত-গ্রন্থকারগণ যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন সে প্রমাণও আমরা পেয়েছি।

প্রাকৃত গ্রন্থসমূহের টীকাতে বহু ছোট ছোট গল্প পাওয়া যায়। এই গুলিকে **কথানক** বলে। কথানক-গুলির সংকলন করে এক শ্রেণীর কথানক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। **কালকাচার্যকথানক** এইরূপ একটি গদ্য-পদ্যময় প্রাকৃত কথানক-গ্রন্থ বা কথা সাহিত্য। জৈনগণ 'কল্পসূত্র' পাঠের পর এই গ্রন্থটি আবৃত্তি করে থাকেন। রাজপুত্র কালক জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়ে কীভাবে সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জন করলেন তা' এই কাব্যে আলোচিত।[২২]

প্রাচীন কাহিনীর ভিত্তিতে এই গ্রন্থ রচিত এবং সম্ভবতঃ কিছু ঐতিহাসিক উপাদান এখানে পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের পরিচয় অজ্ঞাত।

প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় ১৫৭টি গল্পের সংকলন করে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সোমচন্দ্র **কথামহোদধি** রচনা করেন। ১০২টি প্রাকৃতগাথায় ভাবদেব সূরি **কালকাচার্যকথানক** নামে আর একটি কাব্য রচনা করেন।

খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা বসুদেবহিণ্ডী জৈন লেখকদের গদ্যকাব্য রচনায় দক্ষতার প্রমাণ। ১০০টি 'লম্বকে' বিভক্ত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হ'ল অরিষ্টনেমীর সমসাময়িক 'বসুদেব ও কৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত। চম্পূ-শ্রেণীর কাব্য অষ্টম শতাব্দীর উদ্যোতনের কুবলয়মালাচম্পূ প্রাকৃত সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

প্রাকৃত ভাষায় কেবল যে জৈনদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ এবং কাব্য, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার গ্রন্থাদিই রচিত হয়েছিল তা' নয়। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত, ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও প্রাকৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করে প্রাকৃত-গ্রন্থকারগণ এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।

বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের মধ্যে গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যায় জৈন পণ্ডিতগণের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য[২৩]।

জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে দুর্গদেবাচার্যের **রিষ্টসমুচ্চয়** নামক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ২৬১টি শ্লোকে জৈন-শৌরসেনী প্রাকৃতে খৃঃ একাদশ শতকে গ্রন্থটি রচিত। 'রিষ্ট' বা অশুভ সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়। জৈনদের বিশিষ্ট জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ চন্দপন্নত্তি, সূরপন্নত্তি প্রভৃতির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভূ-বিবরণ বিষয়ক ও আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থাদি রচনাতেও জৈন পণ্ডিতগণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

(ছ) অপভ্রংশ সাহিত্য

প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনের সর্বশেষ অবস্থার নাম 'অপভ্রংশ'। অপভ্রংশের উৎপত্তি ঠিক কখন হয়েছিল তা' বলা সম্ভব নয়। মহাভাষ্যে 'অপভ্রংশ'

শব্দটির উল্লেখ পাওয়া গেলেও পতঞ্জলি অ-পাণিনীয় অপশব্দের অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ করেছেন, ভাষা অর্থে নয়। দণ্ডী তাঁর 'কাব্যদর্শে' ভাষা হিসেবে অপভ্রংশের উল্লেখ করেছেন[২৪], সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে দণ্ডীর পূর্বেই 'অপভ্রংশ'-ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রাচড, নাগর, উপনাগর ইত্যাদি অপভ্রংশের বিভিন্ন রূপ প্রচলিত ছিল[২৫]। পূর্ব, পশ্চিম, ও দক্ষিণ এই তিন অঞ্চলভেদে অপভ্রংশ ভাষাকে আবার তিনটি আঞ্চলিক বর্গেও ভাগ করা হয়ে থাকে[২৬]। রুদ্রট[২৭] বলেছেন যে দেশভেদে অপভ্রংশের নানা রূপ দেখা যায়।

মূলতঃ প্রাকৃত ভাষা হলেও অপভ্রংশে রচিত গ্রন্থাদির আলোচনার জন্য পৃথক 'বিভাগ' করার কারণ হ'ল অপভ্রংশ ভাষার স্বকীয় কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে এবং সাধারণের এই ভাষা যে ধর্মীয়, দার্শনিক অথবা সাহিত্যগুণসম্পন্ন গ্রন্থাদি রচনাতেও ব্যবহৃত হ'তে পারত তার পরিচয় দেওয়া। ভামহ ও দণ্ডীর সময়[২৮] অপভ্রংশ-কাব্য রসিকসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল বলে মনে হয়।

প্রাকৃত-সাহিত্যের তুলনায় 'অপভ্রংশ'-ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা অল্প হলেও বৈচিত্র্য কম নয়। জৈনাচার্যরা যেমন অপভ্রংশ ভাষায় তাঁদের কিছু প্রবন্ধকাব্য, আধ্যাত্মিক কাব্য, নীতিকবিতা প্রভৃতি রচনা করেন তেমনই বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যরা তাঁদের বিচিত্র দার্শনিক ও রহস্যবাদী দোহাগুলি অপভ্রংশতেই রচনা করেন। কালিদাস তাঁর সংস্কৃত নাটক 'বিক্রমোর্বশীয়'র কিছু শ্লোক অপভ্রংশে রচনা করেন। আর অন্যান্য কয়েকজন লেখক এই ভাষায় কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ, গীতিকাব্য ইত্যাদি রচনা করেন।

অপভ্রংশভাষায় রচিত জৈনদের প্রধান গ্রন্থগুলি হ'ল স্বয়ম্ভূদেবের পউমচরিউ এবং হরিবংশপুরাণ, পুষ্পদন্ত বা পুপ্‌ফয়ন্তের মহাপুরাণ, হরিভদ্রের নেমিণাহচরিউ ইত্যাদি।

আনুমানিক অষ্টম খৃষ্টাব্দে কোশলনিবাসী স্বয়ম্ভূদেব অপভ্রংশ ভাষায় রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে কাব্যগ্রন্থ পউমচরিউ রচনা করেন। পূর্ববর্ণিত পউমচরিয়মের মত এই গ্রন্থেও পদ্মের অর্থাৎ রামের চরিত-কথা বর্ণিত।

পাঁচ কাণ্ড ও ৯০ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই কাব্যে সংস্কৃত কাব্যশৈলীর প্রভাব দেখা যায়। মূল রাম-কাহিনীর যে সব পরিবর্তন তিনি করেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল সীতা এখানে রাবণ ও মন্দোদরীর সন্তানরূপে উল্লিখিত। নিজের অনিষ্ট আশঙ্কায় রাবণ কন্যাকে পেটিকা করে মিথিলায় নিক্ষেপ করেন এবং জনক তাঁকে লাভ করেন। স্বয়ম্ভূর 'হরিবংশপুরাণ' সংস্কৃত মহাভারতের অবলম্বনে রচিত। দশম-একাদশ শতাব্দীতে ধবল-কবিও একটি 'হরিবংশপুরাণ' রচনা করেন। দুইটি 'হরিবংশ-পুরাণ'ই জৈন ধর্ম-তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত এবং সেই কাহিনী ও চরিত্রগুলি জৈনধর্মের রূপে ও বর্ণে চিত্রিত। পুষ্পদন্ত (পুপ্‌ফয়ন্ত) রচিত 'মহাপুরাণ' তিসট্‌ঠিমহাপুরিসগণালংকার নামে পরিচিত। আদি-পুরাণ এবং উপপুরাণ—এই দুই খণ্ডে পুরাণটি বিভক্ত। এই গ্রন্থে তেষট্টি জন পৌরাণিক জৈন মহাপুরুষের কাহিনী বিবৃত। রাম এবং কৃষ্ণ-উপাখ্যানের কিছু অংশও এখানে পাওয়া যায়। জসহরচরিউ এবং ণায়কুমারচরিউ পুষ্পদন্ত রচিত অপভ্রংশ ভাষার দুইটি কাব্যগ্রন্থ। গাথা-ছন্দে রচিত জসহরচরিউ চারটি 'সন্ধি' বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কবি তাঁহার এই কাব্যটিকে 'মহাকাব্য' রূপে উল্লেখ করেছেন। এই কাব্যের বিষয়বস্তু রাজা যশোধরের জীবনী। পুষ্পদন্তের অপর অপভ্রংশ-কাব্য ণায়কুমারচরিউ-র বিষয়বস্তু মগধের জৈন রাজকুমার নাগকুমারের কাহিনী। প্রাচীন ভারতের কিছু ভৌগোলিক তথ্য এবং আচার ব্যবহারের কথা এই কাব্যে পাওয়া যায়। পুষ্পদন্ত খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লেখক এবং তাঁর কাব্যদুইটি সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত।

একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কনকামর মুনি করকণ্ডচরিউ নামে দশটি পরিচ্ছেদে একটি কাব্য রচনা করেন। সরল ভাষায়, সাবলীল ভঙ্গীতে কবি চম্পারাজ দধিবাহনের পুত্র করণ্ডকের চরিতকথা বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজেরও একটি মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে হরিভদ্র অপভ্রংশ ভাষায় জৈন-উপাখ্যান-গ্রন্থ নেমিণাহ-চরিউ রচনা করেন। নেমিনাথের চরিত্র অবলম্বনে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু হরিভদ্রের উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় প্রমাণ করা যে, অপভ্রংশ

ভাষাতেও কাব্যরীতির সকল লক্ষণ প্রয়োগ করে উত্তম কাব্য রচনা সম্ভব সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণেই হরিভদ্র এই কাব্য রচনা করেন।

অপভ্রংশে রচিত সর্বাপেক্ষা পরিচিত মহাকাব্য ধণবাল (ধনপাল) রচিত ভবিস্‌সয়ত্তকহা (ভবিষ্যদত্তকথা) একটি উচ্চমানের *romantic* শ্রেণীর কাব্য। গ্রন্থকার একজন দিগম্বর-জৈন উপাসক। পঞ্চবর্ষব্যাপী পঞ্চমী ব্রতের অতুলনীয় মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি ভবিষ্যদত্তের উপকথাকে কাব্যরূপ দান করেন। এই কাব্যে বর্ণিত উপকথার নায়ক ভবিস্‌সয়ত্ত তাঁর নিষ্ঠুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কর্তৃক এক নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হন। সেই নির্জন দ্বীপে নানা দুঃসাহসিক কার্যানুষ্ঠানের পর দেবতার অনুগ্রহে এক রাজকুমারীর সাক্ষাৎ পান ও তাঁকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর দীর্ঘ বারো বৎসর তিনি আনন্দে কাটান। তারপর একদিন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই আবার সেই দ্বীপে আসেন এবং ভবিস্‌সয়ত্তকে ছলনা করে তাঁর পত্নীকে অপহরণ করেন। সৌভাগ্যক্রমে নায়ক এক যক্ষের সাহায্যলাভ করে নিজের বাড়ী ফিরে আসেন ও স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে সুখে কালাতিপাত করেন।

অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও কবির কবিপ্রতিভা ও রচনাশৈলী প্রশংসনায়। নির্জন দ্বীপে অসহায় নায়কের পর্যটনের বর্ণনা মর্মস্পর্শী। অনবদ্য প্রাকৃতিক বর্ণনা ও নানা রসের সমাবেশে কাব্যটি বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

নীতিশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অপভ্রংশ ভাষায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ বেশ কিছু গ্রন্থ শ্লোকাকারে রচিত হয়। সংস্কৃত নীতিকবিতার প্রভাব এই শ্রেণীর অপভ্রংশ গ্রন্থাদিতে সুস্পষ্ট।

'গাথা-সপ্তশতী' প্রাকৃত কবিতার যে আদর্শ স্থাপন করে তারই প্রভাবে অপভ্রংশ-দোহাবলী রচিত হয়। প্রাকৃত-গাথা ও অপভ্রংশ-দোহার মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। প্রাকৃতগাথাগুলি প্রধানতঃ আদিরসাত্মক কিন্তু অপভ্রংশ-দোহাবলীর মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্ব ও সাধন-তত্ত্বের পরিচয় আছে। সরহপাদ, কাহ্নপাদ, তিল্লোপাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দোহাগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে

এই সব বৌদ্ধাচার্যদের দোহাবলীর সঙ্গে বাঙলা ভাষার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অপভ্রংশ দোহাগুলির বজ্রযানী ও তান্ত্রিক ভাবরস পরবর্তী যুগের 'নাথ'-সাহিত্যকে বিশেষ প্রভাবিত করে।

অপভ্রংশ ভাষায় গীতিকবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে। হেমচন্দ্রের ব্যাকরণেও এই শ্রেণীর রচনার নিদর্শন আছে।

কেবলমাত্র অপভ্রংশ ভাষার জন্য কোন পৃথক ব্যাকরণ রচিত হয় নি, কিন্তু প্রাকৃত-ব্যাকরণগুলির অংশবিশেষে অপভ্রংশ ভাষার আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের ব্যাকরণ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

পিঙ্গলাচার্যের প্রাকৃত-পৈঙ্গল অপভ্রংশ ভাষায় রচিত একটি উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত ছন্দোগ্রন্থ। পিঙ্গলাচার্যের সময় সম্বন্ধে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত এই দুই প্রকার ছন্দেরই আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার উদাহরণস্বরূপ বহু অপভ্রংশ-শ্লোক উল্লেখ করেছেন। এই শ্লোকগুলির ভাষা প্রায় নব্য-ভারতীয়-আর্যভাষার সমগোত্রীয়।

অপভ্রংশ-প্রাকৃতের অর্বাচীন রূপ-কে অবহট্‌ঠ (অপভ্রষ্ট) বলা হয়। খৃষ্টীয় নবম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বাঙলা থেকে গুজরাট পর্যন্ত উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের ভাষা ছিল এই অবহট্‌ঠ। অপভ্রংশের মত অবহট্‌ঠেও বহু দোহা রচিত হয়। নব্য-ভারতীয়-আর্যভাষার ও সাহিত্যের বিবর্তনে ও ক্রমবিকাশে অবহট্‌ঠের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কবি বিদ্যাপতির কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা অবহট্‌ঠে রচিত দুইটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কবির পৃষ্ঠপোষক ত্রিহুত-রাজ *কীর্তিসিংহের কীর্তিকলাপ গদ্যপদ্যে* চারটি 'পল্লবে' কীর্তিলতায় বর্ণিত। *সে যুগের সমাজের একটি পরিচয়ও* এই কাব্যে পাওয়া যায়। কীর্তিপতাকার উপজীব্য বিষয় রাজা শিবসিংহের কীর্তি ও প্রণয় কাহিনী।

বিদ্যাপতির সময় বিতর্কের বিষয় হলেও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ের লোক ছিলেন।

১। Winternitz, HIL, II, p 475

২। পৃঃ ১২৬ ৩। দ্রঃ পৃঃ ১৪৩ ৪। দ্রঃ পৃঃ ১৬২

৫। দ্রঃ পৃঃ ১৬২ ৬। Winternitz, ঐ, p 551

৭। Winternitz, ঐ, p 479, f. n. 2

৮। ঐ, pp 484 ff

৯। ঐ, pp 495-96

১০। দ্রঃ R. G. Basak (Ed.), Gāthā Saptaśatī, Introduction

১১। গা. স. ৩/১৭

১২। ঐ, ৫/১১

১৩। ঐ, ৪/৮০

১৪। ম. ঘোষ, প্রাকৃত সাহিত্য পৃঃ ২

১৫। সাহিত্যদর্পণ, ৬/১৮৪

১৬। Grierson, Sri Asutosh Silver Jub. Vol. III, pt 2; P. L. Vaidya (Ed.), Prākṛta Prakāśa, p vi

১৭। দ্রঃ গুজরাতি ভাষায় বেচারদাসজী জৈন রচিত প্রাকৃত ব্যাকরণ

১৮। গাথা ২৭৬ ১৯। গাথা ২৭৭ ২০। দেশীনাম০ ১/৪

২১। পৃঃ ১৬৯ ২২। Winternitz, ঐ, p 537

২৩। দ্রঃ Annals of Bhandarkar Inst, 1926-27, pp 145 ff এবং Jain School of Mathematics, Bull. Cal. Math. Soc. 1929. pp 115 ff

২৪। কাব্যাদর্শ ১/৩৭ ২৫। দ্রঃ পৃঃ ১৮৩

২৬। Tagare, Historical Grammar of the Apabhraṁśa, p 16 ২৭। কাব্যালঙ্কার ২/১২

২৮। কাব্যালঙ্কার (ভামহ), ১।১৬।২৬; কাব্যাদর্শ, ১/৩৬